প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরমভাগবত প্রয়াত পিতৃদেব সত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
প্রয়াতা জননী বীণাপাণি দেবীর পুণ্যস্মৃতিতে

আভাষণ

ষোড়শ শতকে বাঙালির চিত্তজাগরণ ও সংস্কারমুক্তি-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি ও বৈরাগ্যের আশ্চর্য সন্নিপাতে সমুজ্জ্বল শ্রীচৈতন্য-মহিমা বাঙালির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনকে প্রথানুগত্যের রক্ষণশীল বিধি-নিষেধ ডিঙ্গিয়ে এক অভিনব প্রাণরসে উজ্জীবিত করেছিলো। অহৈতুকী ভক্তি, সর্বজীবে প্রেম, উদার-উন্মুক্ত মন ও নৈরাশ্যবর্জিত অনলস কর্মোদ্যোগের দ্বারা সমকালীন বাংলায় যে ভাব-আন্দোলন তথা ভক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তিনি, তাতে কেবল আদ্বিজ চণ্ডাল বাঙালি হিন্দু নয়, অহিন্দু সমাজেরও স্বধর্মনিষ্ঠ বহুজন তাঁর প্রেমরসসিক্ত ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ, সর্বজীবে ঈশ্বরের প্রতিভাস-দর্শন এবং সত্যের অপক্ষপাত আলোকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে 'কোল' দান—ষোড়শ শতকের কুসংস্কার ও ভেদবুদ্ধিদীর্ণ বাঙালি জীবনে শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে শ্রীচৈতন্য ভগবান বিষ্ণুর অবতার নরদেহধারী নারায়ণ। আমজনতার কাছে তিনি বঙ্গের আদরের দুলাল নিমাই, গৌরাঙ্গ বা গোরা—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠভক্ত। যুক্তিবাদী বিদগ্ধজন তাঁকে গ্রহণ করেছেন বিপ্লবী যুগনায়ক রূপে। এত বড়ো এক ব্যক্তিত্বের, মহান্ত পুরুষের ঈশ্বরীয় বিশ্বাসের ভাবচ্ছায়ায় প্রেমের সাধনা ও সংস্কার-মুক্তির আন্দোলন অর্থনৈতিক, দৈহিক ও মানসিক দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাঙালিকে সামগ্রিকভাবে এক অস্তিবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছিলো, জীবনের আনন্দ—বেঁচে থাকার অর্থ তাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিলো। রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব, ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, মাধুর্যরসের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদনের মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় ধর্মসাধনার ধারায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন' নামে একটি অভিনব ও অত্যুজ্জ্বল রত্ন যোগ করে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে (বর্তমানে তামাম দুনিয়ায়) জ্ঞান ও কর্মযোগী ন্যাসী প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রদ্ধার্হ ও বন্দনীয় আসনটি অধিকার করে আছেন।

শ্রীচৈতন্য বাঙালির জাতীয় জীবনে তথা বাংলা সংস্কৃতিতে একটি বহু আলোচিত ও বহুচর্চিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভাব-অধিবাসনে প্রেম ও ভক্তিরসের যে স্রোতে বাঙালি অবগাহন করে নবজন্ম লাভ করেছিলো, তার কেন্দ্রে ছিলো এক বাস্তব পদক্ষেপ—ভগবানের নামগান—ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম সংকীর্তন। কলিতে জীবমুক্তির একমাত্র উপায় ঐ হরিগুণগান—

> "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।।"

একথা বাস্তব যে মহাপুরুষের মহত্ত্ব, যশোগাথা একক প্রযত্নে সিদ্ধ হয় না। এর

জন্য পার্ষদের প্রয়োজন। একালের প্রণম্য শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের যেমন শ্রীমা, তেমনি সেকালের শ্রীচৈতন্যের শ্রীনিত্যানন্দ। যুগগত প্রয়োজনেই গৌর-নিতাই দুই ভাই যেন হরি-হর আত্মা। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁরা কৃষ্ণ-বলরাম—নারায়ণ ও সংকর্ষণ। নবদ্বীপের প্রেমসাধক শ্রীচৈতন্য ও বীরভূমের একচক্রার তন্ত্র-বেদান্তদীক্ষিত বীরাচারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের মিলন আশ্চর্যজনক হলেও যুগগত প্রয়োজনেই। নিত্যানন্দের জীবনধারা প্রমাণ করে, ভাবযোগী শ্রীচৈতন্যের তুলনায় তিনি অনেকাংশে বাস্তববাদী। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নবদর্শন (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন) প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীব্যক্তির বোধগম্য। তাকে আপামর সাধারণ নর-নারীর বোধের সীমানায় আনা প্রয়োজন। ধর্মের প্রায়োজনিক ও ব্যবহারিক বাস্তব প্রেক্ষিতটি সাধারণের বোধগম্য হওয়া চাই। শ্রীচৈতন্যের মতো বন্ধনমুক্ত ভাববাদী সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মপ্রচারের ব্যবহারিক দিকটি অবহেলিতই ছিলো। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা এবং প্রায়শই বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত শ্রীচৈতন্যের অন্তর্জীবনের শেষ আঠারোটি বছর দিব্যভাবের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। এই প্রেক্ষিতেই প্রয়োজন হয়েছিলো 'ভক্তরূপ চৈতন্যে'র আদর্শ প্রচারে কর্মবীর, বাস্তববাদী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 'ভক্তস্বরূপ' নিত্যানন্দের। তাঁরই নিরলস উদ্যমে গড়ে উঠেছিলো ভক্তিরসদীপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডল, মোহান্ত-গোস্বামী-অধ্যুষিত বিভিন্ন সাধনপীঠ, বৈষ্ণবীয় সংকীর্তন, সাধনবিধি ও মহোৎসব (মোচ্ছব)-কেন্দ্রিত শৃঙ্খলা প্রণালী। বস্তুত শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মসাধনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিলো তাঁরই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রয়াসে।

বলা বাহুল্য, তাঁর এই মহৎ প্রয়াসে যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের। নাম-গানের মহিমা প্রচারের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বার বার অনুরোধ করে বলতেন— 'একবার যা রে নিতাই নাম বিলাতে।' শ্রীচৈতন্যের আদর্শ প্রচারে তাঁর বস্তুবাদী ভূমিকার স্বীকৃতির পরিচয় আছে পদাবলী গানে—

"নদীয়া বিহারী এসো গৌর হরি
নিত্যানন্দে সঙ্গে নইয়া।
এসো এসো দুটি ভাই শ্রীগৌর-নিতাই
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ বঁধূয়া।" .....ইত্যাদি।

মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের মতো উচ্চমার্গের প্রেমসাধকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ তেমন ছিলো না। বাংলার বাইরে সুদূর নীলাচলে (পুরীতে) তাঁর অধিষ্ঠান বহিরঙ্গ জীবনে বাংলার জনগণের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র দুর্বল করেছিলো। অন্যদিকে নিত্যানন্দের কর্মক্ষেত্র ছিলো মুখ্যত বাংলায় প্রসারিত। নিত্য গণসংযোগ নিত্যানন্দকে জনপ্রিয় জননায়কে পরিণত করেছিলো বলেই সংকীর্তনের আসরে বা অন্যান্য জনসভায় তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠতো 'জয় নিতাই'। সুতরাং শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় ভাবান্দোলনে সহযোগী নিত্যানন্দের বাস্তব ও কার্যকরী ভূমিকা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় এদেশের রসিক সমালোচক শ্রীচৈতন্য বন্দনায় যতোটা মুখর, নিত্যানন্দের ক্ষেত্রে ততোধিক পরিমাণে মৌন। এর একটা কারণ হ'তে পারে যষ্টিধারী সন্ন্যাসী থেকে তাঁর গৃহধর্মে আশ্রয় গ্রহণকে সাধারণ মানুষ সুনজরে দেখেনি। কিন্তু বলিষ্ঠ জীবনবাদ ছাড়া কোনো আদর্শই যে সমাজে চলে না, সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর মিলন না হলে ধর্মের তাৎপর্য যে অর্থহীন বায়বীয় বিলাসে পরিণত হয়, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তা বুঝতেন এবং সেজন্যই নিত্যানন্দকে তাঁর স্বভাবানুগ সংসারাশ্রম গ্রহণে নির্দেশ দেন। কিন্তু এহো বাহ্য। বস্তুত বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অল্পবিস্তর নিত্যানন্দ-প্রশস্তি তাঁর ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে পরিব্যাপ্ত বৃহৎ ভূমিকাটিকে তেমনভাবে প্রতিফলিত করে না। শ্রীচৈতন্য সৌরালোকচ্ছটায় এই ধ্রুবতারকার জ্যোতি অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত চরিতসাহিত্য-গুলিতে নিত্যানন্দকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তার যথাযথ উল্লেখ অথবা মূল্যায়নও হয়নি তেমনভাবে। সুতরাং অখণ্ড অমিয় নিমাই চরিতের পাশাপাশি নিত্যানন্দ অমৃতকথা আজও অপেক্ষিত।

সম্প্রতি আমার স্নেহভাজন ছাত্রী ড. উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ' শীর্ষক তাঁর গবেষণা-নিবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চলেছেন জেনে যথেষ্ট আশ্বস্ত ও আনন্দিত বোধ করছি। তাঁর অনলস পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের ফল 'বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ' তথ্য-তত্ত্ব ও মনোগ্রাহী বিশ্লেষণে পূর্ণ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যা নিত্যানন্দ-গবেষণার ইতিহাসে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করবে, সন্দেহ নেই। নিত্যানন্দ সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়ে এবং বাঙালি জীবনে নিত্যানন্দের আদর্শ ভূমিকাটি উপস্থাপিত করে লেখিকা বৈষ্ণব মহান্তজীবন ও সাহিত্যরসিকদের তো বটেই, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্রী হয়েছেন। সুধীসমাজে গ্রন্থটির উপযুক্ত সমাদর প্রত্যাশিত। শ্রীনিত্যানন্দ জয়তু।

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারতসংস্কৃতির উজ্জ্বলমণি হয়ে উঠেছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্য জীবনকথাই ছিল দেবাশ্রয়ী ভক্তিবাদী মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারায় প্রথম মানুষের কথা। চৈতন্য জীবনকথার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য পার্ষদদেরও জীবনকাহিনী রচিত হয়েছিল। চৈতন্য জীবনধর্ম যাঁর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত হয়েছিল অথবা বলা যায়, গৌড়মণ্ডলে এবং গৌড়মণ্ডলের বাইরে চৈতন্যধর্ম প্রসারের কাজে যিনি অগ্রগামী ছিলেন, তিনি নিত্যানন্দ। বৈষ্ণব-আরাধক সমাজে চৈতন্য অপেক্ষাও 'জয় নিতাই' অভিভাষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

নিত্যানন্দ ছিলেন মানবতাবাদী। প্রেমধর্ম প্রচারই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন প্রবৃত্তির সঙ্কটও তিনি জানতেন। নিয়ম নিষ্ঠায় বদ্ধ ধর্মবোধ অপেক্ষা প্রেমধর্মের সরলীকরণেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ সংসারধর্ম পালনের মধ্যেও ধর্মনিষ্ঠ মনের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম গতানুগতিকতার সংকীর্ণ পথ পরিহার করে প্রেম, সৌন্দর্য ও অধ্যাত্মভাবনার আলোকদীপ্ত রাজপথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই উত্তরণের পটভূমিকা রূপে কাজ করেছে নবোন্মেষিত বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ, দার্শনিক আলোচনা এবং তৎকেন্দ্রিক সুবিপুল কাব্য-সাহিত্য-সম্ভার।

চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্যের মূল লক্ষ্য ছিল দেবতা, মানুষ ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীচৈতন্যের ভাব অধিবাসনে সমকালীন যুগভাবনার মূল লক্ষ্য হল দেববাদ নির্ভর মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা। স্বর্গের কল্পিত ভগবান মানুষের জীবনসাধনা ও কর্মধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। এর কেন্দ্রস্থলে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ এবং সেই বলয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের পার্ষদবর্গ দর্শনে-গানে-সংকীর্তনে সমুন্নত জীবনাদর্শে সমগ্র বাংলাদেশে নতুন প্রাণস্রোত প্রবাহিত করলেন। ভগবান যেমন নরদেহ ধারণ করে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন, তেমনি সদ্‌গুণান্বিত মানুষও ঈশ্বরকল্প দৈবী পুরুষে পরিণত হন। এমনি করে দৈনন্দিন জীবনসাধনার মধ্যে জীবে-শিবে, উচ্চ-নীচে ভেদজ্ঞান যায় লুপ্ত হয়ে। আমরাও স্বজন-প্রিয়জনে দেবতার প্রতিভাস ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক্ষ করে আমাদের ভালোলাগা আর ভালোবাসার ধন তাদের অঞ্জলি দিয়ে বসি—'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম অনুগামী সন্তসাধকবৃন্দের অনলস প্রয়াসে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বর্জিত ও শ্রেয়ো-বোধে উদ্দীপ্ত সর্বজীবে প্রেমধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ভাবধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যিনি সবচেয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি নিত্যানন্দ। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ও তাঁদের পার্ষদবর্গের জীবনধারা অবলম্বনে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব চরিতসাহিত্য।

এই বৈষ্ণব চরিতসাহিত্যের মূল উৎস চৈতন্যদেব। শুধু তিনিই নন, পরবর্তীকালে

তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনী অবলম্বনেও চরিতসাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে পরিকর চরিতগুলির মূল্যও কিছু কম নয়। চৈতন্যদেবের অবদান সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। চরিতসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতের গুরুত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনুরূপভাবে বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দের কথা যথোচিতভাবে আলোচিত হয়নি। নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনুগামী হয়ে প্রেমের বন্যায় সমাজের ঘৃণিত ও অবহেলিত মানুষকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মধ্যে মানবতাবোধ প্রকট ছিল। মুরারি গুপ্তের কড়চায় উল্লিখিত আছে যে, প্রকট লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর গৌড়বঙ্গে কৃষ্ণনাম ও জীবপ্রেম প্রচারের ভার দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ শুধুমাত্র নাম প্রচার করেননি, তিনি আচণ্ডালের মধ্যে প্রেমও বিতরণ করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত প্রেমের জোয়ারধারাকে পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী জাহ্নবাদেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র আরও বহুদূর অগ্রসৃত ও বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নিত্যানন্দের জীবনী ও কর্মধারার পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে নানা গ্রন্থে থাকলেও তা কোথাও বিশদভাবে সু-সংবদ্ধ আকারে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, মহাপ্রভুর চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে নিত্যানন্দের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে পূর্ণ পরিচয় থাকা একান্তই প্রয়োজন। নিত্যানন্দ যে শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় প্রবক্তা ছিলেন তা নয়, তিনি তৎকালীন সমাজের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন অর্থাৎ মানবতাবোধ তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে প্রকট ছিল।

এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, উদার মানবতা-নির্ভর প্রতিবাদী ধর্মান্দোলন ও সমাজ সংস্কারের নেতারূপে আবির্ভূত হলেও, শ্রীচৈতন্য শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছিলেন দিব্য ভাবোন্মাদ সাধকরূপে। এবং ভক্ত গোস্বামীদের সচেতন প্রয়াসজাত তত্ত্ব ও দার্শনিকতায় পরিগণিত হয়েছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' রসরাজ ও মহাভাব জাত পরমতত্ত্বরূপে। শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে আবেগবিধুর ভক্তি-উন্মত্ত জীবন যাপন করছিলেন, তখন বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অথবা চৈতন্যাশ্রিত প্রেমধর্মের সাংগঠনিক প্রচার বা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন নিত্যানন্দ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানে তাঁর ভাবসাধনার কর্মনিষ্ঠ রূপ নিত্যানন্দের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল। এইভাবে প্রকৃত চৈতন্যের স্বকীয় সত্তা বহুলাংশে আচ্ছন্ন হলেও ব্যাপকতর তাৎপর্যে যে তা অবলুপ্ত হয়নি, বস্তুমুখী ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যের ভাবান্তর বা রূপান্তর যে পথে বা রূপেই সাধিত হোক না কেন, তাঁর একান্ত মনোবাসনা যে, শেষ পর্যন্ত ছিল বৃহত্তর জনমুখীনতায় সমর্পিত, তার বিশিষ্ট প্রমাণ, চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের প্রতি উক্তি বা প্রত্যাদেশের মধ্যে সুস্পষ্ট। তাই সেদিন নিত্যানন্দকে তিনি বলেছিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার।।
ভক্তি-রসদাতা তুমি, সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে।।
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও।।
মূর্খ-নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন''।।[১]

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কথিত আছে—ষাট হাজার বৌদ্ধ নেড়ানেড়িকে একদিনে দীক্ষা দিয়ে তিনি বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন[২]। আবার নেড়ানেড়িদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কারও কারও মতে এ কাজ করেছিলেন বীরভদ্র। "Birabhadra inherited the redicalism of his father. It was manifest in his conversion of two thousand and five hundred Buddhist monks and nuns".[৩] খড়দহে রাসখোলার ঘাটে এই শুদ্ধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল[৪]। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তাঁর পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবধারাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ১২০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ১৩০০ ভিক্ষুণীকে বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন নেড়ানেড়ির দল। এই কালেই বৈরাগী-বৈরাগিণীর দলের উৎপত্তি হয়েছিল[৫]। পানিহাটীতে তুমুল নাম সংকীর্তন শুরু হল। ছত্রিশ জাত একসঙ্গে বসে এক পংক্তিতে ভোজন করতে লাগলেন। জাত-পাত দূর হল, অস্পৃশ্যতা দূর হল। পরবর্তী যুগে বাউল, কর্তাভজা, মতুয়া, সাহেবধনি, নাথ ইত্যাদি নানা লোকধর্ম প্রচারের সহজিয়ারূপ মূর্ত হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশ শিরোধার্য করে তাঁর প্রেমধর্মকে আচণ্ডালে ভক্তিধর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন নিত্যানন্দ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর কৃষ্ণনাম ও জীবপ্রেম বিতরণের আশায় বেরিয়ে পড়েছিলেন বাংলার পথে পথে। তাঁর ইচ্ছা ছিল—

জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিআ সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে।।
★ ★ ★ ★ ★ ★
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে।।[৬]

তিনি সে কাজে সফল হয়েছিলেন। তাঁর কার্যক্ষমতা ও প্রতিভার যৌগিক ফলে পরবর্তীকালে তিনি অমরত্ব লাভ করেছিলেন এবং সেই ফলস্বরূপ আমরা মতুয়া ধর্মের আকর গ্রন্থ ‘‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’’-এ দেখতে পাই শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের পার্ষদ পাগল মহানন্দকে নিত্যানন্দ পরিচয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

‘‘নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কহে মহানন্দ,
চক্র ছাড়ি দে ওরে অক্ষয় প্রেমানন্দ।

(শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত : তারকচন্দ্র সরকার)

আজ বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন লোকধর্মে জাতিভেদ নাই—একথা সত্য। চণ্ডাল-যবনে সব একাকার, কুলবধূ পর্যন্ত কীর্তনের আনন্দে মাতোয়ারা। অন্ধ-বধির-পঙ্গু একত্রিত হয়ে মহানন্দে নৃত্য করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে।

বলা বাহুল্য, নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীচৈতন্যের উদ্বোধিত ধর্মাদর্শের উদার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এবং ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে একাত্ম করে এক বিশেষ সামাজিক-ধর্মীয় সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন, যার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল বীরভদ্র ও জাহ্নবাদেবীর কর্মপ্রয়াসে ও লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের সামগ্রিক প্রাণবন্ত বিকাশে। শ্রীচৈতন্যের মানবতা-নির্ভর গতিশীল ধর্মচেতনার মহৎ প্রেরণা একদিকে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর তত্ত্বমুখিন শাস্ত্র-পুরাণের প্রভাবদৃঢ় ভিত্তিতে, অন্যদিকে তা বৃহত্তর লোকায়ত ধারায় পরিব্যাপ্ত হয়—নিত্যানন্দ-বীরভদ্র-জাহ্নবাদেবীর গণমুখীন ব্যাপক কর্মপ্রয়াসে। এই প্রয়াসের উত্তরাধিকার সঠিকভাবে সতত সংরক্ষিত ও প্রতিপাদিত নিশ্চয় হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে বিচ্যুতি-বিকৃতি বা কদাচারজনিত স্খলন দেখা দিয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্রমবিবর্তিত সজীব প্রবাহ লোকায়ত ধর্মসাধনা ও সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের মধ্যে আজও লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য-আন্দোলনের সর্বজন আলোড়ন লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির সচল প্রবাহে। তাই ব্যাপক অর্থে বলা যায়—নিত্যানন্দ প্রভুকে বাদ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব ও কর্মধারার পরিচয় লাভ অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য গণনায়ক নিত্যানন্দকে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।



শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু

প্রথম অধ্যায়

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য জীবনী

আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ 'লীলাক্ষেত্র' হিসেবেই পরিচিত এবং তা মূলত ধর্মপ্রাণ সাধুমহাপুরুষদের। যুগে যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষ এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে জীবনপঞ্জীর সংখ্যাই বৃদ্ধি করেননি, বিভিন্ন সময়ের 'অবতার' বা অবতারের পার্ষদ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে এমন বৈচিত্র্যময় জীবনগাথা তুলে ধরেছিলেন যা কিনা এই সমসাময়িক যুগেও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এখানে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত এবং অনেকের কাছে সুস্থ সমাজজীবনের সর্বকালের অন্যতম গণদেবতাও। তিনি কথা ও কাজের নিখুঁত সংমিশ্রণের দ্বারাই সমাজের ধনী বণিক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে একেবারে সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদেরও হরিনামের বন্যায় প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধে ভাসিয়েছিলেন। তাঁর প্রচার ও লক্ষ্য ছিল 'অকিঞ্চন সমরস' অর্থাৎ পতিত উদ্ধার। নিত্যানন্দ প্রভু তাই করেছেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী সমাজবিজ্ঞানী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাই বলেছেন, তখনকার যুগের মাপকাঠিতে চৈতন্যের সংস্কারগুলি ছিল বৈপ্লবিক। চৈতন্যের নির্দেশে নিত্যানন্দ যেভাবে বঙ্গদেশে আপামর সাধারণকে এক ঠাঁই করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও বলেছেন, ''এদেশে নিত্যানন্দই প্রথম ডিমোক্র্যাট। ডিমোক্র্যাসি যদি একটি রস হয় তবে তারই নাম 'অকিঞ্চন সমরস'' শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুই বাঙলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিমোক্র্যাট।''[১]

সমাজে সর্বকালের অন্যতম দুটি অনুভব প্রেম ও ভক্তির অন্যতম প্রবক্তা এবং পতিতের উদ্ধারকর্তা হিসাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মধুর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে শ্রীচৈতন্যচরিতসাহিত্য ও শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের চরিতসাহিত্য অবলম্বনে মহাত্মা নিত্যানন্দ প্রভুর জাতি ও বংশগত পরিচয় একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তাতে শ্রীনিত্যানন্দের জীবন ও ভাবপরিমণ্ডলটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জন্মস্থান

চৈতন্যভাগবত অনুসারে আমরা জানতে পারি রাঢ় বঙ্গের একচক্রা বা একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দ আবির্ভূত হন—

রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥[২]

এই জন্মস্থানের বিবরণ আমরা অন্যান্য গ্রন্থেও পাই যেমন—'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' এবং জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল।'

বংশপরিচয়

নিত্যানন্দের বংশপরিচয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসেও পাওয়া যায়। কনৌজাগত (ক) শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ (খ) ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী (গ) আদিবরাহ (ঘ) বৈনতেয় (ঙ) সুবুদ্ধি (চ) বিবুধেশ (ছ) গুহ (জ) গঙ্গাধর (ঝ) সুহাস (ঞ) শকুনি (গয়ঘড়) (ট) মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কুলীন) (ঠ) মহাদেব (ড) তিকু (ঢ) নেঙ্গুলের পঞ্চপুত্র। গঙ্গা, সোম, সিধু, লখাই ও মিহির (ণ) মিহিরের ধারাই এ স্থলে আমাদের আলোচ্য। মিহিরের পুত্র ভাস্কর (ত) পুষ্কর (থ) সৃষ্টিধর (দ) মালাধর (ধ) বৃষকেতু (ন) চন্দ্রকেতু (প) নকড়ি বাঁড়ুরী (সুন্দরামল্ল) (ফ) মুকুন্দ ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত নামে খ্যাত)। মুকুন্দ ওঝা সপ্ত পুত্রের জনক ছিলেন। এই মুকুন্দের জ্যেষ্ঠপুত্রই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস বলেন—'সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।'[৩]

হাড়াই পণ্ডিত

নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দ সর্বানন্দ ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দ প্রেমানন্দ বিশুদ্ধানন্দ

নিত্যানন্দের পিতামহ নকড়ি বাঁড়ুরী (সুন্দরামল্ল) ছিলেন অর্থশালী ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

'অতি অর্থবন্ত ওঝা, প্রবীণ সর্ব্বাংশে।
যজমানে স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষ।।
পূর্ব্ব ঋষি প্রায় যে সকল ক্রিয়া তাঁ'র।
বিপ্রের লক্ষণ যত তাঁহাতে প্রচার।।[৪]

বৃন্দাবনদাস প্রণীত 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে নিত্যানন্দের পিতা ছিলেন হাড়ো ওঝা, মা পদ্মাবতী। একচাকা (একচক্রা) গ্রামে ছিল তাঁদের বাস।

'হাড়ো ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি।।'[৫]

তিনি ছিলেন উত্তম রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ[৬]। তিনি যজমান বৃত্তির সঙ্গে কৃষিকার্য করতেন—

কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যতকর্ম্ম করে।।[৭]

হাড়ো ওঝা বহু শাস্ত্র পাঠ করে, হাড়াই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। তারপর এক শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে 'তেরশত পচাঁনব্বই শকে' মাঘ মাসে[৮] এই ব্রাহ্মণ দম্পতি নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্রসন্তানরূপে লাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থেও আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম প্রসঙ্গে একই বৃত্তান্ত অবগত হই। তাঁর ডাকনাম ছিল কুবের।[৯] তিনি ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র, রূপে-গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়[১০]।

বাল্যজীবন

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' এবং বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নিত্যানন্দের বাল্যলীলা অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে—

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।[১১]

এই অধ্যায়ের ৬-৯৮ শ্লোকে তাঁর অপূর্ব বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র—

করিলেন খেলা আরম্ভ নিত্যানন্দ।
পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাই গন্ধ।।[১২]

বাল্যক্রীড়াচ্ছলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন। তিনি সাধারণ শিশুদের মতো শৈশবোচিত খেলা করতেন না, শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয়ই খেলা করে লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণজন্মের পূর্বে ধরিত্রী দেবী ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে দৈত্যগণ কর্তৃক উৎপীড়নের কথা নিবেদন করেন। নিত্যানন্দও তাঁর খেলার সাথী শিশুগণকে নিয়ে দেবসভা করলেন।

নিত্যানন্দের ভাবী জীবনের কার্য এই খেলাতেই সূচিত হয়েছিল। এই বাল্যলীলাতেই ভক্ত সমাজ আভাস পেয়েছিলেন যে এই বালক ভবিষ্যতে কৃষ্ণনাম ও জীবপ্রেমের মন্ত্রে সারা মানবজাতিকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়ে জীবনকে মধুময় করে তুলবেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, নবদ্বীপ যখন নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের অধিকৃত এবং বিদ্যার নামে অবিদ্যার কোলাহলে মুখরিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, প্রায় সেই সময়ে বীরভূমের একচক্রায় নিত্যানন্দ বাল্যখেলার বাস্তব প্রেমের সুধারস আস্বাদনে মাতোয়ারা।

নিতাই ক্রমশ বড় হতে লাগলেন। হাড়াই পণ্ডিত তাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে যত্নবান হলেন। তাঁকে গঙ্গাহরি পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে পাঠান হল[১৩]। তিনমাসে সব শাস্ত্র তাঁর একটু একটু করে জানা হয়ে গেল। তিনি প্রথমে ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়া আরম্ভ করলেন। তিনি খেলার সময় যেমন একাগ্রচিত্তে খেলা করতেন, পাঠের সময়ও তেমনি একাগ্রচিত্তে পড়াশোনা করতেন। নিতাই যেমন মেধাবী তেমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি—

'ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ'[১৪]

আবার জয়ানন্দ বলেছেন—

'শাস্ত্র শালে পড়াইল যজ্ঞসূত্র দিয়া'[১৫]

ঈশাননাগর-বিরচিত অদ্বৈত প্রকাশ থেকেও আমরা জানতে পারি—

ন্যায়চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।[১৬]

এই সমস্ত সূত্র অনুসারে আমরা জানতে পারি, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান ছিলেন।

এরপর হাড়াই পণ্ডিত মহাসমারোহের সহিত নিত্যানন্দের উপনয়ন দিলেন। তাঁর অনুপম রূপলাবণ্য ও ব্রহ্মচারীর বেশ দেখে সকলেই মুগ্ধ হলেন। নিতাই দণ্ডহস্তে সন্ন্যাসীবেশে ভিক্ষা করতে বের হলেন। প্রতিবেশীগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে নবীন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাদান করলেন—

কি আনন্দ হৈলা যজ্ঞোপবীত সময়।
সে শোভা দেখিনু তাহা কহিলে না যায়।[১৭]

দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ না হতেই নিতাই পণ্ডিত সমাজে খ্যাতনামা হয়ে উঠলেন। নিতাইর অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 'ন্যায় চূড়ামণি' উপাধি প্রদান করা হল। নিতাইর যশঃসৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।[১৮]

তিনি অত্যন্ত সুশ্রী ও বলিষ্ঠ দেহী ছিলেন। পিতামাতা যখন তাঁর বিবাহের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন সেই সময়ে এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী এসে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু চলে যাবার সময় তিনি পণ্ডিতের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন যে তাঁর পুত্রকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর তীর্থাদি ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে পাঠাতে হবে। চৈতন্য ভাগবত[১৯] এবং ভক্তিরত্নাকরের সাক্ষ্য থেকে আমরা এই বৃত্তান্ত জানতে পারি[২০]—

সুখী হইয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচন।
হাড়াই পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন।
এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন।।
যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ কৈল অঙ্গীকার।
মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার।।[২১]

সন্ন্যাসী হাড়াইয়ের পুত্র-ভিক্ষা ব্যাপারটি 'ভক্তিরত্নাকর'[২২] ও 'চৈতন্যভাগবত'[২৩] থেকেও জানা যায়। পুত্রকে সঙ্গে না নেওয়ার অনুরোধ করলেন হাড়াই। নিত্যানন্দের গৃহ ছাড়ার চিন্তা। তাই সর্বদাই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চিন্তিত থাকতেন পাছে পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে। হলও তাই। তাঁর পিতামাতা সন্ন্যাসীর নিকট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করলেন। কিন্তু জীব উদ্ধার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাড়াই পণ্ডিত অবশেষে পুত্র দানে সম্মত হলেন। নিত্যানন্দের গৃহত্যাগকালীন বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। 'চৈতন্যভাগবত'[২৪] ও 'ভক্তিরত্নাকর'[২৫] অনুসারে তখন তাঁর বয়স ছিল দ্বাদশ বৎসর। 'প্রেমবিলাস' মতে চতুর্দশ[২৬] এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতে অষ্টাদশ বৎসর[২৭]।

নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। প্রেমবিলাস থেকে জানা যায়—সেই সন্ন্যাসী

সেইকালে নিত্যানন্দ সঙ্গে লইয়া গেল।
তাঁর শিষ্য কৈলা দণ্ড না কৈল গ্রহণ।
অবধূত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ।।[২৮]

যাই হোক এর পরের ঘটনার বর্ণনায় আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের সূত্রে জানতে পারি যে তিনি নিত্যানন্দের নিকট প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনে ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

তীর্থ ভ্রমণ

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে আসার পূর্বে দ্বাদশ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিংশতি বর্ষের জন্য তীর্থভ্রমণে বের হন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩/৯৫ ঈশ্বরপুরী প্রেমবিলাস ৭ম/পৃ. ৭০)। এই ভ্রমণপথে প্রথম তাঁরা উত্তর ভারতে যান, মধ্যে জয়ানন্দমতে (চৈঃ মঃ নদীয়া/৬) তিনি এলাহাবাদে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা নেন। (যদিও এ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস নীরব)। উত্তর ভারত পরিক্রমান্তে পশ্চিমে দ্বারকা তীর্থ হয়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন (মানচিত্র ১ দ্র.)।

নিত্যানন্দ বিংশতি বৎসর তীর্থযাত্রার মাধ্যমে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তদ্দৃষ্ট তীর্থ তালিকাটি সুবিশাল, যথা—বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, যমুনাবিশ্রাম ঘাট, গিরিগোবর্ধন, বৃন্দাবনের দ্বাদশবন, গোকুল, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, সিদ্ধপুর (গুজরাট), মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী (কাঞ্জীভরম), বিষ্ণুকাঞ্চী (ত্রিমঠ), কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর (গুজরাট), প্রভাস, সুদর্শনতীর্থ, ত্রিতকূপ (সরস্বতী তীরবর্তী), বিশালা, ব্রহ্মাতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, প্রাচীসরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, শৃঙ্গবেরপুর, সরযূ, কৌশিকী, পুলস্ত্যাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণ, মহেন্দ্রগিরি, হরিদ্বার, ঋষ্যমূকপর্বত, পম্পা, ভীমা, গোদাবরী, কৃষ্ণবেন্বা, বিপাশা, মাদুরা, শ্রীশৈল, বেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠীপুরী, তিলকাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম, ঋষভপর্বত, দক্ষিণ মথুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, হরিক্ষেত্র, মলয়পর্বত।

বদরিকাশ্রমে তিনি কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন—

এখানে কতদিন নরনারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জনে।।[২৯]

তিনি কেবল ঘুরে বেড়াননি, পরম নির্জনেও মাঝে মাঝে বাস করেছেন। তিনি অবধূত, তিনি যোগী, তাঁর দেশভ্রমণ একটা বিলাস নয়, খেয়াল নয়। বাংলার ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারের যে প্রকাণ্ড মহীরূহ, তা এই সময়ে বীজাকারে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল।[৩০]

তারপর ব্যাসের আলয়ে গিয়ে ভিক্ষাগ্রহণ করলেন। এরপর নিত্যানন্দ বৌদ্ধালয়ে গিয়ে বৌদ্ধদেরও আপনি মতাভিমুখি করলেন।

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়।।[৩১]

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের আলয়।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ।।[৩২]

পুনরায় তাঁর যাত্রা শুরু হল—কন্যাকুমারী, সমুদ্রদর্শন, অনন্তপুর, পঞ্চঅপ্সরা, গোকর্ণ (কেরল), ত্রিগর্তদেশ, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী, রেবা, মাহিষ্মতী ও মল্লতীর্থে গেলেন। এরপর নিত্যানন্দ—

সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা।[৩৩]

প্রভু এবার প্রতীচী অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন—

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্রসহ হৈল দরশন।।[৩৪]

এইভাবে পশ্চিমভারতে যত্রতত্র ভ্রমণকালে দৈবাৎ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন পেলেন। ভক্তিরত্নাকরেও এই সাক্ষাতকারের সমর্থন মিলছে—

কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হৈল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে।।
যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে।[৩৫]

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের প্রেমমূর্চ্ছা—

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিস্পন্দ।।
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্ছিত হই' আপনা পাসরি।।[৩৬]

মাধবেন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের যে-সব কথা হয়েছিল, বৃন্দাবনদাস তা সবিস্তারে লেখেননি। তবে অনেক কথা যে হয়েছিল তার আভাস এখানে পাওয়া যায়।

এইবার মাধবেন্দ্রকে ছেড়ে নিত্যানন্দ আবার ভ্রমণে চললেন। মাধবেন্দ্র গেলেন সরযূ দেখতে। নিত্যানন্দ গেলেন—সেতুবন্ধ রামেশ্বর, বিজয়নগর, মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী, সিংহাচলম, তিরুমলয়, কূর্মক্ষেত্র (কুর্মাচলম), গঙ্গাসাগর, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী। পুরী হতে গঙ্গাসাগর, সেখান থেকে পুনরায় মথুরা-বৃন্দাবনে অবস্থান করেন।[৩৭]

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে বাল্যভাবে লীলা করেন—

নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধুলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে।।
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়।।
কেহ নাহি বুঝে তা'ন চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার।।

কদাচিৎ কোন দিন করে দুগ্ধ পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।[৩৮]

দীক্ষাগ্রহণ

তাঁর দীক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার—সকল তীর্থ পরিভ্রমণে যার সঙ্গী হবার জন্য নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন তাঁর প্রকৃত পরিচয় চরিতসাহিত্য থেকে পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাস এ বিষয়ে নীরব। নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা নেবার ব্যাপারেও নানা মতভেদ আছে।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি—

'প্রয়াগেতে যতিরাজ ঈশ্বরপুরী।
সন্ন্যাস করিল তথা গুরু লক্ষ্য করি'।।[৩৯]

ঈশ্বরপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি নিত্যানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন[৪০]। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণ পুরীকেও নিত্যানন্দের গুরুরূপে অভিহিত করা হয়েছে[৪১]।

আবার চৈতন্যভাগবতে—

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।[৪২]

প্রতীচীতে ভ্রমণ করার সময় স-শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ নিত্যানন্দকে যথোচিত সেবা-যত্নে আপ্যায়িত করেন।

"নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পরমানন্দপৌ
অপারে আয়ে সন্ত-মুক্ত ধারে
করি হরিচর্চ্চা আপসমে
মনোদেবগণ হরিপায় আয়ে"

সমস্ত তীর্থ শেষ করে তিনি যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন, তখনই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হন। তবে নিত্যানন্দ যে বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে আসেন তা যথার্থ নাও হতে পারে। কেননা বিষয়টি বিতর্কিত।

ঈশাননাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' মতে নিত্যানন্দ ব্রজধাম বা বৃন্দাবনে থাকতেই গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের কথা শুনে থাকবেন—

'বহুতীর্থ ভ্রমি শেষে ব্রজধামে গেলা।
তঁহি কিছুদিন রহি প্রভু নিত্যানন্দ।।
গৌরপরকাশে মনে পাইলা প্রেমানন্দ।
তাঁহা হৈতে তিহোঁ শ্রীধাম নবদ্বীপে আইলা।।'[৪৩]

আবার জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ বললেন, নিত্যানন্দ বারাণসী থেকে গৌর-মহিমা শুনেই নবদ্বীপ ধামে এসেছিলেন—

নিত্যানন্দ গোসাঞি আছিলা বারাণসী।
গৌরাঙ্গ মহিমা শুনি নবদ্বীপ আসি।।[৪৪]

আবার 'প্রেমবিলাস'কারের মতে ঈশ্বরপুরীই তাঁকে গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের কথা জানিয়ে নবদ্বীপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন।
তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন।।[৪৫]

জয়ানন্দ[৪৬] ও লোচনদাস জানিয়েছেন যে তিনি লোকমুখে গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে নবদ্বীপে যাত্রা করেন[৪৭]। চৈতন্যভাগবত অনুসারে বিংশতি বর্ষ তীর্থ পরিক্রমার পর মথুরা-বৃন্দাবনে থাকাকালীন তিনি অনুভব করেন—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে।।[৪৮]

আবার,

'হইলা অধৈর্য্য সে প্রভু আকর্ষণে
নবদ্বীপে গমন করিলা ব্যস্তমনে।।' (৪৮ক)

এবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্য নামে এক পরম বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

জয়ানন্দের মতে সেই সময়ে মুকুন্দ ভারতী গৌরাঙ্গের নিকট গিয়ে নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন[৪৯]। অন্যদিকে বৃন্দাবনদাস বলেন, নবদ্বীপে যে নিত্যানন্দের আগমন হয়েছে তা গৌরাঙ্গ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন—

আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে।।
তালধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার।।
তা'র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির।।
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে।।
বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝি যে চরিত্র।।[৫০]

এরপরের ঘটনা, নিত্যানন্দের সন্ধানে গৌরচন্দ্র যবন হরিদাস এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা দেখে আস নিতাই কোথায় আছে—

চল হরিদাস! চল শ্রীবাসপণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন ভিত।।[৫১]

এঁরা যখন সারা নবদ্বীপ খুঁজে নিতাইর সন্ধান পেলেন না, তখন গৌরচন্দ্র নিজেই ভক্তবৃন্দসহ নন্দনের গৃহে হাজির হলেন।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে নিতাইর সুন্দর রূপের বর্ণনা করেছেন। 'ঘূর্ণিত লোচন বারুণী মদে মত্ত' নিত্যানন্দ অবধূত বেশে বসে আছেন। তাঁর বিরাট দেহ, কোটিসূর্যসমকান্তি, কটিতটে পীতবাস, শিরে লটপটি পাগ এবং ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর। তিনি ভাবমদে প্রমত্ত এবং ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ রয়েছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন।[৫২] 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের অপরূপ রূপের বর্ণনা করেছেন।[৫৩] নিত্যানন্দের এই রূপের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ[৫৪]। চূড়ামণি দাসও নিত্যানন্দের অপরূপ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে[৫৫]। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে বিশেষত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের মাটিতে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মিলন

বিশ্বম্ভরের ভুবন ভুলানো রূপ নিতাইকে স্তম্ভিত করেছে[৫৬]। নন্দন আচার্যের গৃহে যখন নিতাই-গৌর-এর মিলন হল তখন কি অপূর্ব পরিবেশ। আমরা চরিত-গ্রন্থগুলিতে পাই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ-এর দার্শনিক তাৎপর্য, যেমন—

i) বৈষ্ণব দর্শনে ও ভক্ত সমাজে গৌরাঙ্গ যেমন কৃষ্ণাবতার, নিত্যানন্দ তেমনি বলরামের অবতার। অতএব নিমাই-নিতাই-এর মিলনের মধ্য দিয়ে দার্শনিকভাবে কৃষ্ণ-বলরাম ধারণাটি পূর্ণতা পেল।

ii) এই মিলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ভ্রাতৃবাৎসল্য রসটি প্রতিষ্ঠিত হল।

চৈতন্য ভাগবতকার লিখেছেন—

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর।।
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়।।
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ।।
এইমত নিত্যানন্দ হৈলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত।।[৫৭]

নিত্যানন্দ অবাক হয়ে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে দেখলেন আর ভাবলেন, এই সেই আমার প্রাণের কৃষ্ণ। দুইজনেই স্তব্ধ। একটা স্তম্ভিত ভাব যেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর',[৫৮] লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'[৫৯] ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এও এই মিলনদৃশ্যের মনোহর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে[৬০]। আবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গৌরাঙ্গ পরিজন'-এ '২২ পৃঃ' দেখতে পাই নিমাইয়ের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নিত্যানন্দ। তখন

নিত্যানন্দ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, তুই সেই কানাই নারে? কিন্তু তোর চুড়ো আর বাঁশী কই? নিমাই তখন অস্ফুট সুরে উত্তর দিল—

ব্রজের খেলা দৌড়া দৌড়ি।
নদের খেলা গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশির কান।
নদের খেলা হরিগান॥
ব্রজের বেশ ধরাচূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা॥

নদীয়ার পণ্ডিত, মূর্খ সকল ভক্তগণ মিলে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের শুভ মিলনের পরদিন আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীবাস মন্দিরে নিতাই ব্যাসপূজা করলেন। ব্যাসের উদ্দেশ্যে মালা দিতে গেলে সেই মালা শ্রীচৈতন্যের মস্তকে পড়ল। এই মিলনের অপেক্ষায় উভয়েই যেন প্রতীক্ষারত ছিলেন। এরপর প্রেমবিহ্বল নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের নাম ও প্রেম বিতরণলীলা চলল নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে। শ্রীবাস অঙ্গনে বিবিধ লীলাবিলাস ও ষড়ভুজ দর্শন হল। নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে পিতা এবং মালিনীকে মাতা জ্ঞানে গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দের বাল্যভাব প্রকট হল—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্বকলেবর॥[৬১]

শ্রীবাসগৃহে নিত্যানন্দ যে রাত্রি যাপন করলেন, সেই রাত্রি তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করল। এই রাত্রিতেই তাঁর সন্ন্যাস জীবনের একমাত্র দণ্ডকমণ্ডলু তিনি বিরাট এক অন্তর্বিপ্লবের তাড়নায় পরিত্যাগ করলেন।

নিত্যানন্দের তখন পূর্ণ যৌবন। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে সর্বদেহে নিরন্তর বাল্যভাব প্রকাশিত হত। নিত্যানন্দের এইরূপ অনাড়ম্বর সরলতা ও বাহ্যনিরপেক্ষ আচরণ দেখে শচীদেবীর হৃদয়ে বিশ্বরূপ স্মৃতি জাগরিত হয়ে উঠল। এর ফলে তিনি নিত্যানন্দকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করে তাঁর সমস্ত অত্যাচার আবদার নির্বিবাদে সহ্য করেছিলেন এবং নিত্যানন্দকে সন্তানের স্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় নিত্যানন্দ কখনো কৃষ্ণ প্রেমে আকুল, কখনও গৌরাঙ্গ প্রেমে আত্মহারা, কখনও বা বাল্যভাবে বাহ্যজ্ঞান রহিত। দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে তিনি গৃহবাসী হলেন। চরিতকাররা তাঁর এইরূপ আচরণকে প্রেমোন্মত্ততা বলে বর্ণনা করলেও আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাই না। তাঁকে যেন এই সময়ে খানিক ভারসাম্যহীন বলে মনে হয়। যদিও বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥[৬২]

ভক্ত সমাজ তাঁর এই আচরণ স-শ্রদ্ধচিত্তে মেনে এসেছেন। শচীমাতা তাঁর মধ্যে বিশ্বরূপকে দর্শন করে যেমন তৃপ্ত হয়েছিলেন, গৌরাঙ্গও তেমনি নিত্যানন্দের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাসী বিশ্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। তাই নিত্যানন্দের প্রতি নিমাইর শ্রদ্ধা হয়েছিল অটুট।

নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ থেকে চৈতন্যদেবের লীলা প্রচার ও তাঁর সমস্ত কাজের সহায়করূপে বিরাজ করেছেন। চারিদিকে কৃষ্ণনাম এবং জীবপ্রেম প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। শান্তিপুরে এসেই নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের সাক্ষাৎ হয়—

দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ।।[৬৩]

এমনকি অদ্বৈত নিত্যানন্দের স্তুতি করেন—

করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষ করে নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি।।[৬৪]

কিন্তু নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের কলহ সর্বজনবিদিত। চরিতকাররা এই কলহের মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করে বলেছেন—

তবে যে কলহ হের অন্যে হন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে।।[৬৫]

পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতিরও বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ববান। নিত্যানন্দ প্রথম থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ। আচার্য সুকুমার সেনের ভাষায় "তিনি ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজন পানে বীরাচারী"[৬৬]। তিনি বুঝেছিলেন যুগ প্রয়োজন। তাই চৈতন্যদেবকেও তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ধর্মপ্রচারের কারণ দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন।

নিত্যানন্দের জগাই ও মাধাই উদ্ধার প্রসঙ্গ

নিত্যানন্দের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা জগাই-মাধাই উদ্ধার। এই মহৎ কাজের জন্য তিনি সর্বজনমান্য হয়েছিলেন। জগন্নাথ রায় ও মাধব রায় নামে দুইজন ব্রাহ্মণ সন্তান নবদ্বীপে কোটাল ছিল। গৌরাঙ্গের আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের নদীয়ার পথে পথে কৃষ্ণনাম বিতরণ করবার সময় এই দুই পাষণ্ড ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এরাই জগাই-মাধাই নামে পরিচিত। নারী নির্যাতন, মদ্যপান, ডাকাতি, চুরি হেন হীন কর্ম নেই যা তারা করত না। সেই লম্পট কু-চরিত্র দুই ভাইকে দেখে নিত্যানন্দের হৃদয় করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে যায়। তিনি তাদের কৃষ্ণনাম নিয়ে উদ্ধার হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু পাষণ্ডীরা সন্ন্যাসীর আহ্বান শুনে তাঁদের মারতে যান। হরিদাস অবশ্য এই পাষণ্ডীদের আহ্বান করার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেন। গৌরাঙ্গ পাষণ্ডীদের এই ঔদ্ধত্য প্রকাশে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।'[৬৭] কিন্তু নিত্যানন্দ নিজের পূর্বসিদ্ধান্তে অবিচল থেকে তাদের কাছে আবেদন জানান।

এরপর জগাই-মাধাই মহাপ্রভুর গৃহের সন্নিকটে গঙ্গাঘাটে আস্তানা গাড়ল। একরাত্রে নিত্যানন্দ সেই পথ দিয়ে আসবার সময় মাধাইয়ের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। তাঁর মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। জগাই অবশ্য এই ঘটনায় তাড়াতাড়ি মাধাইকে নিরস্ত করে সন্ন্যাসী নিগ্রহ থেকে। গৌরাঙ্গের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ছুটে এলেন এবং—

শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই-মাধাই পানে চলিলা ধাইয়া।।[৬৮]

কিন্তু নিত্যানন্দ ভাবলেন 'ঐশ্বর্য' প্রকাশের দ্বারা নয়, করুণার দ্বারা পতিতোদ্ধার করবেন, তাই—

নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভুপদে বিনয় করিয়া।।
এই দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।[৬৯]

নিত্যানন্দের হৃদয়ের এই ঔদার্যে গৌরাঙ্গ পুলকিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। জগাই-মাধাইও এই ঘটনায় বিস্মিত হল। তারা নিত্যানন্দের চরণে আশ্রয় নিল।

তিনি বললেন—

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত।।[৭০]

ক্ষমার এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। মাধাই যখন নিজ দুষ্কর্মের জন্য নিত্যানন্দের পদতলে পড়ে কাঁদছে, তখন নিতাই তাকে সান্ত্বনা দেন—

শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়।।[৭১]

এইভাবেই মানবরূপী দেবতা বিশ্বপ্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপিত হয়ে পতিত সমাজ তথা সমগ্র মানব সমাজকে উজ্জীবিত করেছিলেন।

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা শেষ হয়ে এলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন এবং নিত্যানন্দের নিকট সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন। দীক্ষাগ্রহণান্তরে রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গ লীলা

আগেই উল্লেখ করেছি নিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। তাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে পরিভ্রমণকালে তিনি নানা কাহিনী বর্ণনা করে ভক্ত সমাজ ও স্বয়ং মহাপ্রভুর আনন্দবিধান করতেন। এইভাবে মহাপ্রভু ক্রমে অগ্রসর হতে থাকলে অবধূত নিত্যানন্দ এবং অন্যান্য ভক্তগণ মহাপ্রভুর বহু পিছনে পড়ে রইলেন। উড়িষ্যা যাত্রাকালে নিত্যানন্দ তাঁর হাতের দণ্ডখানি ভেঙে ভার্গী নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। এই ঘটনায় মহাপ্রভু মনে দুঃখ পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কি লাগে ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি।।[৭২]

এই ঘটনায় গৌরাঙ্গ সর্ববন্ধন মুক্ত হলেন। কারণ অভিমান ভরে তিনি বললেন—

'এতেকে আমার সঙ্গে কা'রো সঙ্গ নাই।'[৭৩]

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যেভাবেই হোক না কেন, নিত্যানন্দের দ্বারাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সকল অনুষ্ঠান সু-সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর জীবনে নিত্যানন্দের যে প্রয়োজন আবশ্যিক ছিল সেই প্রয়োজন শেষ হল, তিনি স্বতন্ত্র হলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে সহায়তা করলেন সর্বতোভাবে।

নিত্যানন্দের অভিনব ধর্মপ্রচার পদ্ধতি

এরপর চৈতন্যদেবের আদেশে ভক্তি প্রচারার্থে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে চলে এলেন। গৌড়দেশে এসে—

তিনমাস রৈয়া নিত্যানন্দ গৌড় গেলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন পাতিলেক খেলা।।
তবে নিত্যানন্দ বৈল ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড় দেশে।।[৭৪]

দেখা যাচ্ছে নিত্যানন্দই প্রথম রাঢ়ে ও গৌড়ে মহাপ্রভুর মূর্তিপূজার প্রচলন করেন। বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে যে গৌরাঙ্গের মূর্তিপূজার প্রচলন আছে—এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দই প্রথম পানিহাটীকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে যে গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম ও জীবপ্রেম প্রচার করেছিলেন জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর বিজয়খণ্ডে আমরা তার বিস্তৃত বিবরণ পাই—

আগে পানিহাটী আর আক্‌না মাহেশ।
পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ় দেশ।।
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দা কোটাল তাম্বুলি পাথরঘাটা।।
হাথিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোতরঙ্গ বানেদিরঙ্গ চাতরা মনোহর।।
হাথিয়াকান্দা পাঁচপাড়া বেতরবূঢ়ন।
অম্বুয়া বড়গাদি কাঁচপাড়া সু-পত্তন।।
কাশীআই পঞ্চ আঙ্গারিআদহ কলিআ।
খানা কুলিয়া চৌড়া দোগাছিয়া।।
নিমদা চৌয়রিগাছা উদ্ধরণপুর নৈহাটী।
বসই বেনড়াখণ্ড হাটাই চরখি।।

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রাএ।
রুনু ঝুনু কনক নূপুর বাজে পাএ।।
স্বর্ণ বৈদুর্য্য বিদ্রুম মুক্তা দাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ দেখি অনুপাম।।
হেমাজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙ্গা চরণ যুগলে।।[৭৫]

এইভাবে প্রতি গ্রামে নিত্যানন্দ মহোল্লাসে ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে কোল দিলেন। তাঁর এইভাবে ধর্মপ্রচারের কথা মহাপ্রভু নীলাচলে বসে সব শুনছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও সনাতনের ধর্ম প্রচারের সঙ্গে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রচার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ষোড়শ শতাব্দীতেই নিত্যানন্দের প্রবর্তিত ধারা গৌড়ে ও রাঢ়ে প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসতত্ত্ব ও নিত্যানন্দের প্রবর্তিত তত্ত্ব একত্রিত হয়ে প্রবাহিত হয়।[৭৬]

নিত্যানন্দের আচার-বিচার অত্যন্ত উদার ছিল। স্মার্ত নিয়মকানুন তিনি বড় একটা মানতেন না। সেই কারণেই অদ্বৈত আচার্য পরিহাস করে নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছ ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহো না জানি কোখাত।।
পিতামাতা গুরু আদি নাহি জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায় অবধূত।।[৭৭]

মহাপ্রভু নিজে কঠোর সন্ন্যাস ব্রত পালন করেছিলেন পুরীতে। কিন্তু গৌড়দেশে নিত্যানন্দের জীবনাচরণ পদ্ধতির সম্বন্ধে অনেকেই কটাক্ষপাত করে মহাপ্রভুর নিকট নালিশ জানান। নীলাচলে এক সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—

বিপ্র কহে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে যদি দেহ মন।।
নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুই না বুঝোঁ করেন কিরূপ।।
সন্ন্যাস আশ্রমতান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল যে ভক্ষণ অনুক্ষণ।।
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে।।
কাষায় কৌপিন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস।।

দণ্ডছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্ব্বক্ষণে।।
শাস্ত্রমত মুঞি তার না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহের চিত্তে সন্দেহ অপার।।
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচারণা করেন কেনে।।[৭৮]

ব্রাহ্মণের সন্দেহের কথা শুনে মহাপ্রভু হেসে উত্তর দিলেন—

শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়।।
পদ্মপাত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল।।
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে।।[৭৯]

এবং তিনি ব্রাহ্মণকে আরও বললেন—

অধিকারী বই করে তাঁহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার।।
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ।।[৮০]

কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আমরা যেন গৌরাঙ্গের অন্য সুর শুনতে পাই—

নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা।
নিত্যানন্দে গৌড়রাজ্য প্রভু সমর্পিলা।।
কতদিনে নিত্যানন্দ রথযাত্রা কালে।
সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে গেলা নীলাচলে।।
গৌরচন্দ্রে জিজ্ঞাসিল শ্রীপাদ গোঁসাই।
তোমার গৌড়রাজ্যে কার অধিকার নাই।।
কর্ত্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহার নূপুর আভরণে।।
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে।।[৮১]

এখানে আমরা দেখি নিত্যানন্দের আচরণ মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁকে বোঝালেন যে স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী প্রচার পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন—

'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে'।[৮২]

একথা বলে তিনি নিজ মত ও প্রচার পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখলেন।

চৈতন্যের অভিষেকের মতো পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে মহাসমারোহে নিত্যানন্দের অভিষেক হয়েছিল। অভিষেকের সময় তিনি নানা আভরণ অলঙ্কার ধারণ করেছিলেন। অলঙ্কার ধারণ করে তিনি প্রচারে বের হয়েছিলেন।

এরপরের ঘটনা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ থেকে জানতে পারি যে, নিত্যানন্দ যে পানিহাটীতে চিঁড়া মহোৎসবের আয়োজন করেন এবং মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে'।[৮৩]

এই মহোৎসবগুলি বৈষ্ণব ভক্তদের মিলন উৎসব এবং সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ মুছে গিয়ে মহামিলন সংগঠিত হত। নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপ বহু মিলন উৎসবের আয়োজন করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। মহোৎসবের জাতিভেদ ভেঙে পংক্তি ভোজনের প্রবর্তন করেছিলেন—

'জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে'।[৮৪]

এইভাবে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার 'চণ্ডাল যবন'কে আত্মসাৎ করে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে অগ্রসর হয়ে চলেছিল। এত বড় বিপ্লব ইতিহাসে দুর্লভ।

শ্রীনিত্যানন্দের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মের প্রচারের ফলে এক বিরাট বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হয়। নিত্যানন্দের নেতৃত্বে গঠিত এই বৈষ্ণব সমাজে কোনো জাতিভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বণিক সকল জাতিতে মিলে একে অপরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন।

মহাপ্রভু আচণ্ডালে কোল দেবার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, নিত্যানন্দ তাঁর সেই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মহাপ্রভুর প্রচার কার্যের সহায়তা করেছিলেন। যবন-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সকলকে একত্রিত করে সামাজিক সাম্যবাদের বীজ রোপণ করেন। তাঁর প্রচারের কেন্দ্র পানিহাটী এবং খড়দহে এই সাম্যবাদ মহীরূহ আকার ধারণ করে।

শ্রীনিত্যানন্দের আয়োজিত মহোৎসবে ছত্রিশ জাতি এক পংক্তিতে বসে ভোজন করে যা মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

চিঁড়া-দধি মহোৎসব নামে খ্যাতি যার।

*** *** ***

এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিঁড়া ভিজাঞা।
অর্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া।।
আর অর্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা, চিনি ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল।।

*** *** ***

উদ্ধারণদত্ত আদি যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন।।

শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা।।[৮৫]

চিঁড়া মহোৎসবের এই পংক্তিভোজনে হিন্দু সমাজে জাতিভেদের সংকীর্ণতা প্রায় মুছে গিয়েছিল। এই জাতিভেদ বিরোধী মহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা আজও আমাদের জীবনের আদর্শস্বরূপ। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের জন্যই নিতানন্দের এইসব সংকীর্তন মহোৎসব ইত্যাদির আয়োজন এবং প্রচারের সফলতা প্রায় আকাশ স্পর্শ করেছিল একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এইজন্যেই আমরা তাঁকে মধ্যযুগীয় ডিমোক্র্যাসীর অন্যতম সৃষ্টিকর্তা এবং ডিমোক্র্যাট রূপে আখ্যাত করতে পারি।

বাঙালি হিন্দু সমাজের ইতিহাসে চিঁড়া মহোৎসব একটি বৈপ্লবিক ঘটনা আর এই মহোৎসবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ দাস ছিলেন বাস্তবিক নিত্যানন্দ তথা প্রভুপ্রেমে মত্ত। ধনী পরিবারের অন্তর্গত হয়েও তাঁর ঈশ্বরপ্রেমের গভীরতা ও প্রবাহ ছিল সপ্তগ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সরস্বতী নদীর মতো। ষোড়শ শতকে পানিহাটীর যে ঘাটে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভু অবতরণ করেছিলেন সে ঘাট প্রায় হাজার বছর আগেকার বলে অনুমান করা যায় কিন্তু কে সেই ঘাট তৈরি করেছিলেন তা জানা যায় না। পরবর্তীকালে যাকে শ্রীচৈতন্য ঘাট বলে অভিহিত করা হয়েছে, সে ঘাট আজ আর নেই। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পে বা জলকম্পে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে ঐ ঘাটের ছোট বড় ভাঙা টুকরোগুলো গঙ্গাবক্ষে তীরের নিকট দেখা যেত—যা প্রবীণ মানুষরা এখনও স্মরণ করতে পারেন। সেই প্রাচীন শ্রীচৈতন্য ঘাট আজ আর নেই বটে কিন্তু অক্ষয় বটবৃক্ষ যার তলায় প্রভু নিত্যানন্দ চিঁড়া মহোৎসব করেছিলেন সেই স্মৃতিবিজড়িত বেদী আজও বর্তমান।

কয়েকশো বছর আগেই বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ হিসাবে পানিহাটীর পরিচিতি ঘটেছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই তীর্থস্থানটির স্মৃতি রক্ষার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রদেশের আটলান্টা নামক স্থানের নামকরণ করা হয়েছে—'নিউ পানিহাটী'। আমেরিকার ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস এক কথায় ইস্‌কন (Iskcon)-এর ভক্তিবেদান্ত ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীজয়পতাকা স্বামীর চিঠিতে জানা যায়—"Iscon temple in Atlanta, Georgia, U.S.A. has been declared that shall henceforth be called 'New Panihati". শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের অবতরণের সেই প্রাচীন ঘাটের দুখানি ইট আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরের উইন্টার পার্কে (Walk of Fame) স্মারকস্তম্ভে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত ঘাটের চিহ্ন হিসাবে সযত্নে রক্ষিত আছে (বাংলার তীর্থ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য)।

শ্রীচৈতন্য পানিহাটীতে (পেনেটিতে) যে প্রেম প্রবাহ এনেছিলেন তাতে তুফান উঠেছিল প্রভু নিত্যানন্দের উপস্থিতিতে। হরিপ্রেমের আন্দোলনে শ্রীচৈতন্যের পরেই নিত্যানন্দের

ভূমিকা বিরাট। অবশ্য পেনেটির পাটে নিত্যানন্দের মহিমা ও প্রভাবই প্রধান। ১৪৩৮ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দ পেনেটিতে এক নাগাড়ে তিন মাস হরিকীর্তন বিলাস করেছিলেন। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

এইরূপে পানিহাটী গ্রামে তিনমাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিত শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্ধের কারো নাহি স্ফুরে॥
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম সুখে নৃত্য বই নাহি আর॥[৮৬]

প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদ রাঘব ভবনে বাস করেছিলেন তিন মাস। নৃত্য ও নাম সঙ্কীর্তনে তা হয়ে উঠেছিল যেন দ্বিতীয় নবদ্বীপ। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় অবস্থিত। সপ্তগ্রামের বর্তমান নাম আদি সপ্তগ্রাম। এর দক্ষিণাংশে কৃষ্ণপুর। এখানে শাশ্বত সুন্দরী সরস্বতী নদী বহমান। পূর্বে সপ্তগ্রাম বলতে সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শঙ্খনগরকে বোঝাত। তখন সপ্তগ্রামের ভূসীমানা যশোহরের ভৈরব নদ থেকে রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিনদেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম॥[৮৭]

গৌড়ের পাঠান বাদশাহ, হিরণ্য ও গোবর্ধন এই দুই ভাইকে সপ্তগ্রাম ইজারা দিয়েছিলেন। তাঁরা গৌড়াধিপতিকে বার্ষিক রাজস্ব দিতেন আট লাখ টাকা। রাজস্ব ছাড়া দু-ভাইয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ১২ লাখ টাকা। হিরণ্য ছিলেন অপুত্রক। গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ ছিলেন এই বিপুল বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি আশৈশব সংসার বিরাগী। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি বিবাহ করে নিরাসক্ত-ভাবে সংসার করেছিলেন। সপ্তগ্রামের রাজবাড়ির কুলপুরোহিতের নাম ছিল যদুনন্দন আচার্য। যদুনন্দনের দীক্ষাগুরু ছিলেন শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। একবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে এসেছিলেন। এই সময় বালক রঘুনাথ পিতা গোবর্ধন দাসের সঙ্গে চাঁদপুরে এসেছিলেন। এখানে তিনি সর্বপ্রথম হরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন।

আর সেই বালক বয়সেই রঘুনাথের হৃদয়ে গৌর অনুরাগের ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই এমন এক একটি ঘটনা ঘটে যা অভূতপূর্ব। ভাষায় ব্যাখ্যা করাও কঠিন। এরকম ঘটনা মানুষের চেতনাকে ভীষণভাবে জাগ্রত করে দেয়। পুরাতন সব কিছু যা ভুলে ও ভ্রান্তিতে ভরা তার মূলে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে অজান্তেই মনের মধ্যে এক নূতন বীজ বপন করে দিয়ে যায়। আর সেই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত রৌদ্রতাপ জল ও পরিচর্যা পেলে মানুষের যে পুণর্জন্ম হয় এবং তার থেকেই বুঝি শুরু হয় আগামী দিনের কোনো এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। আর বালক রঘুনাথ দাসের হৃদয়ে যখন গৌরের পূর্ণ অবস্থান তখন যদুনন্দন পুজোপাঠ ও দৈবক্রিয়াকর্মের জন্য সপ্তগ্রামের জমিদারবাড়িতে আসতেন। যদুনন্দনের কাছ থেকে মহাপ্রভুর নানা কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দার্শনিক সুলভ হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবে তিনি যদুনন্দনকে শ্রীগুরুপদে ও যদুনন্দনের একান্ত আপনজন বাসুদেব দত্তকে একজন প্রাণসখা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। আর এদের সকলের সহযোগে রঘুনাথের হৃদয়ে গৌর-অনুরাগের অঙ্কুরিত বীজ ক্রমশ মহীরূহে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে মহাপ্রভুর উপদেশ শুনে সেদিন রঘুনাথ বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেও সারাক্ষণ রঘুনাথের গৌর-ভাবনা। তাতে পিতামাতা পুত্রের বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রঘুনাথ লাবণ্যময়ী সুন্দরী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বাড়ির বহিরাংশে অবস্থিত মন্দিরে সারাদিন অবস্থান করা শুরু করলেন এবং অন্তঃপুরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শুনতে পেলেন নিত্যানন্দ ও তাঁর পার্ষদগণ পানিহাটী রাঘব ভবনে আছেন। একথা শুনে তিনি ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তবে অত্যন্ত চতুরের মতো নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দৃঢ় সংকল্পটি পিতামাতার কাছে অপ্রকাশ রেখে এবং তাঁদেরই অনুমতি নিয়ে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথ পালিয়ে নৌকায় চড়ে নিত্যানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন মাঝি ছিল পানিহাটী গ্রামের সুজন। রঘুনাথ তো কিছুই চেনেন না, সুজন তাকে নানাগল্পচ্ছলে যখন গ্রামটির পরিচয় দিচ্ছিলেন আর বার বার বলছেন গৌরাঙ্গ ঘাট। অবশেষে অদূরে গৌরাঙ্গ ঘাট দেখা গেলে সুজন ভাবরসের আনন্দে যা বলছেন—

ঐ দেখরে গৌরাঙ্গঘাট সুধাপানির হাট।
হাট বসেছে হরিনামের হাট॥
ঘাটের পানি, হাটের পানি প্রেমভক্তি সুধাপানি,
পান করে যাও সুধাপানি, এসে পানির হাট॥[৮৮]

অর্থাৎ প্রকৃত পানি ও নানা ভাবপানির হাট। হরিনামের যে হাট অর্থাৎ প্রাচুর্য। সেখানে হরিনামের পানি, প্রেম-ভক্তির অমৃতরস অর্থাৎ সুধাপানি এবং চারিদিকে যে জলাঞ্চল তার পানি। যে স্থানে বিভিন্ন পানি মিলবে বৈষ্ণবদের জন্য সেই স্থানই পানির

হাট অর্থাৎ নানা পানির সমাহার। সম্ভবত স্থানটি বৈষ্ণব ভক্তি ও ভাবরসের ব্যঞ্জনা থেকেই চলতি কথায় পানির হাট পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যে পানিহাটী নামে পরিচিত হয়।

উল্লেখ্য সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ দাস ১৪৩৮ শকাব্দে পানিহাটীতে ছুটে এসেছিলেন। তিনি আত্মসমর্পণ করেন প্রভু নিত্যানন্দের চরণে। সেদিনটি ছিল ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের মিলনদৃশ্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ—গোসাঞির পাশ চলিলা আরদিনে।।
পানিহাটি গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন।
কীর্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন।।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডর উপরে।
বসিয়াছেন—যেন কোটী সূর্যোদয় করে।।
তলে উপরে বহুভক্ত হঞেছে বেষ্টিত।
দেখি' প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কতদূরে।।
সেবক কহে, রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে।
শুনি প্রভু কহে, "চোরা দিল দরশন।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন।।
প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিলা চরণ।।
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়,
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয়।।
নিকটে না আইস, চোরা থাক দূরে দূরে।
আজি লাগ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে।।
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে।।
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য এবং লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।।
চিড়া, দধি দুগ্ধ, সন্দেশ আর চিনি কলা।

সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।[৮৯]

রঘুনাথের চোর অপবাদের বিবিধ ব্যাখ্যা। গোঁড়া বৈষ্ণবদের মতে শ্রীগৌরসুন্দর নিতাইচাঁদের সম্পত্তি। কারণ নিতাই-সূর্যের আলোকে গৌরাঙ্গ আলোকিত। প্রেমের স্বভাব প্রেমাস্পদকে অধীন করে ফেলা। প্রেমাস্পদকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার সামর্থ্য আছে গাঢ় প্রণয়ে। নিতাই প্রেমে গৌর অধীন হয়ে গিয়েছেন, সর্বতোভাবে বিকিয়ে গিয়েছেন নিতাইয়ের কাছে। ধন্য নিতাই প্রেম। একমাত্র প্রেমই এই অসাধ্যসাধন করতে পারে। নিতাইচাঁদ কৃপা করে যাকে সুযোগ দেন সে-ই শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় পায়, অন্যে নয়। রঘুনাথ নিতাইচাঁদের অজ্ঞাতে দুবার শান্তিপুরে এবং একবার নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের সান্নিধ্য কৃপা লাভ করেছিলেন। এটা রঘুনাথের পক্ষে নিত্যানন্দের ধনচুরির সামিল।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, রঘুনাথ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েও আসক্তির ভাণ করেছিলেন। এই মিথ্যাচারণের জন্য নিত্যানন্দ তাঁকে বলেছিলেন চোর।[৯০] ড. সেনের মতে রঘুনাথই একমাত্র শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। অপর মতে রঘুনাথ লুকোচুরি করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের দর্শন-স্পর্শন করেছিলেন, সে কারণে তাঁর 'চোর' আখ্যা। আবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের কৃষ্ণনাম ও জীব প্রেম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহজ মাহাত্ম্য বিশেষভাবে রঘুনাথকে আকর্ষণ করে। তিনি অল্পবয়সেই সংসার ত্যাগ করে পরমার্থ লাভের ইচ্ছায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বা নিত্যানন্দ প্রভুর খোঁজে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। অবশেষে পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পান এবং তাঁর নামসংকীর্তনে মুগ্ধ হন। পানিহাটী গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে দণ্ড দেন। সেই দণ্ড বা শাস্তি হল নিতান্ত অল্পবয়সে পিতামাতা ও নববিবাহিতা স্ত্রীকে এবং সংসার ছেড়ে আসার জন্য। সে দণ্ড ছিল সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে চিড়া দধি মিষ্টান্ন সহযোগে ফলার বা ফলাহার বিতরণ।[৯১]

আজ রঘুনাথ হরিনামের আকর্ষণেই ছুটে এসেছেন প্রভু নিত্যানন্দের নিকট। নিত্যানন্দ চোরের দণ্ড দিলেন। নিত্যানন্দের কৃপামধুর শাসনে উল্লসিত রঘুনাথ দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে।।
*** *** ***
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন।।[৯২]

রঘুনাথ দাসের উপর অহৈতুকী কৃপা হয়েছিল নিত্যানন্দের। স্বগণকে ভোজনে তৃপ্ত করার জন্য নিত্যানন্দ রঘুনাথকে আদেশরূপ দণ্ড দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি দণ্ড

মহোৎসব দ্বারা ভোগী বিষয়ীর হৃদয়ে অর্থের প্রতি অনীহা জাগিয়েছিলেন। পানিহাটী গ্রামে চিঁড়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ এবং নিত্যানন্দের গণ সেই অনুষ্ঠানে উপবেশন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগদান করেছিলেন সেই তালিকায় ছিলেন—সর্বশ্রী রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, চৈতন্যদাস প্রভৃতি নিত্যানন্দগণ; সুতরাং মুরারি গুপ্ত নহে কমলাকর পিপ্পলাই, সদাশিব কবিরাজ, পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, হোড় কৃষ্ণদাস (বরগাছি নিবাসী) এবং উদ্ধারণ দত্ত।

বিপ্রগণ সকলে উপস্থিত হয়ে মান্য করে প্রভুকে সবার উপরে বসালেন। সর্বাগ্রে নিত্যানন্দকে প্রসাদ প্রদান করা হয়েছিল। নিত্যানন্দ গোপের অভিমানে ব্রজলীলার উদ্দীপন ঘটিয়েছিলেন। সখাদের সঙ্গে যমুনা তটে পুলিন ভোজনের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ধ্যানযোগে মহাপ্রভুকে এনে তাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগদর্শন ঘটেছিল। মহাপ্রভু ও নিতাই একে অপরকে চিঁড়া খাইয়েছিলেন।

সকল লোকের চিঁড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥

*** *** ***

*** *** ***

হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥[৯৩]

প্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করে অসংখ্য মালসায় সাজানো সকলের চিঁড়া দেখিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ পরিহাসপূর্বক প্রত্যেক মালসা থেকে এক এক গ্রাস মহাপ্রভুর মুখে তুলে দিয়েছিলেন। তিনিও সহাস্যে এক এক গ্রাস নিত্যানন্দের মুখে তুলে দিয়েছিলেন। কোন কোন ভাগ্যবান বৈষ্ণব ভাবচক্ষে দেখেছিলেন এই প্রেমলীলা। অতঃপর নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু পাশাপাশি দুই আসনে বসে চিঁড়া ভোজন করেছিলেন তখন—

'হরি' 'হরি'—ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন।
হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন॥[৯৪]

ভক্তদের মনে হয়েছিল তাঁরা যেন যমুনা পুলিনে শ্রীহরির সঙ্গে পুলিন ভোজন করছেন। পানিহাটীকে তখন মনে হয়েছিল যেন নব-বৃন্দাবন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রসাদ পেয়ে রঘুনাথ যেন ধন্য হয়েছিলেন। এবং রঘুনাথ নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে বসেছিল হরি-সঙ্কীর্তনের কী রকম জম-জমাট আসর। কবিরাজ গোস্বামী তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন—

"ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেম জগৎ ভাসায়॥

নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে
মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে।।[৯৫]

নিত্যানন্দের সেখানে নানা ভাবাবেশ ঘটেছিল। রঘুনাথকে উভয়েই কৃপা করেছিলেন। মহাপ্রভু ছিলেন নিজে নিত্যানন্দের প্রেমের বশ। সন্ধ্যায় রাঘব মন্দিরে কীর্তনের আসরে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করেছিলেন মহাপ্রভু—

মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দরশন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন।। চৈ. চ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালবেলায় গঙ্গাতীরে গাছের নীচে বসে থাকা নিত্যানন্দকে চৈতন্য চরণ প্রাপ্তির ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন রঘুনাথ। আসলে নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া চৈতন্যপদ প্রাপ্তি ছিল অসম্ভব। তিনি যদি কৃপা করেন তবে অযোগ্যজনও চৈতন্যচরণ লাভ করতে পারেন। এমতাবস্থায় নিত্যানন্দের কাছে তিনি চৈতন্যপদ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁর প্রিয় ভক্তদের অনুরোধ করেছিলেন রঘুনাথকে আশীর্বাদ করার জন্য। নিত্যানন্দ রঘুনাথের মাথায় চরণ রেখে তাঁর প্রভু কৃপা-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেছিলেন। সেখানে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। রঘুনাথের প্রতি কৃপাও করেছিলেন গৌরচন্দ্র। রঘুনাথ যে গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভৃত্য হবেন একথা বলেছিলেন নিত্যানন্দ—

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি রাখিব চরণে।।
নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।।[৯৬]

নিত্যানন্দের অনুমতি নিয়ে রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে রঘুনাথ সকলকে প্রণামী দিয়েছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে প্রণামী দিয়েছিলেন সাত তোলা সোনা ও একশো টাকা। রাঘব পণ্ডিতকে দুই তোলা সোনা ও একশো টাকা। প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিতজন প্রত্যেকে পান কুড়ি থেকে দু-টাকা পর্যন্ত।[৯৭] এরপর রঘুনাথ ফিরে গিয়েছিলেন সপ্তগ্রামে। এবং কিছুকাল পরেই চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লাভ করেছিলেন। রঘুনাথ মজুমদার দীক্ষালাভের পর বৃন্দাবনের ছয় গোসাইর এক গোসাই হয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু থেকে জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথ দাসকে মহাসম্পৎ ও কলত্রাদি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁকে স্বরূপ দামোদরের নিকট অর্পণ করেছিলেন এবং বৃক্ষের গুঞ্জাহার ও প্রিয় গোবর্ধন শিলা দান করেছিলেন। মহাপ্রভু কায়স্থ রঘুনাথ

দাসকে নিজের পূজিত গোবর্ধন শিলা দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তের ক্ষেত্রে স্মার্তপথ অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করতেন না, এটি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রঘুনাথ দাসের সংস্কৃত কবিতা রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। তাঁর রচিত স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্রম এবং দানকেলি ইত্যাদি। রঘুনাথ দাস তার মুক্তাচরিত্রের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে।[৯৮]

অর্থাৎ যিনি এই সংসারে নিজের উজ্জ্বল ভক্তিসুধা সমর্পণ করার অভিলাষে শচীর গর্ভরূপ আকাশে পূর্ণচাঁদের ন্যায় উদিত হয়েছেন তাঁকে আমি ভজনা করি।

রঘুনাথ দাস শেষ জীবনে বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর সমাধি হয়। বৃন্দাবনে যাত্রার সময় তাঁদের পারিবারিক গৃহদেবতা সপ্তগ্রামের শ্রীশ্রীরাধা-রমণ জিউ বিগ্রহটি নিত্যসেবার জন্য শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পাঠবাড়িতে রেখে যান। বর্তমানে রাঘবের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূজিত শ্রীশ্রীমদনমোহনের সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউও পূজিত হন।

আমরা মহাকাব্যের পূজারী। আমরা আজও মহাকাব্যের বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের Identification করার চেষ্টা করি। আমরা আবার ইতিহাসেও বিশ্বাসী। কোনো বৈপ্লবিক ঘটনার মাধ্যমে যদি ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে তার পরবর্তী প্রভাব এক বিশাল বটবৃক্ষের আকার ধারণ করে, ঠিক তেমনই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের আগমনের প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে একাধিকবার এখানে এসেছিলেন বাংলার অবতার পুরুষ তথা 'যত মত তত পথ' সংলাপ রচয়িতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলায় পানিহাটীর চিঁড়া-মহোৎসব তলায় প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি এক নতুন আবেদন নিয়ে যেন হাজির। এখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে চিঁড়া-দধির উৎসব তথা দণ্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হত তার আয়োজক ছিলেন পানিহাটীর ধর্মপ্রাণ সেন পরিবার এবং জমিদার রায়চৌধুরীরা। এই ধর্মপ্রাণ মানুষরা অবশ্য এই বিষয়ে রাঘব পণ্ডিতের ন্যায় ভক্তের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। কারণ, রাঘব পণ্ডিত আজীবন এই মহোৎসব পালন করেছিলেন বলে এই মহোৎসবের অপর নাম রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব। যা সংক্ষেপে চিঁড়া মহোৎসব নামে প্রচলিত।

চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে 'রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর''। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা অনুসারে রাঘব পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠা সখী।

আবার এই মহোৎসবের টানে স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলতেন—ওরে পেনেটীতে হরিনামের মেলা বসেছে চল যাই, দেখে আসি। বলা বাহুল্য তিনি ১০-১২ জন শিষ্য সমেত এখানে আসতেন। এই শিষ্যদের মধ্যে

ছিলেন নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মহিলা ভক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগীন মা, গোলাপ মা। কথামৃতে দেখতে পাই ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বসে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের পেনেটির মহোৎসবে যাবার কথা বলছেন।[৯৯]

এই প্রসঙ্গে আরও জানানো যেতে পারে যে, সেন পরিবারের পূর্বপুরুষ গুরুচরণ সেন তাঁর গুরুর আদেশে পানিহাটী দণ্ডমহোৎসব তলার পাশে গঙ্গাস্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এই ঘাট সবার কাছে গৌরাঙ্গ ঘাট বলে সুপরিচিত। এছাড়া এখানে তিনি একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দেবালয়ে গৌর নিতাই, রাধাকৃষ্ণ ও রেবতী বলরামের মূর্তি আছে। আর আছে নারায়ণ শিলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। ইদানীং বাড়ির শীর্ষে শোভা পাচ্ছে ওঁ অমৃততীর্থ/সর্বধর্মে এক ভগবান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বপ্রথম এখানে এসেছিলেন ১৮৫৮ সালের ২৪শে জুন। অর্থাৎ বাংলার ১২৬৫ সালের ১১ই আষাঢ়। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। গুরুচরণ সেনের পৌত্র মণিমাধব সেনের পাঠিয়ে দেওয়া ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ি চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পানিহাটী এসেছিলেন।

মেলায় এসে মণি সেনের গুরুদেব নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর কীর্তনের দলে ঢুকে পড়েছিলেন। কীর্তনের দলের সঙ্গে তিনি নেচেছিলেন ও মাঝে মধ্যেই সমাধিস্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় নামগান করেছিলেন। নামগানটি ছিল এইরূপ—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপন নেচে জগৎ নাচায়, তারা দুভাই এসেছে রে।[১০০]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যখন নাচতেন তখন সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকতেন স্বয়ং তিনি। তাঁর নাচের মধ্যে ছিল এক বিচিত্র রূপ। কখনও তিনি জনপথের মাঝে এক তৃণভোজী হরিণের মতো এগিয়ে চলেছেন। আবার কখনও তাঁর নৃত্যে ফুটে উঠেছে সিংহবিক্রম আবার কখনও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও তিনি এক বিচিত্র পুরুষ। সাধারণ মানুষের কল্পনায় তিনি যেন এক সুখের সাগরে সাঁতার কেটে চলেছেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ:স্বামী সারদানন্দ থেকে সংগৃহীত)

পানিহাটী মহোৎসবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি কেন্দ্র করে সকল ভক্তদের মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করত।

এই প্রসঙ্গে সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ১৮ই জুন ১৮৮৩ তারিখটি সকল ভক্তদের কাছে বিশেষ আবেদনপূর্ণ। কারণ ঐ দিন শ্রীনবদ্বীপ গোস্বামী ও তাঁর কীর্তনের দল সংকীর্তনরত অবস্থায় যখন মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন স্বয়ং রামকৃষ্ণ হঠাৎই তীব্রবেগে সংকীর্তন দলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন আর তাদের সঙ্গে নাচেও অংশ নিয়েছিলেন।[১০১]

নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে বলে গান গেয়ে এমন নাচ নেচেছিলেন, যা দেখে অনেকে ভেবেছিলেন উনি সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ। চারিদিকে হরিধ্বনি-হরি লুট (অর্থাৎ বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া) ও পুষ্পবৃষ্টিতে সমস্ত পরিবেশটি এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্বয়ং এই অবতারের অন্তঃস্থিত রূপে প্রভাবিত হয়ে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। নৃত্যরত একদল ভক্ত তাঁর সঙ্গে যেমন নৃত্য সঙ্গত করেছিলেন, আবার তেমনি অনেকে তাঁর চরণে ফুল বাতাসা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং শ্রীঅবতার স্বরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করার সুখানুভবে এক ও অদ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে একবার স্পর্শ করার জন্য ভক্তদের বাসনাও ছিল প্রবল।

মূলত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে মানুষের সনাতন ভাবধারায় এক নতুন জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রেমপাথার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেবল তাঁর ভাবভক্তির সুধা ও জাদু দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে মোহাবিষ্ট করতে যেমন সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি তাঁদের সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ এতে নিয়ে এসেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, নতুন আবেদনময় ও সজীব-চিরন্তন আবেদন যার ছায়ায় পানিহাটী তথা পূর্বতন পেনেটি এক মহামিলন তীর্থে পরিণত হয়েছিল। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই পেনেটির উনিশ শতকের ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তখনকার সাধারণ মানুষের এই বিষয়ক প্রবল উদ্দীপনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত তথা সমালোচকেরা তাদের কলমে যা তুলে ধরেছেন তাও যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

(১) রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'আমরা অনেক সঙ্কীর্তন ও প্রেমের ভক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংস দেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আরও কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না'।

প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর বর্ণনায় বলেছেন—"সঙ্কীর্তন মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন? চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট হইতেছে"।[১০২]

রামকৃষ্ণের সহজ সরল আচরণ এবং বিশেষত তাঁর সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা ছাড়াও সকলের মধ্যে নিজেকে পৌঁছে দেওয়ার এক বিরল প্রচেষ্টা ভাবভঙ্গী ও অনুনকরণীয় নৈপুণ্যে।

অনেক নাস্তিকও আস্তিকের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। এমনকি ভাব ও প্রেমকে যাঁরা নিছক পাগলামি বলতেন তাঁরাও শুধু প্রেমের বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছিলেন তা নয়, এই সঙ্কীর্তনে নৃত্য করেছিলেন। "শ্রীযুক্ত মণিসেন ও তাঁর পরিবাররা এখন

বর্ষে বর্ষে চিঁড়ামহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন" (কথামৃত ৪র্থ খণ্ড)। শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির মহোৎসবে সর্বপ্রথম যোগদান করেছিলেন ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৬৫, ২৪শে জুন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। সম্ভবত নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পেনেটি গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নে হৃদয়। দণ্ডমহোৎসব জমে উঠেছিল। সে সময়ে গৌরাঙ্গভাবে ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁরা সকলেই যেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন তেমনি তাঁর নৃত্যশৈলী ও ভাবসমাধি দেখে হরিধ্বনি দিয়েছিলেন। এরপব অসংখ্যবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পানিহাটীতে এসেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সে যুগে জনবন্দিত ছিলেন যেমন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও মহিলাদের মধ্যে যোগীন মা ও গোলাপ মা ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শেষবার এই পানিহাটীর মেলায় এসেছিলেন বাংলা ১২ই আষাঢ় ১২৯২ (ইংরাজী ২৫শে জুন ১৮৮৫), সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সকালবেলায় ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে পঁচিশজন ভক্ত দুটি নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন। সেখান থেকে মধ্যাহ্নকালে তিনি সদলবলে পেনেটি তথা পানিহাটীতে পৌঁছেছিলেন। সেদিন ঠাকুরের পরনে ছিল গৈরিক গরদ। বর্তমান কলিকাতা গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দ তাঁর 'অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটিতে এই নাচের ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক এইভাবে নৃত্যরত ভাবোদীপ্ত ঠাকুরকে দেখে মনে হচ্ছিল "অগ্নিশিখা পরিব্যপ্ত"। মনে হচ্ছিল গৈরিকোজ্জ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরাবির্ভূত! নৃত্যপটু গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নৃত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহাগৌরাঙ্গদ্বেষী কাশীধামে বসিয়া সোঽহং তত্ত্বে নিবিষ্ট, সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গতরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিক্‌রিয়া চতুর্দিকে ছুটিতেছে। শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ পাঠে রত। পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন গান নাই, কথা নাই, ভাবাবেশে, সন্ন্যাসীবেশে গৌর নাচিতেছেন। সন্ন্যাসী দেখিতেছেন। অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। বীর সন্ন্যাসী এইবার অতিচঞ্চল। সন্ন্যাসী ছুটিলেন, প্রাণপণে ছুটিলেন, গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা একথা প্রত্যয় করিতাম না। নদে টলমল টলমল করে, মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন। যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে ভাবপ্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা। কেবল টলটল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা, যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা প্রকৃতিস্থ হন। ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে রাঘবের পাটের দিকে অগ্রসর হন। কীর্তনদল মহা উৎসাহে নামগান করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে। তারা গাইতে থাকে সুরধনী তীরে হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা

নিতাই এসেছে, তাদের মনে হয়, উপস্থিত সকলের মনে হয়, প্রেমদাতা নিতাই স্বয়ং প্রেম বিতরণ করছেন।[১০৩]

ভক্তগণ দেখেন ভাবোদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বপুতে আশ্চর্য পরিবর্তন। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন : তাঁহার (ঠাকুরের) উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল,........প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্রও এ ধরনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছেন : তাঁহার (ঠাকুরের) যে বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার উপহার দিয়েছেন একটি সুন্দর চিত্র। তিনি লিখেছেন ঃ—

হেথা রাঘবের পাটে পথে যেতে ভাব উঠে
হেন ভাব কখনও না শুনি।
তাকায়ে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি
কোথায় ধাইব চেঁঠা স্পন্দনহীন অঙ্গ গোটা
জড়বৎ সচল শরীর।[১০৪]

আমাদের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শ্রীচৈতন্যের সাড়ে তিনশো বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কোনো বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে যে ইতিহাসের ধারাতে অবতারকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সে ধারায় অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে ঈশশক্তির এ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে। সে কারণে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছেন অবতার। উপরন্তু দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যোত্তর ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবধারাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। পানিহাটী যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভু, মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সন্ন্যাসী পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল, তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও স্মৃতিবিজড়িত। ১৮৭১-৭২ সালে কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ১২। উনি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সেই সর্বপ্রথম পানিহাটীতে যে এসেছিলেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম শহর ছেড়ে বাইরে আসা। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জোড়াসাঁকোর বাড়ির পরিবেশ ও কোলাহল ছেড়ে পানিহাটীর গঙ্গাতীরের নির্জন মনোরম পরিবেশ বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জুগিয়েছিল কবিত্বের প্রেরণা। তিনি এখানে দুমাস ছিলেন। কবি দ্বিতীয়বার পানিহাটী এসেছিলেন ১৯১৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার এখানে এসেছিলেন ১৯৩৩ সালে। ছাতুবাবুর বাগানে অধুনা (গোবিন্দকুমার হোম) অনাথা ব্রাহ্ম বালিকাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক

আশ্রমকন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষবার পানিহাটী এসেছিলেন। তবে কবির জীবনে পানিহাটীর গঙ্গার যে বিশেষ প্রভাব ছিল তা তিনি পরবর্তীকালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন।

দেশভাগের মাত্র ১৯ মাস আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে ১৮ই জানুয়ারী গান্ধীজী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পায়ে হেঁটে পানিহাটী গ্রামের শ্রীচৈতন্য স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত অমূল্যধন রায়ভট্ট, ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য গঙ্গার তীরে বটতলায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী বটবৃক্ষ পরিক্রমা করার পরে যখন তাঁর হাতে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত ছেঁড়া কাঁথা, পুঁথি, খড়ম এবং নিত্যানন্দ প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি (যেটা বর্তমানে বরাহনগর শ্রীপাটবাড়িতে দেখা যায়) ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি সেগুলিতে পরম ভক্তিতে হাত বুলিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হয়েছিল। এই মহান ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য দীর্ঘ দেড়মাইল পথ জুড়ে ছিল বহু তোরণ, কাগজের পতাকা ও ফুল। পথের পাশে বহু গৃহস্থ মানুষরা নিজেদের বাড়ি ফুল ও কাগজ দিয়ে মনের মত করে সাজিয়েছিল। পথের দুপাশে অসংখ্য মানুষ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। শোনা যায় গান্ধীজী জনসাধারণের কল্লোলে এতটাই অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, ৭৭ বছর বয়সে গান্ধীজী সারা রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করার পর পুনরায় পদব্রজেই সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—তীর্থ পরিক্রমায় পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো। শোনা যায় যিনি এই মহাত্মা গান্ধীকে সর্বপ্রথম 'জাতির জনক' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং যিনি বিশ্বাস করতেন দেশের সাধারণ মানুষের নাড়ির স্পন্দন অনুভবে তিনিই এক ও অদ্বিতীয় সেই বীর সুভাষচন্দ্র বসুও এই পুণ্যতীর্থে এসেছিলেন।

ভারতের সুসন্তানেরা যেমন পানিহাটীর তীর্থক্ষেত্রে একাধিকবার এসেছেন তেমনি পানিহাটীতেও বহু সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পানিহাটীর অমূল্যধন রায়ভট্টর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবে পানিহাটীর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এরপরে ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শতাব্দীতে তিনিই ছিলেন পানিহাটীর প্রকৃত ও অন্যতম রূপকার। তবে এর পূর্বের ইতিহাস থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দের পদার্পণে পানিহাটী বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তবে এ সময় শাক্তদের প্রভাব কম ছিল না। দেগঙ্গা ও বেড়াচাঁপার রাজা চন্দ্রকেতু পানিহাটীর গঙ্গার কাছে একটি গড় তৈরি করেছিলেন। এই গড়ের নাম ছিল গড় ভবানী আর পরাক্রমী রাজা স্বয়ং চন্দ্রকেতু স্থলপথে-জলপথে পানিহাটী আসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এখনও (বর্তমানে) প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই মহোৎসব পালন

করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই উৎসবে যোগদান করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়েরা ভক্তরা আসেন যেমন—বাউল, কর্তাভজা, সাঁই, মতুয়া, কিশোরী ভজা, দরবেশ, গৌরবাদী, সখীভেকী, হরিবোলা, টহলিয়া নৈমোবৈষ্ণব, ইসকন, বাবা লোকনাথ সম্প্রদায়, বালক ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়, হরি ওঁ সম্প্রদায়, শ্রীগুরু সম্প্রদায়, গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে যা দেখে মনে হয় যেন সর্বধর্ম মহোৎসবের মেলা, কি অপূর্ব তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। পানিহাটীর রামচাঁদঘাট, গৌরাঙ্গঘাট আর সেনদের ঘাট স্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছে ভগবৎ-করুণার বিগলিতরূপ কলুষহারিণী গঙ্গা আর ঘাটের উপরে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে প্রবাহিত হচ্ছে ভগবৎ-করুণার সূক্ষ্ম স্ফুরণ-ভাব-ভক্তির-মলয়। আর সবকিছুর সাক্ষ্য বহন করছে গৌরাঙ্গঘাটের সেই অতি পুরানো অক্ষয় বটবৃক্ষ। ফলে ভক্তগণের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, বট বৃক্ষ তুমি কী সৌভাগ্যবান তোমার ছায়ায় কত মহাপুরুষের বিশ্রামস্থান---

হে বন্ধু
জান কি এ কোন পূণ্যস্থান?
অধন্য কলিরে যেঁহ ধন্য করিবারে।
পরিপূর্ণ অবতারী স্বয়ং ভগবান।
মূর্ত্ত ব্রহ্ম সত্য সনাতন।
চির অনর্পিত প্রেম জীবে কৈলা বিতরণ।
এই সেই শ্রীচৈতন্য বিশ্রামের স্থান।
চরণ চিহ্নিত ভূমি কর প্রনিধান।
চরণ চুম্বিত রজঃ করিয়ে চুম্বন।
লুটাইয়া দেহ মনপ্রাণ।
ত্রিতাপের তাপ জ্বালা কর নিবারণ।
মৃন্ময়ে চিন্ময় সুখ লভ মতিমান॥

নিত্যানন্দের অন্যতম বিশিষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর

এরপর নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী ও সুবর্ণবণিক সমাজের নেতা উদ্ধারণ দত্তের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে সমাজের পতিত নিপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে নিজেকে নিয়োগ করলেন। তথাকথিত পতিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সমাজের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল। তিনি সমাজের অপাংক্তেয়দের কোল দিলেন এবং নিত্যানন্দের নেতৃত্ব আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন। এই ঘটনা নিত্যানন্দের অন্যতম বিশিষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

উদ্ধারণ দত্তের দীক্ষা ও নামকরণের মধ্যে নিত্যানন্দের কৃতিত্ব নিহিত। তারপরে দিবাকরের গৃহে পরমানন্দে নিত্যানন্দ ভক্তগণের সঙ্গে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। নিজের

আত্মীয় ও স্বজাতিগণকে নিয়ে ভক্তির সঙ্গে সকলের সেবা নিলেন। তাঁর মধুর বচন ও দীনভাবে সকলে বিমুগ্ধ হলেন।

মার্গশীর্ষ শুভক্ষণে সপ্তমী তিথির দিনে
তবে প্রভু বেনের কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ভাগবত শুনাইয়া
নাম কৈল অর্থের সহিতে

(সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি)

মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমী তিথির দিনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণকে 'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দিবাকরকে দীক্ষা দান করবার পর নিত্যানন্দ বললেন—

"প্রভু কহে হাসি হাসি বণিক কুমার।
বণিককুল তোমা হতে হইল উদ্ধার॥
দিবাকর কহি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ॥
বণিককুল উদ্ধার করিলি বটে যে কারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহু উদ্ধারণ॥

(সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি)

তিনি আরও জানালেন যে গৌড়ে অর্থাৎ বঙ্গদেশে তাঁর আগমনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। উদ্ধারণের উদ্ধারের জন্যই তাঁর এখানে আগমন। তারপর পুণ্যতোয়া সরস্বতীতে স্নান সেরে প্রভু উদ্ধারণের গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীগণকে ডেকে এনে উদ্ধারণ হরির লুট দিলেন। এরপরে নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে বললেন, আমি উপবাসী আছি। আজ তোমার গৃহে 'পারণা' করব। নিত্যানন্দের এই আদেশ পেয়ে উদ্ধারণ মহোৎসবের আয়োজন করলেন।

'প্রভুর আদেশ পাঞা দত্ত মহামতি।
চিঁড়া দধি ভারেভারে লইয়া আসে তথি
লকলকি কলা খণ্ড সিতা নাড়ু যোগ
আঙ্গটিয়া কলার পাতে বাড়াইল ভোগ।

(সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি)

ভোগাদির পর উদ্ধারণ সমবেত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করলেন। গ্রন্থকর্তা বাসু ঘোষ এখানে বলছেন, উদ্ধারণ তুমি বিশেষ ভাগ্যবান, কেননা তোমার গৃহেই আজ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-সমাধান হল।

শ্রীনিত্যানন্দের দেহে ভাবের বিকাশ। মহাভাবময় নিত্যানন্দের দেহে অপূর্ব ভাবের

বিকাশে প্রেমসাগর উথলে উঠল। ক্ষণে ক্ষণে তিনি অলৌকিক লীলা দেখালেন। এই দৃশ্য দেখে বাসু ঘোষ বলেছেন—

"সপ্তগ্রাম হৈল যেন নববৃন্দাবন"।

দীন হীন পতিত পামর কারও কোন বিচার না করে সকলকে ধরে গৌরলীলার প্রথম ও প্রধান প্রচারক নিত্যানন্দ—

'কান্দে প্রভু ভক্ত উদ্ধারণের গলা ধরি।
গোরা গোরা বলি মুহু ছোড়ায় হুঙ্কার।।
শুনি সপ্তগ্রামের লোক হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বল্যা ভাই মোরে লও কিন্যা।।' (সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি)

নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম পরিত্যাগের পর উদ্ধারণ কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

উদ্ধারণ লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হরিনাম প্রচার করতে লাগলেন। তারপর তিনি সূত্রধর ও পটুয়াদের ডেকে নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নির্মাণের আদেশ দিলেন। তৎসহ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা প্রচারে এবং নিত্যানন্দ পুজার বিষয়ে উদ্ধারণ অগ্রণী হলেন।

"কণ্টকনগর মধ্যে যত গ্রাম ছিল।
সর্বত্র প্রভুর মূর্তি উদ্ধারণ স্থাপিল।।
সহস্র দেউলে নিত্যানন্দের বিগ্রহ।
শোভা পায় শ্রীচৈতন্যের দারুমূর্তি সহ।। (ঐ)

কণ্টকনগর অর্থাৎ কাটোয়ার মধ্যে যত গ্রাম ছিল সমস্ত গ্রামেই উদ্ধারণ নিতাই-গৌরের বিগ্রহ স্থাপন করলেন। ভক্তি সহকারে ফুল তুলসী দিয়ে সকলেই প্রভুদ্বয়ের নিত্যসেবা শুরু করলেন।

নিত্যানন্দের প্রিয় কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর নিত্যানন্দের আদেশে সপ্তগ্রামে এসে বাস করতে লাগলেন। ষষ্ঠীবরের আগমনে সপ্তগ্রামে কীর্তনের হাট বসে গেল।

ষষ্ঠীবর গায় গান উদ্ধারণ নাচে,
নিতাইচাঁদে হেন ভক্তি কোথা কার আছে।। (ঐ)

ক্রমে উদ্ধারণের গৃহ গৌড়দেশবাসীর সম্মিলনস্থল হয়ে উঠল। ফলে তাঁর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম শুরু হল।

গৌরাঙ্গ এবং শচীদেবীর নিত্যনন্দকে বিবাহের আদেশ

এরপর নিত্যানন্দের গৃহী জীবনযাপন শুরু। চরিতগ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই নাকি তাঁকে বিবাহের উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে বলেছেন—

'তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥'[১০৫]

আবার জয়ানন্দ মহাপ্রভুর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

নিত্যানন্দ গোসাঞি তুমার গৌড়দেশ।
আজি হইতে 'ছাড় গোসাঞি অবধূতবেশ॥[১০৬]

অন্যত্র—

নিত্যানন্দে বিবাহ করিতে আদেশিলা।
গৌর আজ্ঞায় ভক্তগণ নিজ দেশে গেলা॥[১০৭]

শচীদেবীও তাঁকে বিবাহের আদেশ দিয়েছিলেন। একথাও বলেছেন জয়ানন্দ—

যজ্ঞসূত্র ধরিআ করিবে তুমি বিভা।
মোর বাক্য পালিহ এই তোমার শোভা॥[১০৮]

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ নিয়ে ভক্তসমাজে বহু বাক্‌বিতণ্ডা আছে। আমরা সেসব সমস্যায় যাব না। তবে বোঝা গেল, তিনি মহাপ্রভু এবং শচীমাতার আদেশে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিত্যানন্দকে দিয়েছিলেন গার্হস্থ্যের আদর্শ। আসলে মহাপ্রভু হয়তো বুঝেছিলেন গার্হস্থ্যজীবন সমাজকে অধিকতর সুস্থ-সুন্দর এবং স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম।

নিত্যানন্দের বিবাহ প্রসঙ্গ

যাই হোক, নিত্যানন্দ শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস সরখেলের কন্যা বসুধা এবং জাহ্নবাকে বিবাহ করলেন— (আনুমানিক ১৫১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ)

সূর্যদাস-নন্দিনী বসু জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥[১০৯]

শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে—

'লোকশাস্ত্র মতে সূর্যদাস ভাগ্যবান।
নিত্যানন্দে দুইকন্যা কৈল দান॥'[১১০]

নিত্যানন্দের গৃহী জীবনযাপন

১৫২২ খ্রিস্টাব্দ, বাংলার সামাজিক জীবনে তখন এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় নিত্যানন্দ বসুধা এবং জাহ্নবাকে নিয়ে খড়দহে এলেন পুরন্দর পণ্ডিতের আতিথ্যে। নিত্যানন্দের খড়দহে আগমন, ধর্মাচরণ, বসবাস এবং প্রায় সর্বক্ষণ সপার্ষদ

ভজন কীর্তনে বৈষ্ণব ভক্তি রসধারার প্লাবনে সমগ্র সমাজকে এমনভাবে আন্দোলিত করে যে, খড়দহ ক্রমশ এক বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়েছিল।

এরপর নিত্যানন্দ বসুধা-জাহ্নবাকে নিয়ে খড়দহে এসে গার্হস্থ্য জীবন শুরু করলেন। এখানেই নিত্যানন্দ তাঁর গার্হস্থ্য জীবনকে সুখী গৃহকোণে পরিণত করতে পেরেছিলেন। আমরা মুরলীবিলাস গ্রন্থে দেখতে পাই নিত্যানন্দ খড়দহে সুখেই ছিলেন। তাঁর গৃহের বর্ণনা ছিল এইরূপ—

লক্ষ লক্ষ জ্বলে কত প্রদীপ রসাল।
বিচিত্র-নির্মাণ হর্ম্য গঠন সুন্দর।।
ধ্বজ-পতাকাতে শোভে অতি মনোহর।
পারাবত কেলি করে বসিয়া কুটীরে।।
ময়ূর ময়ূরী নাচে কোকিল কুহরে।
গঙ্গার সমীপে স্থল অতি সুশোভন।
দিব্যভূষাম্বরে শোভে দাস দাসীগণ।।

আমরা জানি অন্তরের অপর নাম অথৈ সাগর। এ সাগরের জল লবণাক্ত নয়। বরং অতি মিষ্ট। অসংখ্য ভক্তদের হৃদয় সাগরে ডুব দিয়েই নিত্যানন্দ খড়দহের তীরে এসে উঠেছিলেন। ফলে ভক্তগণ হয়ে উঠেছিলেন আনন্দে মাতোয়ারা প্রেমে দিশাহারা এবং সার্বিকভাবে নতুন সূর্যের আলোর কিরণে নিজেদের অন্তরে এতদিন লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে মুছে ফেলে তার বদলে আলোর ঠিকানা পেয়েছিলেন। ফলে প্রভু নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের বাহ্যিক রূপের যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিক সেই অনুপাতে বা তার বেশি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সাধারণ মানুষের অন্তরে।

ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া।
রাখিলেন অপূর্ব্ব আলয়ে নিজ প্রিয়া।।
কিছুদিন তথা বিলসহে নিত্যানন্দ।
প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ।।[১১১]

এবং তাঁদের 'বাঞ্ছা পূরণ করে' প্রেমপ্রচার দ্বারা সুখে জীবন যাপন করতে লাগলেন। খড়দহে নিত্যানন্দ সপরিবারে বাস করেন কুঞ্জবাড়ি ও তৎসংলগ্ন ২৬ বিঘা জমিতে। নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন পৈত্রিক ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র, নীলকণ্ঠ শিব ও চতুর্দশ চক্রযুক্ত অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা। সেগুলি সুরক্ষিত আছে এখনও শ্রীপাট খড়দহে। শ্রদ্ধেয় ড. কাননবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের 'বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য' গ্রন্থে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অপ্রকটের পর গৌড়মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রকে কেন্দ্র করে খড়দহ শ্রীপাটে মুলত রাগানুগামার্গে ভক্তি সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়। অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দের ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্রের পূজায় কিছু তান্ত্রিক আচার এবং বীরচন্দ্রের নেড়ানেড়ি সংযোগে কিছু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

এরপর নিত্যানন্দের সংসার জীবন পুরন্দর পণ্ডিতের খড়দহস্থ ভবনে। (বর্তমানে 'কুঞ্জবাড়ি' নামে খ্যাত) এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর এবং শ্রীনিত্যানন্দ দুহিতা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব স্থান এখনও বর্তমান।[১১২] ১৪৫৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র খড়দহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলা বাহুল্য যে বীরচন্দ্র প্রভুর পিতা নিত্যানন্দ প্রভুই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত উত্তরসূরী। তাঁকে প্রকৃত ভাবশিষ্য বললেও বুঝি কম বলা হয়—আসলে মহাপ্রভুর উদ্বোধিত ধর্মাদর্শের উদারীকরণ তিনিই করেছিলেন,—সেই উদারীকরণের গুণমান ছিল অত্যন্ত উন্নত আর প্রচার নৈপুণ্যও ছিল এতই অসাধারণ যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সহজেই বোধগম্য হয়েছিল। ফলে দুই বিরল ব্যক্তিত্বের সংযোগে সমাজে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর এই ধারা পরবর্তীকালে অব্যাহত ছিল মূলত বীরভদ্র ও জাহ্নবাদেবীর কর্মকৃতিত্বের জন্য। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্য ছিল দেখবার মতো আর এই কর্মপ্রবাহে প্রবাহিত হয়ে গৌড়ের তদানীন্তন রাজা সোলেমান খাঁ তথা হজরত আল্লার রাজত্বকালে (১৫৫০-১৫৭৫) বীরভদ্র খড়দহের ঐতিহাসিক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, গৌড়ের বাদশা তাঁর প্রাসাদে বীরচন্দ্রের অসাধারণ শক্তিতে মোহিত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"পাতশাহ বোলে গোসাঞি ফকির সমান
ইচ্ছামত ঠাকুর লহ কিছু দান।।"

তখন উত্তরে— গোসাঞি বোলে বহুমূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার ঘরেতে শোভে করে ঝলমল।।
গোসাঞি বলে ইহাতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ।।

সেই পাথর দিয়ে খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বীরভদ্র নবাবের কাছ থেকে পাথর নিয়ে এসেছিলেন। আর এর রূপ এক কথায় অসাধারণ, এক অনুপম ভাস্কর্যের প্রতীক। আজও তীর্থযাত্রীরা যখন এখানে আসেন তাঁরা এই মূর্তি দেখে মুহূর্তের মধ্যে আবেগঘন হয়ে পড়েন। তাঁদের চেতনার স্তর গভীর থেকে আরও গভীরতর হয়ে ওঠে. আর অতীতের স্মৃতিবাহক হিসেবে এই বিগ্রহমূর্তির আবেদন বাস্তবিকই চিরন্তন।

নিত্যানন্দ
পুত্র বীরভদ্র — কন্যা গঙ্গাদেবী

নিত্যানন্দ খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় দুর্গা পূজা করতেন।[১১৩] খড়দহে ১৫৩০

খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রথম দুর্গা পূজা করেন। আনুমানিক ৪৭২ বছর ধরে এই পূজার্চনা চলে আসছে। বর্তমানে এই পূজা পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রমোহন গোস্বামী। শ্রীগোস্বামী প্রভু নিত্যানন্দের পঞ্চদশতম (১৫) উত্তর পুরুষ।

উল্লেখ্য এখানে বিগ্রহমূর্তির উচ্চতা ৪ ফুট। এখানে দেবী 'কাত্যায়নী' (ভগবতী মা দুর্গার ষষ্ঠ রূপ। ঋষি কাতার পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন বহু বছর ধরে ভগবতীর উপাসনায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবী তাঁতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর গৃহে কন্যারূপে আবিভূর্তা হয়েছিলেন এরপর অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁদের তেজের অংশ দিয়ে এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্বপ্রথম তাঁর আরাধনা করেন। সেইজন্য দেবীকে 'দেবী কাত্যায়নী' বলা হয়।) রূপে পূজিতা। দেবীর বাম ও ডান দিকে সরস্বতী ও লক্ষ্মী নেই। ফলে তাঁদের বাহনদের অনুপস্থিতিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে দুই দেবীর পরিবর্তে জয়া ও বিজয়া মায়ের পাশে অবস্থান করে আছেন। আর দেবীর পদতলে সিংহের পরিবর্তে ঘোড়া রয়েছে। সমগ্র প্রতিমাসমূহ একটা চালচিত্রের মধ্যে অবস্থান করে রয়েছে।

এখানে পূজার্চনার ক্ষেত্রে আচার বিধিও কিছুটা অন্য ধরনের। যেমন এখানে মন্ত্রের সাহায্যে মাষকলাই বলি দেওয়া হয়। এখানে ডাকের সাজে ঠাকুরকে সাজানো হয়। আর সাদা থান কাপড়ে সিঁদুর লাগিয়ে সেটি রঙিন করে তোলার পর দেবীকে বস্ত্রদান করা হয়।

সমাজে নারীজাতির স্বাধীনতা ও অধিকার

এরপর নিত্যানন্দের জীবনের একটি বড় কর্ম স্ত্রী'র প্রতি সম্মান প্রকাশ। তিনিই প্রথম তাঁর ধর্মপ্রচার এবং সহায়তা করার জন্য তাঁর সুযোগ্য পত্নী জাহ্নবাদেবীর উপর দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। ফলে নারীজীবনের বদ্ধতা ঘুচে গেল। নারী এলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এতদিন ধর্মজগতে নারীর ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র সহধর্মিণী রূপে, নিত্যানন্দের সাহচর্যে এবং মধুর স্পর্শে নারী পেল সহকর্মিণীর ভূমিকা। এর ফলেই আমরা জাহ্নবাদেবীর মতো মহিলা আচার্যাকে পাই। উদাহরণস্বরূপ অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী ও হেমলতাদেবী প্রভৃতি নারীদের নাম করা যেতে পারে। যাঁরা অন্তঃপুরের বাইরে এসে বৈষ্ণব মহান্ত সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কৃষ্ণনাম ও জীবপ্রেম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন।

জাহ্নবাদেবী বাংলার সমাজে বিশেষত মহিলা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। বহু বছর তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে খেতুরী মহোৎসব কার্য নিষ্পন্ন হয়েছিল[১১৪]। আনুমানিক ১৬১০-১৬২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মূলত জাহ্নবা দেবীর উদ্যোগে এই মহোৎসবে কায়স্থ নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল যা ছিল সেই যুগের এক অত্যাশ্চর্য ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—Jahnavi after her widowhood became a conspicuous figure in the Vaishnava Community for a long time and honoured for her high character.[১১৫]

নিত্যানন্দের অপরিসীম আগ্রহ ও চেষ্টায় নারী পূজা ও দীক্ষাদানের অধিকার পেয়েছিল।[১১৬]

অতএব আমরা বলতে পারি, সমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা প্রথম নিত্যানন্দই প্রকাশ করেন—

'কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে।।[১১৭]

নিত্যানন্দ তাঁর এই শপথবাক্য পালন করতে গিয়ে স্ত্রী জাহ্নবার মাধ্যমেই তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষিত কাজের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

নিত্যানন্দের তিরোধান

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে নিত্যানন্দের তিরোধানের মাস ও তিথির উল্লেখ করেছেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে সংকীর্তনরত অবস্থায় তাঁর তিরোধান ঘটে—

আশ্বিন মাসের যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি।।[১১৮]

এ-প্রসঙ্গে 'শ্রীনিত্যানন্দ বংশমালা' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস জানাচ্ছেন যে মহাপ্রভুর অপ্রকটে মুহ্যমান শ্রীনিত্যানন্দ একদিন তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে স্বীয় জন্মভূমি একচাকায় গমন করেন এবং বঙ্কিমদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে বঙ্কিমদেবের দেহে লীন হন[১১৯]। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী মতে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়[১২০]।

প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসার ও নানারূপ সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করে 'গণনায়ক' নিত্যানন্দ ধর্মক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। নিত্যানন্দের জীবনের ঘটনা আমরা এখানে ক্রমপরম্পরা-ভিত্তিক লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম। মরদেহধারীর মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু কর্মবীর অমরত্ব লাভ করেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে। নিত্যানন্দও অমর হয়ে আছেন বৈষ্ণব তথা সমগ্র ভক্তসমাজে। তিনি সাম্যবাদের যে বীজ রোপণ করেছিলেন তা মহীরূহ আকার ধারণ করে সারা বাংলা তথা ভারতীয় সমাজকে ধারণ করে রেখেছে আজও। এই কারণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাদের নিকট চিরস্মরণীয়।

তথ্যপঞ্জী

১. **সাপ্তাহিক বর্তমান [পত্রিকা]**—বরুণ সেনগুপ্ত সম্পাদিত,

২. **শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত** —বৃন্দাবনদাস, সম্পাদনা—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী,

ক) **শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর**—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস, নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত, কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ১৯৪৩। একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৪২৩, পৃ. ৪৫৫।

খ) **চৈতন্যমঙ্গল** —জয়ানন্দ, সম্পাদনা—বিমানবিহারী মজুমদার এবং সুখময় মুখোপাধ্যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১। নদীয়া খণ্ড, শ্লোক ২, পৃ. ১৩।

৩. **শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত**—বৃন্দাবনদাস, সম্পাদনা—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন। মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৬৬, পৃ. ৪৮৬।

৪. **শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর**—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস, নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত, ১৯৪৩। একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৪৩৯-৪৪০, পৃ. ৪৪৫।

৫. **শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত** —বৃন্দাবনদাস, সম্পাদনা—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন। আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, শ্লোক ৫, পৃ. ১৭৫। একই বর্ণনা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়।

ক) **ভক্তিরত্নাকর**—নরহরি চক্রবর্তী, দ্বাদশ তরঙ্গ।

খ) **শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার** — রাধানাথ কাবাসী, পৃ. ১৭।

গ) **গৌরাঙ্গ বিজয়** — চূড়ামণিদাস, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, পৃ. ৮।

ঘ) **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ১৩।

ঙ) **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩।

৬. **অদ্বৈতপ্রকাশ** — ঈশাননাগর, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৮৯।

৭. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৭২, পৃ. ৪৮৭।

৮. **অদ্বৈতপ্রকাশ** — ঈশাননাগর, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৫৭ এবং অনুরূপ ভাবে দ্রষ্টব্য।

ক) **গৌরাঙ্গবিজয়** — চূড়ামণিদাস, পৃ. ৮।

খ) **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, সূত্রখণ্ড, পৃ. ৪৩।

গ) **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ১৩।

৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩।

১০. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

১১. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

১২. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৪৯০, পৃ. ৪৭৭।

১৩. **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস** — সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, প্রকাশক— ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৯৫৩, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৬৬।

১৪. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৫৩০, পৃ. ৪৪৮।

১৫. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ১৩।

১৬. **অদ্বৈত প্রকাশ** — ঈশাননাগর, বিংশ অধ্যায়, শ্লোক ৯, পৃ. ৯৯।

১৭. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৫২৮, পৃ. ৪৪৮।

১৮. **অদ্বৈত প্রকাশ** — ঈশাননাগর, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৮৯।

১৯. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৭৭-৮১, পৃ. ৪৮৭।

২০. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, একাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৫৩৭, পৃ. ৪৪৮।

২১. **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, শ্রীরামদেব মিশ্র প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৩৩৮, সপ্তম বিলাস, পৃ. ৭০।

২২. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, পঞ্চম তরঙ্গ, শ্লোক ২২৪৬, পৃ. ২১৯।

২৩. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, শ্লোক ১০০, পৃ. ১৮৬।

২৪. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, শ্লোক ১০০, পৃ. ১৮৬।

২৫. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, পঞ্চম তরঙ্গ, শ্লোক ২২৪৬, পৃ. ২১৯।

২৬. **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, সপ্তম বিলাস, পৃ. ৭০।

২৭. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ১৩।

২৮. **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, সপ্তম বিলাস, পৃ. ৭০।

২৯. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, শ্লোক ১৪১, পৃ. ১৮৮।

৩০. **শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ** — গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৫৭।

৩১. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৩২. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৩৩. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৩৪. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ১৫৪।

৩৫. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, পঞ্চম তরঙ্গ, শ্লোক ২৩৩০, পৃ. ২২১।

৩৬. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৩৭. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৩৮. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, শ্লোক ১১৬-১১৯, পৃ. ৪৯০।

৩৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, শ্লোক ৪, পৃ. ১৩।

৪০. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, পঞ্চম তরঙ্গ, শ্লোক ২৩০৬-২৩০৭, পৃ. ২২১।

৪১. **শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান** — বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ. ৭২৫।

৪২. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, শ্লোক ১৮৮, পৃ. ১৯২।

৪৩. **অদ্বৈত প্রকাশ** — ঈশাননাগর, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৫৭।

৪৪. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪৫. **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, সপ্তম বিলাস, পৃ. ৭০।

৪৬. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪৭. **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, মধ্যখণ্ড।

৪৮. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

৪৮ ক. **বঙ্গের বাহিরে বাঙালী**—উত্তর ভারত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ১৩২২, পৃ. ১৬৫।

৪৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৫০. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

৫১. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যয়।

৫২. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়নান্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৫৩. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

৫৪. **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, আদিলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৫৫. **গৌরাঙ্গবিজয়** — চূড়ামণিদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, পৃ. ৯।

৫৬. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

৫৭. **চৈতন্যভাগবত** — বন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।

৫৮. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, দ্বাদশ তরঙ্গ।

৫৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, মধ্যখণ্ড।

৬০. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৬১. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

৬২. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়।

৬৩. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

৬৪. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

৬৫. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক ৪৯২, পৃ. ১০১৩।

৬৬. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস** — ড. সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৯৬।

৬৭. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৬৮. **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, মধ্যখণ্ড।

৬৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — লোচনদাস, মধ্যখণ্ড।

৭০. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৭১. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়।

৭২. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭৩. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭৪. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড।

৭৫. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, বিজয়খণ্ড।

৭৬. **বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য**—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ. ৩০৮।

৭৭. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, মধ্যখণ্ড, ঊনবিংশ অধ্যায়, শ্লোক ২২৮-২৪৯, পৃ. ৭৪৪।

৭৮. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৭৯. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮০. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮১. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩২।

৮২. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১০৪, পৃ. ২৩২।

৮৩. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, পৃ. ২৩২।

৮৪. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১৫৯, পৃ. ২৩০।

৮৫. **চৈতন্যচরিতামৃত** — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ১০০, পৃ. ৯৯১। ৫৭ ও ৫৮ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পৃ. ৯৮৯। ৬০ থেকে ৬৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পৃ. ৯৮৯।

৮৬. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন, ১৩৯১, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৮৭. ঐ

৮৮. **গৌরপ্রিয় পার্ষদ** — শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রকাশক : হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩৯৪, পৃ. ৫২।

৮৯. **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, ১৯৯০, পৃ. ৯৯০।

৯০. **বৃহৎ বঙ্গ** — ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩।
৯১. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষক পানিহাটী ত্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয়। পানিহাটী পৌর শতবর্ষ।
৯২. **চৈতন্যচরিতামৃত** — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৫১-৫৪।
৯৩. **চৈতন্যচরিতামৃত** — বৃন্দাবনদাস, বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন, ১৯৪৩।
৯৪. **চৈতন্যচরিতামৃত** — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার ১৯৪৩, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
৯৫. ঐ
৯৬. ঐ
৯৭. **অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ** — স্বামী প্রভানন্দ, প্রকাশক—স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা, '১৯৪৩ পৃ. ৮০।
৯৮. **চৈতন্যপ্রসঙ্গ** — সম্পাদনা—জগদীশ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—ড. কানাইচন্দ্র পাল, **শ্রী চৈতন্য ও বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী**—নরেশচন্দ্র জানা, ১৯৪৩, পৃ. ১৫১।
৯৯. **অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ** — স্বামী প্রভানন্দ। পৃ. ৯৩।
১০০. ঐ পৃ. ১৫১।
১০১. ঐ পৃ. ১৫১।
১০২ ঐ পৃ. ৮২।
১০৩. ঐ পৃ. ৮৯।
১০৪ ঐ পৃ. ৯০।
১০৫. **চৈতন্যভাগবত** — বৃন্দাবনদাস, অন্তখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক ২২৫-২২৭, পৃ. ১০০০।
১০৬. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, বিজয়খণ্ড, শ্লোক ২, পৃ. ২১৭।
১০৭. **অদ্বৈতপ্রকাশ** — ঈশাননাগর, বিংশ অধ্যায়।
১০৮. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, নদীয়া খণ্ড, পৃ. ৭৫।
১০৯. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, পৃ. ২৩৫।
১১০. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, দ্বাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৩৯৮৩, পৃ. ৬১০।
১১১. **ভক্তিরত্নাকর** — নরহরি চক্রবর্তী, দ্বাদশ তরঙ্গ, শ্লোক ৪০১৩-৪০১৪, পৃ. ৬১২। বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা নিত্যানন্দের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংবাদ পাই।
১১২. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড।
ক) **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, ঊনবিংশ বিলাস।
খ) **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য** — দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ২১৬। তিনি বলেছেন জাহ্নবাদেবীর দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা এবং বীরভদ্র নামক পুত্রলাভ হয়।

গ) **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস** — সুকুমার সেন, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৮৭, ৪০৪, ৩৩৪। তিনি বলেছেন, নিত্যানন্দ বিবাহ করে গৃহস্থ হলেন। বিবাহের পর খড়দহে স্থিতি করলেন। বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র প্রথম পত্নী বসুধাদেবীর গর্ভজাত এবং নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবী। তিনি আরও বলছেন জাহ্নবা নিঃসন্তান ছিলেন বলে প্রথমে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রকে (১৫৩৪-১৫৮৩) পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। জাহ্নবার তীর্থ পর্যটনে রামচন্দ্র বা রামাই সঙ্গে থাকতেন।

ঘ) **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫। ইনি বলেছেন যাহা হোক, এই বিবাহে নিত্যানন্দের দুইটি সন্তান হয়। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র (বীরচন্দ্র), জাহ্নবার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হয়।

১১৩. **শ্রীশ্রীচণ্ডী** — স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। এই বইটির ভূমিকাতে ১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, বৈষ্ণব আচার্য নিত্যানন্দ খড়দহে স্ব-গৃহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি সূত্র উল্লেখ করতে পারি। গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের আদ্যাশক্তি মূর্তিধারণ এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'জয় জয় জগৎ জননী মহামায়া' ইত্যাদি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ এবং শ্রীপাট খড়দহে সৃষ্ট শ্যামসুন্দরের শ্যামমূর্তি ধারণ প্রভৃতি ঘটনার অভিন্নতা প্রদর্শনই তাৎপর্য্য —'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ'—গৌতমীয় তন্ত্র। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যে এক এবং অভিন্ন, কেবল লীলার জন্যই পৃথক রূপ তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় পরিস্ফুট —

'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ,
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

আদি, ৪র্থ, শ্লোক - ৯৬-৯৮

আবার শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি একাকার হয়ে প্রকট অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ শ্রীরাধারূপে—'রসরাজ মহা ভাব দোঁহে একরূপ।' উল্লিখিত যে-কোন ভাবে ব্রহ্মের উপাসনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকলেও ব্রহ্মকে জগজ্জননী মহামায়ারূপে উপাসনার যে একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য আছে তা সহজ-সরল বিচারে বোঝা যায়। জাগতিক পরিবারে মাতার নিকটই সন্তানের অসঙ্কোচে

নির্ভয়ে যত কিছু কথা ও চাওয়া বা পিতা বা অন্য কোনও পরিজনের নিকট সম্ভব হয় না।

মদীয়তাময় অর্থাৎ তিনিই আমার এবং আমার মঙ্গলের জন্য যা কিছু তিনি স্নেহবশে করবেনই সেখানে আমাকে কিছুই বলতে হবে না, ইত্যাদিভাবে হৃদয়ে অনুভব একমাত্র মাতার সম্পর্কে পুত্রকন্যার থাকে। ব্রহ্মের উপর মাতৃভাবের আরোপ ক'রে মহামায়ার উপাসনায় বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং তাঁদের মহাজীবনে বহু সত্য অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। মাতৃভাবে এই যে সহজ সরল উপাসনা যাতে কেবল চোখের জল এবং একাক্ষর মহামন্ত্র 'মা'-ই সম্বল। দোষী অপরাধী ও মহাপাতকী সন্তানের ও প্রাণে বল ও সাহস থাকে যে, মা নিশ্চয়ই অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করেন, এর দ্বারা আকৃষ্ট বহু ধার্মিক গৃহী মহামায়া দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালিপূজাদি শ্রদ্ধা ভক্তি সহ করে থাকেন। —জোতির্ময় নন্দের 'মাতৃদর্শন', বর্তমান [দৈনিক] ১২ই শ্রাবণ, ১৪০৬।

১১৪. **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, ঊনবিংশ বিলাস, পৃ. ৩০৮।

১১৫. **Chaitanya and his companions** —দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৫।

১১৬. **Early history of Vaishnav faith and movement in Bengal** —সুশীলকুমার দে, পৃ. ৮।

১১৭. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১৬০, পৃ. ২২৫।

১১৮. **চৈতন্যমঙ্গল** — জয়ানন্দ, উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১৯০, পৃ. ২৩৬।

১১৯. **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব** — শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক সংকলিত, যুগান্তর [দৈনিক] পত্রিকা, ২২.৮.৭১, পৃ. ২৫।

১২০. **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২২৫।

ক) **প্রেমবিলাস** — নিত্যানন্দদাস, ঊনবিংশ বিলাস হতে মনে হয় অদ্বৈতের পরে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়।

খ) **অদ্বৈতপ্রকাশ** — ঈশাননাগর, এই গ্রন্থে আছে যে খড়দহে নিত্যানন্দের ইচ্ছামৃত্যুকালে অদ্বৈত সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গ) **মুরলীবিলাস** — রাজবল্লভ গোস্বামীর মতে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রের প্রথম খড়দহে আগমনের পূর্বে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়েছে। আরো একটি সূত্র পাওয়া গেছে — খড়দহের স্থানীয় অধিবাসী, নিত্যানন্দের বংশধর শ্রীশকুমার গোস্বামী মহাশয়ের মতে, নিত্যানন্দের ৬৯ বছর বয়সে তিরোধান ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ আবির্ভাবের গুরুত্ব

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীকে মধ্যযুগের সুবর্ণযুগ করে তুলেছিলেন যিনি তিনি একজন সর্বরিক্ত তেজোময় সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যে কি সামাজিক কি রাজনৈতিক কি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বা ধর্মনৈতিক সব বিষয়েই যেন বরাবরই ভারতীয় ঐতিহ্যের পশ্চাৎভূমি। ষোড়শ শতাব্দী এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাই নয়, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও এবং তা একমাত্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জাদুস্পর্শেই বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল। এই সন্ন্যাসীর অসীম তেজস্বিতায় এবং সর্বরিক্ততার নীট যোগফলে পূর্ব-উল্লিখিত শতাব্দী এবং তার বিশেষত মধ্যভাগ সুবর্ণময় হয়ে উঠেছিল, যা কিনা আজও সমাজের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং সমাজের অন্যতম ধারক-বাহক হিসাবে যার ফল সুদূরপ্রসারী। ষোড়শ শতাব্দীর আলোর দিশারী শ্রীচৈতন্যদেব আজও সমাজ-সংহতির এক সমার্থক শব্দ স্বরূপ।

চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপ শব্দদুটি একে অন্যের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকেই নবদ্বীপ ন্যায় শিক্ষাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আর চৈতন্যদেবের উপস্থিতিতে এই নবদ্বীপের প্রসিদ্ধিলাভের গভীরতা আরও বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনজাগরণের ঢেউও লক্ষ করা গিয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ১৪৮৬ থেকে খ্রিস্টীয় ১৫৩৩ এই হল চৈতন্যদেবের জীবনকাল। চৈতন্যের বাল্যকালেই খ্রি. ১৪৯৩-এ হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হন। তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ রাজত্ব করেন ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এটি সর্বাপেক্ষা গৌরবের কাল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহ দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার পূর্বেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রির গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। অর্থাৎ যত্রতত্র ভাবে মুসলমানগণ হিন্দুর উপরে অত্যাচার করলেও তার ধর্মগত উগ্রতা তখন আর ছিল না। হুসেনশাহের শাসনকালে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা গড়ে ওঠে। তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী সমাদর পেতেন। মালাধর বসুর মতো সনাতন-রূপ প্রভৃতি সমাজের অভিজাতরা সহজেই রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক কথায় বলা যায়, সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং উপরতলার মুসলিম সমাজও তখন পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে এনেছে।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহর বিশ্বস্ত কর্মচারী, কবি ও পণ্ডিত। তাঁরা রামকেলিতে বাস করতেন। এছাড়া বাঙালির সংস্কৃতি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন। এঁদের নাম ছিল যথাক্রমে

'সাকর মল্লিক' বা চীফ সেক্রেটারী এবং 'দবীর খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারী। পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিমত্তায় এই দুই ভাই অতিশয় বিশিষ্ট ছিলেন। উপরন্তু রূপ গোস্বামী দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ' এবং 'গীতাবলি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উচ্চবর্গের হিন্দু সমাজ ও উপরতলার মুসলিম সমাজ পরস্পরের কাছাকাছি আসার ফলে পরাগল খাঁ'র মতো উচ্চবর্গের মুসলমানরাও যেমন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী গান শুনেছিলেন, তেমনি পরাগল খাঁ'র আদেশে পরমেশ্বর দাস স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁ'র উদ্যোগ ও সাহায্যে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হওয়ায় ইহা পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত। পরাগল খাঁ'র পুত্র ছুটি খাঁ'র আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এই দুজন শাসনকর্তার উৎসাহে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। তেমনি উচ্চবর্গের হিন্দুরাও তার চেয়ে বেশি ফারসি, আরবি প্রভৃতি পড়ে রাজদরবারের ম্লেচ্ছ আচার কিছু না কিছু গ্রহণ করেছিলেন। অথচ হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তখনই আবার শাস্ত্রচর্চা করে, নূতন দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি প্রণয়ন করে হিন্দু উচ্চবর্ণকে আত্মমর্যাদায় আস্থাশীল করে তুলছে। মালাধর বসুও রাজপ্রাসাদে অস্বস্তি বোধ করেন, সনাতন ও রূপের তো কথাই নেই। মনে হয় হিন্দু সংস্কৃতির জাগরণ চৈতন্যদেবের পূর্বেই সেই শাসকবর্গের সন্নিকটস্থ হিন্দু অভিজাতবর্গকে পর্যন্ত আপনার স্বপক্ষে লাভ করেছিল। অবশ্য এ জাগরণ নিতান্তই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয়, তাই সুলতানদেরও আপত্তি হয়নি। এই ছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে বাঙালি সমাজের অবস্থা। মিলিত বাঙালি হিন্দু-মুসলমান স্তরের নয়। বরং সেই নব-জাগ্রত আত্মরক্ষাকামী সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্যদেব আর তাঁর পার্ষদগণ। যে-কোনও রাজার শাসনকাল সেই নির্দিষ্ট অধিপতির চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশই যেন তৎকালীন সমাজ দর্পণের মূলশক্তি। চৈতন্যপূর্ব যুগে ইসলামি শাসন বাংলার বুকে কায়েম করার ফলে যে সকল সামাজিক বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ ছায়াতরু হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেগুলি হল ঃ—

১) ন্যায় স্মৃতি ব্যাকরণ অলঙ্কার চর্চার মধ্য দিয়ে ভক্তিবাদী ঔদার্য হিন্দুহৃদয় থেকে দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল।

২) ধীরে ধীরে সমাজে তন্ত্রাচারী শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

৩) এই কঠিন স্পর্শে মদ্যমাংসলোভী বামাচারীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

৪) সহজিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাবও বেড়ে গিয়েছিল।

৫) তুলনায় প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির পথে চলেছিল।

৬) সার্বিকভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের রৌদ্রস্নানে সাধারণ জীবন 'নীতিহীন' অরণ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে ষোড়শ শতাব্দীর সমাজচিত্র যথার্থভাবেই ধরা পড়েছে।

ধর্ম-কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন॥
....
বাশুলী পূজয়ে কেন নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥[১]

এহেন পরিস্থিতিতে হিন্দুসমাজও কলুষিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই রক্ষাকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রবর্তক ও দেবতুল্য মহামানব শ্রীচৈতন্য, একথা অনস্বীকার্য।

হিন্দুদের মধ্যে ছিল প্রবল বর্ণভেদ। তাই মানুষ ছিল অসহিষ্ণু, অত্যাচারী এবং বিভ্রান্ত। শাসক-শাসিতের রাজনৈতিক সম্পর্কও মধুর ছিল না। তাই নবদ্বীপে অল্প কয়েকজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সেই কারণে তাদের মধ্যে—'সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার'।

কিন্তু এই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের ছিল পাষণ্ডী ও যবনরাজভীতি। পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিমভাগে উচ্চস্বরে হরিনাম করা নিরাপদ ছিল না—

শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে, — 'হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা — তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার'॥
কেহ বোলে, — 'এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলামু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল'॥[২]

এই পাষণ্ডীদলন এবং রাজভীতি দূর করার জন্য সমগ্র নবদ্বীপ তথা বাংলার সমাজ চেয়েছিল এক বিপ্লবীকে। চেয়েছিল কৃষ্ণের অবতারত্ব ও আগমন। যিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, যিনি কংস শিশুপাল প্রভৃতি অত্যাচারীকে বিনষ্ট করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন—সেই কৃষ্ণকে।

জীবের উদ্ধারের জন্য, রাজভীতি দূরীকরণে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অত্যাচারী অহংকারী মানুষের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, হরিদাস প্রমুখ পণ্ডিতরা কৃষ্ণের অবতারত্ব চাইলেন শুধুমাত্র শাক্ত কিংবা বাশুলী বা পুত্তলি পূজা ছেড়ে কৃষ্ণ পূজার জন্য নয়, জীবের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও এর মধ্যে নিহিত ছিল।

তথাকথিত পতিত-নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের উদ্ধারের জন্যই স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরাঙ্গের

রূপ পরিগ্রহ করে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, সে আবির্ভাব নিষ্ফল হয়নি—

জয়ানন্দ বলেছেন, গৌরাঙ্গের দ্বারা—

'আচণ্ডাল আদি জত হইব নিস্তার'[৩]

এই ইঙ্গিতে তৎকালের সামাজিক সমস্যা পূরণের অতি গুরুতর কথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

ধৰ্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধৰ্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।
....
তবে প্রভু যুগ ধৰ্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।।
কলিযুগে ধৰ্ম্ম হয় হরি সংকীৰ্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।[৪]

এই সমাজমানসের আকাঙ্ক্ষা চরিতগ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের মানুষের এক নিরালম্ব শূন্যতার ছবি আমরা দেখতে পাই। মানুষের সামনে কোনো আদর্শ ছিল না। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নানা গোলযোগে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা সকলেই কামনা করেছিল এক বিরাট ব্যক্তিত্বের, এক বিরাট আদর্শের।

ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র-প্রবর্তিত সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির নিপীড়নে সমাজে নারীর অবস্থা হয়েছিল দুর্বিষহ। তাই অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যকে অঙ্গীকারবদ্ধ করালেন—

অদ্বৈত বলয়ে—'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।
....
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা।।
....
প্রভু বলে, 'সত্য যে তোমার অঙ্গীকার'।।[৫]

সমাজের সর্বত্র অনাচার—

রাজা নাঞি পালে ম্লেচ্ছের আচার।
দুই তিন চারি বর্ণ হৈল একাকার।।
দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি।
ক্ষেত্রী যুদ্ধে শক্তিহীন নাঞি যতিসতী।।[৬]

এই বর্ণনায় আমরা দেখি রাজা ম্লেচ্ছজাতি, প্রজাপালন করেন না। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, প্রজামাত্রেই তাঁর অত্যাচারের শিকার। ক্ষত্রিয়রা শক্তিহীন হয়েছে, তারা যুদ্ধ করতে পারে না। সমাজের চারিবর্ণ-বিভাগ লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে অস্বীকার

করা হয়েছে। কেবল ব্রাহ্মণ-শূদ্র আছে। এই দুই বর্ণের মধ্যেও মিল একেবারেই নেই। তারা বহু বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত। তাই ধর্মের পরাভব হয়েছে। অধর্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে অবতারের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। তাই জয়ানন্দ গৌরাঙ্গকে যুগাবতার বলে নির্দেশ করলেন—

'যুগাবতারে যত করিলা গৌরাঙ্গ'।[৭]

এক এক যুগে এক এক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। প্রত্যেক যুগের সমস্যাকে সম্পূরণ করবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হন তিনি যুগাবতার।

নিমাই প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন ব্রাহ্মণদের জন্য হয়নি। ব্রাহ্মণেরা যে সকল জাতিকে অস্পৃশ্য বলে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাঁদের জন্য এ আন্দোলন করা হয়েছিল। যবনরাজ ও ব্রাহ্মণ এ দুয়ের নিষ্পেষণে এই আন্দোলন জন্মলাভ ক'রে একটা বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল। বাংলার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের ইতিহাস ও নিমাইয়ের অদ্ভুত নবদ্বীপলীলা তার সাক্ষী। এই সময় জীব উদ্ধারের পরিকল্পনায় শিষ্টের পালন ও দুষ্টের সংহারের প্রয়োজন স্বীকৃত হল। অতঃপর —

পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে।।[৮]

'পাষণ্ডী ও যবনরাজভয়' যুগপৎ বিতাড়ন-আন্দোলনের নেতা নিমাই। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে কোলে তুলে নেবার ক্ষমতা নিমাই চরিত্রের বিশেষত্ব।

তৎকালীন হিন্দু সমাজকে চরিত্রদুষ্টির নানা বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। আরো প্রত্যক্ষভাবে বলতে গেলে প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্যকে কেউ কেউ সমাজ-সংস্কারক, জাতিভেদ উচ্ছেদ আন্দোলনের পথিকৃৎ ইত্যাদি বলেছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'Chaitanya and his age' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে সমাজ-সংস্কারক ও জাতিভেদের মূলোচ্ছেদক রূপে চিহ্নিত করেছেন।

একটু তলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তদানীন্তন উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস ও আচরণকেই মনে করত ধর্মের সার। এদিকে তন্ত্রাচারের বিকার ও আশ্রিত ব্যভিচার দুর্বল করে ফেলেছিল সমগ্র সমাজকে। শাস্ত্রচর্চা ও যজনযাজনে লিপ্ত ব্রাহ্মণগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সাধারণ সমাজ থেকে। এই কালেই মাধবেন্দ্রপুরীর প্রভাবে ও তাঁর শিষ্য অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপ-শান্তিপুরে গড়ে উঠেছিল একটি বৈষ্ণব পরিমণ্ডল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মাধব মিশ্র, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন। শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দ। সে সময়ে যবন হরিদাস এসে অদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

"হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র তরঙ্গে।।"

বৈষ্ণব পরিমণ্ডলটি ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করছিল, ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। এই

পরিমণ্ডলের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ মাত্র ৪৭ বছরের তাঁর জীবনকাল বৈষ্ণব ক্ষীণধারাতে এনে দিয়েছিল ভাবের বন্যা। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা সম্বন্ধে কেনেডির মন্তব্যটি মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, "But his was the spirit that took these elements of a common faith and fused them in the fire of his burning devotion until they came out as a new creation a living movement full of his own emergy." শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের জাদুতে ও সাধনসিদ্ধির বৈভবে তাঁর চারিদিকে প্রতিভার সম্মেলন ঘটেছিল। ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন[৯]।

চৈতন্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাইরের দিকে শাসক-শক্তির রোষতোষের কারণে সিংহাসনে অধিকারী বদল বা প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাধারণ মানুষ, ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক শান্তি একেবারেই ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে ছিল প্রবল বর্ণভেদ। তাই মানুষ ছিল অসহিষ্ণু, অত্যাচারী এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। শাসক-শাসিতের রাজনৈতিক সম্পর্কও মধুর ছিল না। তাই নবদ্বীপে অল্প কয়েকজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'র লেখক গোপাল হালদার যথার্থই লিখেছেন—"বাঙালী শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে তিনি সার্থক রূপদান করেন—একদিকে অভিজাতদের মধ্যে ম্লেচ্ছাচার রোধ করে, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নামধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান করে। আর তৃতীয়ত, এইভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক-ধর্মাচারণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়-ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন, এবং সেই সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠান-বাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন, সাধারণ ভাবে সেই মনে জাগিয়ে তোলেন সমকালের প্রতি একটা মমতা (তাই চৈতন্য-ভক্তের কথা হল, 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগ সার'।), মানুষের একটা মূল্যবোধ (তুচ্ছতম মানুষও 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'), নর মানুষেরও একটা ঐশী মহিমা ('কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ')। এই সাংস্কৃতিক-সামাজিক জাগরণে বাঙালীর চেতনা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, নানাদিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঙালীর এই জাগরণ সম্পূর্ণ জাগরণ নয়, কারণ বাস্তব জীবন ও বৈষয়িক উদ্যোগ-প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই জাগরণ আবদ্ধ ছিল। তবু এই জাগরণ এক পরম মহোৎসাহ, আর সাহিত্যে মুখ্যত তা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব-মণ্ডলীর দান।"[১০]

নবদ্বীপলীলার মূল নায়ক গৌরাঙ্গ হলেও মহানায়ক হিসাবে নিত্যানন্দের ভূমিকা অপরিসীম। নিত্যানন্দের উল্লেখ ছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকা যথেষ্ট ম্লান প্রতিভাত হয়। নীলাচলবাসী ভাব-সমাধিমগ্ন চৈতন্যের রাগানুগা প্রেমধর্মের প্লাবন-উৎস ছিলেন একমাত্র

নিত্যানন্দ। পরে তা নানান শাখা-প্রশাখায়, নানা জনের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রবাহিত হয়। সমাজের নিচুতলার অস্পৃশ্য হিন্দুসমাজ যেমন একদিকে চৈতন্যর প্রেমাকর্ষণে বাঁধা পড়ে স্বধর্ম ত্যাগ করতে পারেনি, তেমনি অনেক মুসলমান ভক্ত কবিও চৈতন্য নামের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন।[১১] এই প্রভাবেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠার পাশাপাশি জাতীয়-সংহতি সমাজ-সংহতির অন্যতম ও বিশেষ সমাধানের একমাত্র সূত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া কর্মপ্রবাহের মানদণ্ড হিসাবে শ্রীচৈতন্যের বিশেষ সহযোগী নিত্যানন্দ শুধু তাঁর dedication-এর মাধ্যমেই সবার অলক্ষে চরিত-সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্যের আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন। সামাজিক ভাবেও বৈষ্ণবদর্পণে ও বাংলার সমাজসংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর নামটি যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

প্রবাদপুরুষ শ্রীচৈতন্যের প্রতিমূর্তি আরও[১] উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিত্যানন্দের সাহচর্যে, সহধর্মিতায়, সহমর্মিতায় ও সহকর্মিতায়। তাঁর সহযোগে চৈতন্যদেব যেমন উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁর সমকালীন ও ভাবীসমাজও তেমনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যজীবনীতে আমরা দেখেছি, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পর্যুদস্ত করেছিলেন এরকম ঘটনার উল্লেখ। এর পাশাপাশি সমাজে উচ্চশ্রেণীতে বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাসও লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। যদিও ব্রাহ্মণেতর সমাজে গোপনে গোপনে সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্রের দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হয়েছিল সেই প্রভাবপ্রেরণা। সেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাবধারা বৈষ্ণব সহজিয়াদের দল পুষ্ট করেছিল।

জগাই-মাধাই উদ্ধার অধ্যায় নবদ্বীপের অন্যতম ঘটনা। মাধাইয়ের ভাঙা মদ্যভাণ্ডের কানায় নিত্যানন্দের মাথা ফেটে গিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব রেগে গিয়ে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করতে গেলে নিত্যানন্দই এ ব্যাপারে তাঁর পথিকৃৎকে নিরস্ত্র করেন।

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন ছিল দাস্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দাস্যভাব-ভাবিত নিত্যানন্দের উন্মাদনা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। তাই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের নবদ্বীপলীলায় সর্বদা দাস্যভাবের উপরেই জোর দিয়েছেন। যদি কেবলমাত্র আদি-রসাত্মক 'মধুর ভাব' চৈতন্যের ভক্তি প্রচারে প্রাধান্য পেত, তবে তাতে ভক্তি থেকে উৎসারিত সাময়িক আবেগের বিষয়টি প্রাধান্য পেত না, ভক্তের রহস্যময় মধুর রসপূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবাবেগ বড় হয়ে উঠত। তাতে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে জনসাধারণের ভূমিকাটি নিতান্তই গৌণ হয়ে যেত। দাস্যভাবে ভাবিত নিত্যানন্দের কার্যকরী ভূমিকা শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, ভাবীকালের জীবনদর্পণে ইতিহাসের পাতায়ও স্বর্ণাক্ষরে লেখার উপযোগী বিষয়। দাস্যভাবের নিখুঁত সমন্বয় সাধনে এবং নিত্যানন্দের উপযোগী ভূমিকায় যোড়শ শতাব্দীর বিভ্রান্ত সমাজে জনজাগরণ যে সত্যতার জন্ম দিয়েছিল তার নাম গণতন্ত্র। আজও বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে আমাদের দেশে সু-প্রতিষ্ঠিত সেই গণতন্ত্রের মর্যাদা এতটুকু ম্লান হয়নি, বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ

সকল দেশের সাহিত্যের স্ফুরণ ঘটে ধর্মকে কেন্দ্র করে। বাংলা সাহিত্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। চর্যাগীতিকোষকে ব্যতিক্রম ধরলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল মুখ্যত দেববাদ নির্ভর। তাই বাংলাদেশে তখন কানু ছাড়া গীত ছিল না। মানুষের সকল আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ঐ কৃষ্ণকথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। যাত্রায়, কাব্যে, উপাখ্যানে এই কৃষ্ণকথা লোকশিক্ষা প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু কেবল ভগবানই তখন লক্ষ্য ছিল, উপলক্ষ্য ছিল মানুষ। অথচ এই মানুষের মধ্য দিয়েই দেবমাহাত্ম্য কথা প্রচারিত হত। কিন্তু যেদিন 'সব অবতার সার গোরা অবতার'-এর আবির্ভাব ঘটল, সেদিন জনগণ দেখল, জানল, বুঝল—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি'।

অর্থাৎ নাম-নামী, অভেদ যেমন আগুন থেকে তার দাহিকা শক্তিকে আলাদা করা যায় না, তেমনি ভক্ত থেকে ভগবানকে আলাদা করা যায় না। কারণ শ্রীহরি ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নন। তিনি এই ধূলার ধরণীতে মানুষের পাশে দাঁড়ান—তিনি নর-নারায়ণ। কলিযুগে সেই নর-নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর আজানুলম্বিত বাহু—বহিঃ রাধা অন্তঃ কৃষ্ণের মিলিত রূপ। আদ্বিজ চণ্ডালের মধ্যে তাঁর ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে জনগণ বুঝল—

'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঁই'।

এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গড়ে উঠেছিল 'চরিতসাহিত্য'। মুরারি গুপ্তই সংস্কৃতে সর্বপ্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য লিখেছিলেন। তিনি 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে সংস্কৃতে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই চরিতসাহিত্যের এক অনন্য দিশারী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময় চরিতসাহিত্য। রক্তমাংসে গড়া এক ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনকথা নিয়ে কাব্য রচনার রীতি সে যুগে ছিল না। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে প্রথম রচিত এই জীবনীকাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। বাংলা ভাষায় জীবনীসাহিত্য রচনাও এই প্রথম। চৈতন্যচরিতে লোকের মন অভাবিত মুক্তির স্বাদ ও আনন্দের পরিচয় পেল। অতীত স্বর্ণযুগ-কল্পনার ঠুলিতে রুদ্ধ বর্তমানের চোখ যেন রূপরসের মহোৎসবে উন্মীলিত হল। তাই বৈষ্ণব কবি গাইলেন—

'প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগ সার'।

নবীন ভারতীয় সাহিত্য একটু অন্য দিকে বাঁক ফিরল।[১] শুধু দেবকল্প মানব চৈতন্যদেবকে নিয়েই নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়েও পরবর্তীকালে জীবনীসাহিত্য রচিত হয়েছে। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁর জীবনী নিয়েও বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে। পণ্ডিতমহলে অবশ্য সেইসব গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে বিতর্ক আছে। আমরা সেসব বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। শুধুমাত্র বলবার বিষয় এই যে গ্রন্থগুলি যেভাবেই হোক রচিত হয়েছিল এবং তা থেকে নিত্যানন্দের জীবনের অনেক ঘটনা আমাদের গোচরীভূত হয়। গ্রন্থগুলি ভক্তসমাজে বহুল প্রচলিত। বাংলা সাহিত্যে এগুলি জীবনীশাখার অন্তর্ভুক্ত। বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'ই প্রথম রচিত হয়। পরবর্তীকালে রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির অধিকাংশই 'চৈতন্যভাগবত' অনুসারী।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে কেউ কেউ কড়চা বা নোট রেখে গিয়েছিলেন। সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীর কথিত কাহিনী অবগত হয়ে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান রচিত হয়েছিল[২]।

বহু প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে রাজসভা কবিরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের গুণ এবং শৌর্যবীর্যের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করে কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু একজন মাটির মানুষ যিনি কোনো রাজবংশোদ্ভূত নন, শুধুমাত্র প্রেমভক্তি এবং চোখের জল যার একমাত্র সম্বল সেই দেবোপম মানুষকে নিয়ে যে জীবনীকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ চৈতন্যজীবনী সাহিত্য।

বাংলা চরিতসাহিত্যের আরেকটি মূল্যবান অংশ আত্মচরিত সাহিত্য রচনা। কোনো ব্যক্তির জীবনী রচনায় তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ সহায়। নিজেকে নিরাসক্তভাবে দেখা এবং নিজের অতীতের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন। সেদিক থেকে আত্মচরিত রচনার সঙ্গে চরিতগ্রন্থ রচনার পদ্ধতি একেবারে পৃথক। নিজেকে দেখা এবং অপরকে দেখার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তার দ্বারাই উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যেকার ভিন্নতা বোঝা যায়[৩]। জীবনচরিত গ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তির 'Light and Shadow' সহ তার সমস্ত দোষগুণ ভালোমন্দ মিশ্রিত জীবনকে আঁকা উচিত। এই মনোভাব ড্রাইডেন থেকে স্ট্রেচি পর্যন্ত অধিকাংশ চরিত লেখকের মধ্যে চলে এসেছে কেননা তাহলে চরিত্রটি ঠিক মানুষ হয়, জীবন্ত বা বাস্তব হয়, এমনকি কোলরিজও একদা লিখেছেন—'The duty of an honest biographer is to portray the prominent imperfection as well as excellences of his hero'.[8]

কথায় বলে — 'নিতাই ভজলে গোরা পাওয়া যায়'। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মানস

প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যের ভাব নিত্যানন্দের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যে পরে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন। যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল। প্রেম ও কৃষ্ণ যেমন এক, তেমনি গৌর-নিতাই যেন এক ও অভিন্নহৃদয়। তাই বলা হয়—'নিতাই এনেছে নাম গৌর হরি হরি বোল।' এই জীবপ্রেমের প্লাবনে শুধু 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'নি—ভেসেছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারত। এবং 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম'—সর্বত্রই হরিনাম সংকীর্তনে ও মানবতার আহ্বানে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের আলাপে মনের সঙ্গে মন মিলে যায় এবং যেখানে আত্মা আত্মার সঙ্গে আপনার বিনিময় করতে চায়। এই বিনিময়-মাধ্যম হচ্ছে—'চরিতসাহিত্য'। আধুনিক সাহিত্যশাখায় জীবনী বা চরিত-সাহিত্যের একটা বিশেষ মূল্য আছে। Biography-তে আধুনিক যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। যার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজজীবনে প্রবেশ করা যায়। আরেক প্রকার জীবনীসাহিত্যের দৃষ্টান্ত মেলে, যাকে বলে Hagiography। রচয়িতার ভক্তচিত্তটি এগুলিতে ধরা পড়ে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে চৈতন্যচরিত বা জীবনী-সাহিত্য মধ্যযুগের ফসল। চৈতন্যদেব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেবকল্প চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছেন। চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্যে নিত্যানন্দ শুধু বিষয় হিসেবে উল্লিখিত হননি, প্রেরণা হিসেবেও কাজ করেছেন। বিশেষত বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রসঙ্গে এ কথা সত্য। তাঁরা নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের অনুগৃহীতরূপেই তুলে ধরেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কবি উভয়েই তাঁদের কাব্যরচনার প্রেরণারূপে নিত্যানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বটে। চৈতন্যদেবের পার্থিব জীবনের ঘটনা এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোরলীলার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ এই গ্রন্থেই সমধিক পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে শুধুমাত্র কৃষ্ণের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্লভ করে গড়ে তোলেন নি। তাঁর মানবিক রূপকে তত্ত্বের আবরণে আবৃত করেননি। তাঁর জীবনকে বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত করে, প্রতিটি ঘটনা স্তরপরম্পরায় বর্ণনা করে দিব্যজীবনরূপে গড়ে তুলেছেন। কবি তৎকালীন সমাজজীবনের পটভূমিতে চৈতন্যজীবনের পরিবেশ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সামাজিক পরিবেশে একটি ব্যক্তিজীবনকে সর্বশ্রেণীর পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপিত করেছেন যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার মানবিক আবেদন। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্য অবশ্যই দেবরূপী মানুষ কিন্তু সেই মানুষটিকে বৃন্দাবনদাস এঁকেছেন পিতার প্রিয় পুত্র, স্নেহময়ী জননীর প্রিয় সন্তান এবং প্রেমময়ী পত্নীর প্রিয়তমরূপে। চৈতন্যদেবের গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনায় যে বেদনাঘন ভাবরস সৃষ্টি করেছেন তাতে গ্রন্থটি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের

মানবিক ও দৈবীরূপও এ গ্রন্থের পরম সম্পদ। পরবর্তীকালে রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির অধিকাংশই চৈতন্যভাগবত অনুসারী। বৃন্দাবনদাস-বিরচিত ভাগবত যদিও চৈতন্যজীবন কথাকে কেন্দ্র করেই রচিত, তথাপি এই কাব্যে চৈতন্যচরিত্র অপেক্ষা নিত্যানন্দচরিত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চরিতসাহিত্যগুলি যদিও গৌরাঙ্গ-জীবনকেন্দ্রিক তবু চৈতন্য পার্শ্বচররূপে নিত্যানন্দের ভূমিকা সেখানে কম নয়। বিশেষত 'চৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এ বৃন্দাবনদাস তাঁর মাতা নারায়ণীকে বিশেষভাবে অনুগৃহীতা বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু চরিতসাহিত্য বা পদাবলী সাহিত্য নয়, সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব দর্শনে ও বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দের নাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যই পুরীতে অবস্থানকালে নিত্যানন্দকে বিশেষভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অন্তত ভক্ত সমাজে 'নিমাই-নিতাই' একত্রিত জনপ্রিয়তা পেলেও গৌরাঙ্গকে নিয়ে যেমন একাধিক জীবনীসাহিত্য রচিত হয়েছে, নিত্যানন্দকে নিয়ে তেমনটি হয়নি। বিশেষত নবদ্বীপে এসে নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ববর্তী নিত্যানন্দের জীবনকথা নানা কিংবদন্তীতে আচ্ছন্ন। বৃন্দাবনদাস, চূড়ামণি দাস ও জয়ানন্দের রচনায় নিত্যানন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতেও নিত্যানন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য মেলে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বাংলা ভাষায় সন্ত জীবনী রচনা করেন কিন্তু নিত্যানন্দ অবধূতের কোনে। প্রামাণ্য জীবনী রচিত হয়নি। এর কারণগুলি অনুধাবনযোগ্য। নিত্যানন্দ ছিলেন দাস্যভাবের উপাসক। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে 'সখ্যভাব', 'দাস্যভাব', গৌণভাব, 'মধুরভাব' হল প্রধান ভাব। তাই নিত্যানন্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব হলেও বৃন্দাবনী মতাদর্শে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না।

নবদ্বীপে আগমনের পূর্বে নিত্যানন্দের জীবন ছিল রহস্যাবৃত। চৈতন্য এবং অদ্বৈত তাঁর জাতি-পরিচয় জানতেন না। নিত্যানন্দের আনুমানিক জন্মসময় ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে, তিরোধান হয় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে[৫]।

নিত্যানন্দ 'বন্দ্যোপাধ্যায়' কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। নবদ্বীপে আসার পূর্বে তিনি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেছেন। এই কারণে তিনি বহুদর্শী। জগাই-মাধাই উদ্ধার নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের একটা বড় ঘটনা। এ ব্যাপারে নিত্যানন্দই অগ্রগামী হয়ে মাধাইয়ের মদ্যভাণ্ডের কানায় নিজের মাথা ফাটালেন। গৌরাঙ্গ তা দেখে রেগে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'চক্র চক্র চক্র'—অর্থাৎ চক্র দিয়েই পাষণ্ডীদের মাথা কাটবেন। কিন্তু নিতাই গৌরাঙ্গকে নিরস্ত্র করেন।

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে ছিল দাস্যভাব। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দাস্যভাব-ভাবিত নিত্যানন্দের উন্মাদনা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। তাই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলায় সর্বদা দাস্যভাবের উপরেই জোর দিয়েছেন। যদি কেবলমাত্র আদিরসাত্মক 'মধুরভাব' চৈতন্যের ভক্তি প্রচারে প্রাধান্য পেত, তবে তাতে ভক্তি থেকে উৎসারিত সাময়িক আবেগের বিষয়টি প্রাধান্য পেত না, ভক্তের রহস্যময় মধুররসপূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবাবেগ বড় হয়ে উঠত। তাতে চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনে জনসাধারণের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ হয়ে যেত। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়েছেন।

বৃন্দাবনদাস মূলত সমস্ত ঘটনা নিত্যানন্দের মাধ্যমেই শুনেছিলেন। তাই তিনি নিত্যানন্দ সংশ্লিষ্ট-চৈতন্যজীবনের প্রামাণ্য তথ্যগুলিকে যথার্থভাবে বর্ণনা করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর অর্থাৎ তেইশ বৎসর বয়সের সময়ে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে গ্রন্থের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে অধিকাংশগুলির সহিত নিত্যানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে সকল ঘটনার সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না কবি সেগুলি বাদ দিয়াছেন, না হয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।'[৬]

ষোড়শ শতক

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ—(আদিখণ্ড) ঃ— কবি বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ রায়কেই তাঁর ইষ্টদেব বলে বর্ণনা করেছেন—

> ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায়।
> চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়। শ্লোক ১১।। আদি, ১ম

নিত্যানন্দ সেখানে বলরাম অবতার। বলরাম স্বরপ নিত্যানন্দের স্তব সম্পূর্ণ করলে তবেই কবির পক্ষে চৈতন্য কীর্তন করা সম্ভব।

> সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু-বলরাম।
> যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণযশোধাম।।
> মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
> যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে।।
> অতএব আগে বলরামের স্তবন।
> করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন।।
> সহস্রেক-ফণাধর প্রভু বলরাম।
> যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম।। শ্লোক ১২-১৫।। আদি, ১ম

বৃন্দাবনদাসের কাব্যে মূল প্রেরণাশক্তি নিত্যানন্দ। তিনিই চৈতন্যচন্দ্রের যশ-জ্যোৎস্নার আধার। নিত্যানন্দ অপেক্ষা কেউ প্রিয়তর নয় চৈতন্যের। তিনি সর্বদা তাঁর দেহে বিরাজ করেন।

ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।।
তাঁহার চরিত্র যেবা জানে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়।। শ্লোক ১৭-১৮।। আদি, ১ম

নিত্যানন্দ চরিত যে শ্রবণ করে বা গান করে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়।' শুধু চৈতন্যের প্রীতি নয়, মহেশ-পার্বতী পর্যন্ত প্রীত হন নিত্যানন্দ বন্দনায় এবং জিহ্বায় সরস্বতী অধিষ্ঠিত হন।

মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।। শ্লোক ১৯।। আদি, ১ম

শিব পার্বতী প্রত্যেককেই বলরাম তথা নিত্যানন্দ-উপাসক করে তুলেছেন কবি। কেননা বৃন্দাবনদাসের বিশ্বাসেও নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ অবতার। এই প্রসঙ্গে বলরামের রাস বর্ণনা করেছেন কবি।

তান রাসক্রীড়া-কথা—পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার।।
দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে।।
যে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা-পরীক্ষিতে।।
যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন।।
যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে।।
চারি বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব পুরাণে বিদিত।। শ্লোক ২৩-৩১।। আদি, ১ম

কৃষ্ণ ও বলরামের রাসলীলা ভাগবত অনুসারে বর্ণনা করেছেন কবি।

মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ।।
একঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে।। শ্লোক ৩২-৩৩।। আদি, ১ম

যদি কেউ বলরামের রাসলীলায় সন্দেহ প্রকাশ করে অসহিষ্ণু হন সেইসব পাঠকদের উদ্দেশ্যে কবি বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁরা ভাগবতের অর্থ জানেন না।

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে,—'বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে'
কোন পাপী শাস্তর দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে।। শ্লোক ৪০-৪১।। আদি, ১ম

যদি কেউ বলরাম অবতারকেও অস্বীকার করতে চায় তবে তারা শ্রীচৈতন্যের কাছে অপরাধী হবে।

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্বঠাই।।
মূর্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ।। শ্লোক ৪২-৪৩।। আদি, ১ম

এরপর আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায়েই নিত্যানন্দ বলরামের দশবিধ গৌরকৃষ্ণ সেবার সবিশেষ উল্লেখ করেছেন কবি বৃন্দাবনদাস।

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন।।
আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে।। শ্লোক ৪৪-৪৫।। আদি, ১ম

গরুড়ও বলরামের অংশীভূত। ব্রহ্মা-শিব-সনকাদিকুমার-ব্যাস-শুক-নারদাদি ভক্তগণকে পূজিত করে তুলে বলরাম অবতার নিত্যানন্দকে সর্বোচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই চরিতকার।

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী।।
কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যার।।
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময়।। শ্লোক ৪৭-৪৯।। আদি, ১ম

আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায়ে আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব স্বরূপ সঙ্কর্ষণ অবতারের যশ ঘোষিত হয়েছে।

আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত্য ইহা না জানয়ে সব।। শ্লোক ৫০।। আদি, ১ম

এই প্রভু সঙ্কর্ষণ যেমন অনন্ত শক্তিমান, তেমনি তিনি শুদ্ধসত্ত্ব করুণাময়। কেন যে বৈষ্ণবের কাছে এই 'শেষ অনন্ত' সঙ্কর্ষণ রূপ এত বরণীয় তাঁর মহিমা বর্ণনায় কবি লিখলেন—

যে অনন্ত নামের শ্রবণ সঙ্কীর্তনে।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে।।
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে।।
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার।।
অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র সহিতে।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে।। শ্লোক ৬২-৬৫।। আদি, ১ম

শ্রীঅনন্ত কৃষ্ণ সিন্ধু অতিক্রম করতে চান। নারদ ব্রহ্মার সভায় গিয়ে সঙ্কর্ষণের বন্দনা গাইলেন।

অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে।।
কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে।।
লাগ্ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে।।
পালন-নিমিত্ত কেন প্রভু রসাতলে।
আছেন মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে।।
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে।। শ্লোক ৬৯-৭৪।। আদি, ১ম

তাই সঙ্কর্ষণ অবতারের এই সমস্ত গুণগাথা স্মরণ করেই কবি নিত্যানন্দ অনুরাগকেই জীবের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন।

ব্রহ্মাদি—বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই' নারদ পূজিত সর্বস্থানে।।
কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ।। শ্লোক ৭৫-৭৬।। আদি, ১ম

কবি আরও বললেন, সংসারের বিপদসাগর ত্রাণ হতে গেলে নিতাইচাঁদের ভজনা ছাড়া জীবের অন্য গতি নেই। জন্মে জন্মে এই বলরাম অবতারের প্রতি ভক্তিকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেছেন। ব্রাহ্মণের নানা ভেদ যেমন—'দ্বিজ', 'বিপ্র' ইত্যাদি, তেমনই 'অনন্ত', 'বলদেব' নিত্যানন্দেরই নামান্তর।

'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।

এই মত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব'।। শ্লোক ৭৯।। আদি, ১ম

এই অন্তর্যামী স্বরূপ নিত্যানন্দের নির্দেশেই কবি চৈতন্যচরিত্র রচনা করতে বসেছেন।

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।। শ্লোক ৮০।। আদি, ১ম

নিত্যানন্দের কৃপাতেই তিনি চৈতন্যচরিত্র কথা লিখবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে যশোময় অনন্ত বিগ্রহের বন্দনা করেছেন।

চৈতন্য-চরিত্র স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।

যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়।।

অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।

গাইলুঁ তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব।। শ্লোক ৮১-৮২।। আদি, ১ম

তিনি চৈতন্যভক্তদের কাছে যা কিছু শুনেছেন তার সাহায্যেই এই বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র লিখেছেন।

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত।

ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত।।

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে?

তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে।। শ্লোক ৮৩-৮৪।। আদি, ১ম

কবি এখানে বলেছেন তিনি কাষ্ঠপুত্তলী সমান—শুধু গৌরচন্দ্র তাঁকে যা বলান তিনি তাই বলেন।

চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি।

যেন-মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি।।

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।। শ্লোক ৮৫-৮৬।। আদি, ১ম

আদিখণ্ডে নিমাইয়ের 'বিদ্যার বিলাস', মধ্যখণ্ডে 'চৈতন্যের কীর্তন প্রকাশ', শেষখণ্ডে 'সন্ন্যাসি রূপে নীলাচলে স্থিতি' এবং যেভাবে নিত্যানন্দের হাতে গৌড়মণ্ডলের ভার অর্পিত হল, সেভাবেই কবি তাঁর চৈতন্যচরিত কথা সাজিয়েছেন—

মন দিয়া শুন, ভাই, শ্রীচৈতন্য-কথা।

ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা-যথা।।

ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা-আনন্দের ধাম।

আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড-নাম।।

'আদিখণ্ডে' — প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
'মধ্যখণ্ডে' — চৈতন্যের কীর্তন প্রকাশ॥
'শেষখণ্ডে'—সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি॥ শ্লোক ৮৮-৯১॥ আদি, ১ম

কবি তাঁর আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই সমস্ত কাব্যবর্ণিত অংশকে সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছেন। সেই অনুসারে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ যে যে স্থানে আছে তার কবিকৃত উল্লেখ এই প্রকার—

মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্তন॥
মধ্যখণ্ডে, 'ষড়্‌ভুজ' দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈত দেখিলা 'বিশ্বরঙ্গ'॥
নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ড, হলধর হৈল গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল-মুষল দিলা নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে, কৃষ্ণ-রাম—চৈতন্য-নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই॥
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত কৌতুক।
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥
মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই—কৃষ্ণ-রাম।
জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্॥
মধ্যখণ্ডে, দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক-ঠাঞি॥
মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিলা তুলিয়া॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, বলরাম পরম প্রচণ্ড॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞা॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কথেক দিবস।
করিলে পৃথিবীতে পর্যটন-রস॥

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-কৃপায়॥
যে-তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়, তার নাহি সীমা॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন॥ শ্লোক ১২১-১২৪, ১২৬, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫-১৪৬, ১৪৯, ১৫৭, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১-১৮২॥ আদি, ১ম

বৃন্দাবনদাস ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে একত্রিত করে যুগলচরণে নিজের নমস্কার জানিয়ে লিখলেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ শ্লোক ১৮৫॥ আদি, ১ম

আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিত্যানন্দকে গৌরচন্দ্রের সেবা-বিগ্রহ বললেন কবি—

জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥ শ্লোক ৫॥ আদি, ২য়

এরা দুই ভাই আবার দুই ভক্ত, ব্রহ্মার হৃদয়ে কৃষ্ণতত্ত্বমূর্তি ঘটান—

অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই ভাই আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥ শ্লোক ৬॥ আদি, ২য়

তৎকালের সামাজিক সমস্যা পূরণের অতি গুরুতর কথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

ধর্ম-পরাভব হয় যখন যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে॥
সাধুজন-রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে॥ শ্লোক-১৯-২০॥ আদি, ২য়

এই সমাজমানসের আকাঙ্ক্ষা চরিতগ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের মানুষের এক নিরালম্ব শূন্যতার ছবি আমরা দেখতে পাই। মানুষের সামনে কোনো আদর্শ ছিল না। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নানা গোলযোগে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা সকলেই কামনা করেছিল এক বিরাট ব্যক্তিত্বের, এক বিরাট আদর্শের। দুষ্ট-দুর্জন-ভাঁড়-প্রতারিত পৃথিবীকে উদ্ধার করে যুগধর্ম স্থাপনের জন্যই সহচর সহ গৌরলীলার প্রকাশ—

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥ শ্লোক ২১॥ আদি, ২য়

এক এক যুগে এক এক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। প্রত্যেক যুগের সমস্যাকে সম্পূরণ করবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি যুগাবতার। আর এই কলিযুগের যুগধর্ম হল হরি সংকীর্তন। এই কীর্তন প্রকাশই গৌরচন্দ্রের লীলা—

কলিযুগে সর্ব-ধর্ম—'হরি-সঙ্কীর্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥ শ্লোক ২৬॥ আদি, ২য়

অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রাঢ়ের একচাকা গ্রামে বলরাম অবতার নিত্যানন্দের প্রকাশ—

রাঢ়-মাঝে 'একচাকা'-নামে আছে গ্রাম।
যহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্॥ শ্লোক ৩৮॥ আদি, ২য়

কবি নিত্যানন্দের জন্মস্থান, পিতামাতার পরিচয় দিলেন—

হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥ শ্লোক ৩৯-৪০॥ আদি, ২য়

ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের বিস্তৃত ঐতিহাসিক-সামাজিক বর্ণনা দিলেন কবি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে নিমাই শচীগর্ভে জন্মলাভ করেন। তাঁর পরিচয় আমরা এই গ্রন্থটি থেকে পাই। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা-দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥ শ্লোক ৫৭-৬১॥ আদি, ২য়

তামসিক আচারসর্বস্ব জাতিকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দেবার জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব—

সবে মেলি' জগতেরে করে আশীর্বাদ।
'শীঘ্র' কৃষ্ণচন্দ্র, কর সবারে প্রসাদ'॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য' নাম, সর্ব-লোকে ধন্য॥
জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।

কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার'॥
তুলসী মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥ শ্লোক ৭৭-৮৭॥ আদি, ২য়

কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরসে কেউ আসক্ত নয়। সকলেই সকাম অভিলাষে উপধর্মের আশ্রয় করে থাকত। এ শুধু নবদ্বীপের চিত্র নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমস্ত বাঙলাদেশের সমাজের চিত্রই এখানে অঙ্কিত হয়েছে—

নিরবধি নৃত্য, গীত বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
'মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার॥ শ্লোক ৮৮-৯১॥ আদি, ২য়

নিত্যানন্দ আবির্ভাব বর্ণনায় রাঢ়কে কবি শ্রীঅনন্তধাম বলে বর্ণনা করলেন। কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা বলরাম, তার রূপেই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। পতিতজনে নিস্তার নিমিত্তই অবধূত বেশে নিত্যানন্দের পর্যটক লীলা।

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥

মাঘ-মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ-দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে।।
হাড়াইপণ্ডিত-নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ।।
কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম।।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল।।
যে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি' ভ্রমিলা জগতে।। শ্লোক - ১২৮-১৩৪।। আদি, ২য়

আমরা বৃন্দাবনদাস প্রদত্ত একাধিক ভণিতায় নিত্যানন্দের বিচিত্র উল্লেখের কিছু উদাহরণ নেব—

চারি-বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
বৃন্দাবনদাস গানে।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান।।
সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে।।
সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই জানে না রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- চাঁদ-প্রভু জান,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে।। শ্লোক ২১৬, ২২২, ২২৮,
২৩৪।। আদি, ২য়

গৌরচন্দ্রের জন্মলগ্ন ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও নিত্যানন্দের জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দুই-ই সামঞ্জস্য তিথি।

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘীশুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।। শ্লোক ৪৫।। ৩য় অধ্যায়

কবির কাছে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুইয়ের জন্মলগ্নই সমান পবিত্র।

সর্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।। শ্লোক ৪৬।। ৩য় অধ্যায়

শেষনাগ ধৃতলগ্ন নিমাইয়ের লীলা বর্ণনায় অনন্তের উল্লেখ নিত্যানন্দ সাহচর্যের পূর্ব উল্লেখ মাত্র।

চলিলা 'অনন্ত' শুনি' সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যা'ন শ্রীশচীনন্দন।। শ্লোক ৭১।। ৪র্থ অধ্যায়

শুধু কৃষ্ণ-বলরাম নয়। চৈতন্য-নিত্যানন্দের লীলা প্রসঙ্গে ত্রেতাযুগের শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কথাও স্মরণ করলেন কবি এবং এঁরাই যে মুকুন্দ ও অনন্ত সে বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানালেন—

ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানা-মত লীলা করি' বধিল রাবণ।। শ্লোক ১৭০।। ৫ম অধ্যায়

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ—

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্তন ধর্মের নিধান।। শ্লোক ২।। ৮ম অধ্যায়

নিত্যানন্দ সম্পর্কিত ভণিতার উল্লেখ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু।। শ্লোক ১।। ৯ম অধ্যায়

শ্রীঅনন্তস্বরূপ নিত্যানন্দ অবতার চৈতন্য নির্দেশেই রাঢ়ে অবতীর্ণ হলেন—

পূর্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই' আছেন লীলায়।। শ্লোক ৪।। ৯ম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ে কবি আবার নিত্যানন্দের পিতা-মাতার পরিচয় দিলেন—

হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
এক চাকা-নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি।। শ্লোক ৫।। ৯ম অধ্যায়

আদিখণ্ড নবম অধ্যায়ে শিশু নিত্যানন্দের বিবিধ লীলাবিলাসের বর্ণনা দিলেন কবি। নিত্যানন্দের শৈশবলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলার অভিনয়ের কথা বর্ণনা করলেন বৃন্দাবনদাস। সাধারণ শিশুগণের যে ধর্ম ভোজনার্থে বারবার ক্রন্দন চঞ্চলতা, ভয়-ভীতি স্বভাব ও বস্তুর অপচয় প্রভৃতি তা নিত্যানন্দের চরিত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌরাঙ্গের চরিত্রে বিশেষভাবে এই লক্ষণগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে গৌর-নিতাই-এর চরিত্রের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শৈশবলীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।।
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্ধ্বরায়।।
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্ধ্ব করি বোলে।
'জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে।।''
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া।।
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া বান্ধিলা কংসেরে।।
কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করি উঠি' তা'র বুকে।।
কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া।।
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে।।
তাঁ'রে ছাড়ি' শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।
যাহার বালক, তাঁ'রা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে।।
সবে বোলে,—"নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা?''
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ।।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া।।
কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া।।
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে।
বক-অঘ-বৎসাসুর করি' তাহা মারে।।

বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে॥
কোনদিন করে গোবর্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি' কোনদিন করে খেলা॥
কোনদিন করে গোপীর বসন-হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণে কংসের নিদেশে॥
আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদি বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ॥
বিষ্ণু-মায়া মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু-রঙ্গে।
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা-বেশ করি' গন্ধ পরে তা'র স্থানে।
ধনুক গড়িয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জনে॥
কুবলয়, চাণুর মুষ্টিক-মল্ল মারি'।
কংস করি' কাহারে পাড়েন চুলে ধরি'॥
কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশুসঙ্গে।
সর্বলোক দেখি' হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥ শ্লোক ১৪-৪২॥ ৯ম অধ্যায়

নিত্যানন্দ নিমাইয়ের মতো চঞ্চলস্বভাব নন। তিনি সুস্থির, সুবুদ্ধি। তবে গৌরাঙ্গের মতো একইভাবে গৌড়মণ্ডলে সুবুদ্ধিবাহক হয়ে এলেন নিত্যানন্দ—

শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম॥ শ্লোক ৬॥ ৯ম অধ্যায়

গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব লগ্নে নিত্যানন্দ প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন। সেই বজ্রগর্জনে বিশ্ব মূর্ছিত হল। কিন্তু নিত্যানন্দ শিশুলীলার আড়ালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আপন স্বরূপ লুকিয়ে রাখলেন—

যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি' হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে॥

এইমত সর্বলোক নানা-কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেন মতে আপনা' লুকাই' নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥ শ্লোক ৮,৯,১২,১৩॥ ৯ম অধ্যায়

এরপর নিত্যানন্দের শিশুলীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন বৃন্দাবনদাস ভাগবতের কৃষ্ণ-বলরামলীলার অনুসারী—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি' ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি' 'জয় রঘুনাথ' বোলে॥ শ্লোক ৪৫-৪৬॥ ৯ম অধ্যায়

আবার শ্রীরাম-লক্ষ্মণলীলার সঙ্গেও নিত্যানন্দ-চৈতন্যলীলার সাদৃশ্য অন্বেষণ করেছেন বলে নিত্যানন্দের সেতুবন্ধন, লক্ষ্মণরূপ ধারণ, পরশুরাম দর্পভঙ্গ, ইন্দ্রজিৎবধ লীলা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন কবি—

শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি' কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
"আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয়॥
মাল্যবান্-পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ?"
কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাহ সত্বরে॥"
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥
"কে তোরা বানরা সব, বুল' বনে বনে।
আমি—রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল মোর স্থানে॥
তা'রা বোলে,—"আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধুলি॥"
তা' সবারে কোলে করি' আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে॥

বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে॥
কোন শিশু বোলে,—"মুঞি আইলু রাবণ।
শক্তিশেল-হানি এই সম্বর' লক্ষ্মণ!"
এত বলি' পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া॥
মূর্ছিত হইলা লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি' পিতা-মাতা ধাই' আইল সত্বরে।
দেখয়ে,—পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি' সর্বলোক আসি' হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্ত তবে কহিল শিশুগণ।
কেহ বোলে,—"বুঝিলাঙ ভাবের কারণ॥"
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সবে বোলে,—"বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা?"
হাসি' বোলে প্রভু,—'মোর এ সকল লীলা॥"
প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কা'রো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বশে॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥
পিতা-মাতা-গৃহ ছাড়ি' সর্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্বক্ষণ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যাঁ'র এমত বিহার॥ শ্লোক ৪৭-৯৭॥ ৯ম অধ্যায়

নিত্যানন্দ প্রভু এভাবে যখন মূর্চ্ছা গেলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি প্রাণশূন্যভাবে পড়ে আছেন, তা দেখে শিশুগণ ভীষণ ভীত হয়ে শীঘ্র নিত্যানন্দের পিতা-মাতার নিকট গিয়ে তাঁর সব কথা জানালেন। তাঁরাও শীঘ্র সেখানে ছুটে গেলেন। দেখলেন সত্যি সত্যিই যেন প্রাণশূন্য নিত্যানন্দ।

কেউ কেউ বললেন, শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে। কেউ বা বললেন অভিনয় করছে। হনুমান ওষুধ দিলে ভালো হবে। তখন কোনো শিশু হনুমানের ভাবে শীঘ্র ওষুধ নিয়ে এল। এক শিশু বৈদ্য বেশে সেই নিয়ে আসা বৃক্ষলতার রস নিঙড়িয়ে নিত্যানন্দের নাকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞান ফিরে উঠে বসলেন। সেই লীলা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আমরা কখনও এইরূপ শিশুলীলা দেখিনি। সবাই তখন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এরূপ খেলা কোথায় শিখলে? নিত্যানন্দ বললেন—আমার এ সকল লীলা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ লীলা। কেউই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারলেন না। কৃষ্ণলীলা ও শিশুলীলা একার্থক হয়ে উঠল—

এইমত ক্রীড়া করি' নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায়।। শ্লোক ৯৮।। ৯ম অধ্যায়

এরপর বর্ণিত হল নিত্যানন্দের পর্যটন সংবাদ। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করলেন—

হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি' ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।। শ্লোক-১০০।। ৯ম অধ্যায়

এরপর বহু তীর্থ পরিক্রমা করলেন তিনি। বিংশতি বৎসর তীর্থযাত্রা করে চৈতন্যের সঙ্গমে মিললেন নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন নিত্যানন্দ যে যে তীর্থে গিয়েছিলেন—

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ-বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর।।
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বলে গঙ্গা উত্তরবাহিনী।।
গঙ্গা দেখি' বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে, পান করে, আর্তি নাহি যায়।।
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্বজন্ম-স্থান।।
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি' জলকেলি।
গোবর্ধন-পর্বতে বুলেন কুতূহলী।।
শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ।।
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া।।
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি'।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী।।

ভক্তস্থান দেখি' প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ।।
বলরাম কীর্তি দেখি' হস্তিনানগরে।
'ত্রাহি হলধর!' বলি' নমস্কার করে।।
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ।।
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন-দান।।
শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি' হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব।।
কুরুক্ষেত্রে পৃথূদকে বিন্দু-সরোবরে।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবরে।।
ত্রিতকূপ-মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ-চক্রতীর্থেরে চলিলা।।
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী-সরস্বতী।
নৈমিষ্যারণ্যে তবে গেলা মহামতি।।
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি' কান্দিলা বিস্তর।।
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা।।
গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল সম্রণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন।।
যে-যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ।।
তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত-আশ্রম পুণ্যস্থান।।
গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে স্নান করি'।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্বত-চূড়োপরি।।
পরশুরামেরে তথা করি' নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার।।
পম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেম্বা-তীর্থে, বিপাশায় মজ্জন আচরি'।।
কার্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্বত গেলা যথা মহেশ-পার্বতী।।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্বতী।
সেই শ্রীপর্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজন।
অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্যটন॥
পরম-সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি' নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে॥
কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া ব্যেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী গিয়া সরিদ্বরা গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান॥
ঋষভ-পর্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা॥
মলয়-পর্বতে গেলা অগস্ত্য-আলয়ে।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি' মহাশয়ে॥
তা' সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জনে॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু,—বসি' আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই' প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি' গেলা দক্ষিণ-সাগর॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা শিবের মন্দিরে।
কেরলে, ত্রিগর্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী-আর্যা দেখি' নিত্যানন্দ রায়।
নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী ভ্রমেন লীলায়॥
রেবা, মাহিষ্মতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা॥ শ্লোক ১০৬ ১৫১॥ ৯ম অধ্যায়

এরপর সূর্পারক দিয়া প্রভু পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রেম-প্লাবিত হলেন নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র এই দুই প্রেমাবতারের বিরহিত মিলনে চৈতন্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। এই দুইয়ের দেহেই যে চৈতন্যের লীলা বিহার। নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্রপুরী পরস্পর কৃষ্ণতত্ত্ব কথারসে মগ্ন হলেন। নিত্যানন্দকে 'প্রেমতীর্থ' বলে বর্ণনা করলেন মাধবেন্দ্র—

এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্যবর-গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁ'র প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্ছিত হই' আপনা' পাসরি'॥
'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার॥
দোঁহে মূর্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইয়া বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোহন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন॥
বালু গড়ি যায় দুইপ্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন হেন মানে॥

কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞিও।।
নিত্যানন্দ বোলে,—"যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ।।
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন।।"
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে।
উত্তর না স্ফুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে।।
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি।।
ঈশ্বরপুরী-ব্রহ্মানন্দপুরী-আদি যত।
সর্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত।।
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন।।
সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া।।
অন্যোহন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোহন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ।।
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে।।
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।।
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে, কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়।।
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে।।
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে কীর্তন।।
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়' কেহ ক্ষণ নাহি বাসে।।
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ।।
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।

মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥" শ্লোক ১৫৪-১৮৬॥ আদি, ৯ম

নিত্যানন্দ প্রীতি কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র সোপান বলে বর্ণিত হল এবং নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীদের প্রতি কবি তাঁর তীব্র বিরাগ প্রদর্শন করলেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥ শ্লোক ২২৫॥ আদি, ৯ম

মাধবেন্দ্র-নিত্যানন্দ প্রেমকথা আলাপন শেষে নিত্যানন্দ গেলেন সেতুবন্ধে আর মাধবেন্দ্র গেলেন সরযূতে। দুজন দুদিকে গেলেন। এরপর রামেশ্বর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য তীর্থে গেলেন—

হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥
ধনুতীর্থে স্নান করি' গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর॥
মায়াপুরী, অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান॥ শ্লোক ১৯৪-১৯৭॥ আদি, ৯ম

লক্ষণীয় যে নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে যে যে স্থানে পর্যটন করেছিলেন, নিতাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলনের পূর্বেই সেই স্থানে পর্যটন সমাধা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজের সাংগঠনিক প্রয়াসে নিত্যানন্দ যে ক্ষমতার পরিচয় রেখেছিলেন তার অনেকটাই এই ভারত ভূখণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যটনসূত্রে প্রাপ্ত। নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন, মথুরা-বৃন্দাবন দর্শনের শেষে কৃষ্ণ অবতার গৌরদর্শন মানসে অবশেষে নবদ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন নিত্যানন্দ—

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি' মাত্র মূর্ছা হইল শরীরে॥

দেখিলেন চতুর্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ॥
দেখি' মাত্র হইলেন পুলকে মূর্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার?
এইমত নিত্যানন্দ থাকি' নীলাচলে।
দেখি' গঙ্গাসাগর আইলা কুতুহলে॥
তাঁ'র তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে?
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তাঁ'র কৃপা হৈতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি' নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥ শ্লোক ১৯৮-২০৪॥ আদি, ৯ম

ব্রজধামে আগমনে নিত্যানন্দপ্রভু এক অপূর্ব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি॥
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন-ঐশ্বর্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥"
এই মানসিক করি' নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব শক্তি।
তথাপিহ কা'রেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তা'ন সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥ শ্লোক ২০৫-২১২॥ আদি, ৯ম

নিত্যানন্দ কৃপাতেই সকলের প্রেমধন প্রাপ্তি। চৈতন্যের আদিভক্ত এই নিত্যানন্দ—

সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে।।
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়।।
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।। শ্লোক ২১৬-২১৯।। আদি, ৯ম

নিত্যানন্দই বলরাম, নিত্যানন্দই চৈতন্যধাম। সন্ন্যাসী ভক্ত জ্ঞানী নিত্যানন্দকে যারা নিন্দা করবে তাদের জন্য পদাঘাতকেই একমাত্র শাস্তি বলেছেন কবি, নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যানন্দ চরণাশ্রয়েই গৌরপদ প্রাপ্তি—

কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম"।
কেহ বোলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম"।।
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি।।
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে।।
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে।।
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি।
'মন্দ' বোলে, হেন দেখ,—সে কেবল 'স্তুতি'।।
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল।।
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই।।
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তা'ন পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়।। শ্লোক ২২২-২২৯।। আদি, ৯ম

নিত্যানন্দই প্রকৃত প্রেম অধীশ্বর, তাঁর হয়েই সকলের গৌরভজনা। নিত্যানন্দের কাছেই কবি তাই জন্ম জন্ম ভাগবত শিক্ষা পেতে চান—

সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু-গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ,—এই অভিমত।। শ্লোক ২৩১-২৩।। আদি, ৯ম

গৌরচন্দ্রও নিত্যানন্দকেই তাঁর পরম ভক্ত বলে বর্ণনা করেন এবং গৌরকৃপা না হলে এই নিত্যানন্দকেও লাভ করা যায় না। যতদিন গৌরচন্দ্র নিজের বিদ্যাবিলাস ত্যাগ করে কৃষ্ণরসে নিজেকে প্রকাশ না করেছেন, ততদিন নিত্যানন্দ বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। এই পর্যটনগাথা শ্রবণকেও কবি প্রেমধন লাভের একটি উপায় বলে নির্দেশ করলেন—

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁ'রে কেহ নাহি পায়॥
বৃন্দাবন-আদি করি' ভ্রমে' নিত্যানন্দ।
যাবৎ না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্যটন।
যেই ইহা শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন॥ শ্লোক ২৩৫-২৩৭॥ আদি, ৯ম

গৌরচন্দ্র-নিত্যপ্রিয়-নিত্যকলেবর। আদিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ের সমাপ্তিতে কবি আবার স্মরণ করেছেন নিত্যানন্দ অনুষঙ্গ। তিনি অক্ষম দীনহীন, শুধু নিত্যানন্দ কৃপাতেই তাঁর এই চৈতন্যকথা প্রকাশ—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ শ্লোক ৮০॥ আদি, ১ম

নিত্যানন্দ যে ভবতারণ কর্তা তারও স্বীকৃতি আছে—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥ শ্লোক ৭৭॥ আদি, ১ম

নিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করেছেন কবি, কেননা একমাত্র তাঁর কৃপা হলেই শ্রীচৈতন্য লাভ সম্ভব—

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমা'-সংহতি বেড়াঙ॥ শ্লোক ১৫৯-১৬০॥
আদি, সপ্তদশ

মধ্যখণ্ড ঃ— নিত্যানন্দ বান্ধব ধন প্রাণ—

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ॥ শ্লোক ৫॥ মধ্য, ১ম

সমস্ত ভক্তগণ যেখানে গৌরচন্দ্রকে ঘিরে একত্রিত হয়েছেন সেখানে নিত্যানন্দকে না দেখে প্রভু দুঃখিত হলেন—

মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
তাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র॥ শ্লোক ৫৮॥ অধ্যায় ৩য়

গৌরাঙ্গ তখন অবিরাম নিত্যানন্দকে স্মরণ করছেন। এই প্রসঙ্গে আবার রাঢ়ে নিত্যানন্দর জন্মকথা স্মরণ করছেন কবি। তবে আদিখণ্ডেই যে তাঁর বাল্যলীলার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সে কথাও বলেছেন তিনি—

প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম কর্ম্ম কিছু কহি তান॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্॥
'মৌড়েশ্বর' নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁর পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিল আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়॥
তার বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥ শ্লোক ৬০-৬৮॥ মধ্য, ৩য়

নিত্যানন্দের সন্ন্যাস ইচ্ছা প্রকাশ, জনক-জননীর অনিচ্ছা, এক সন্ন্যাসীর আগমন। নিত্যানন্দের পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রভিক্ষাদানে সম্মত হলেন। কবি আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রা বর্ণনা করলেন, পুনরালোচনা করলেন মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু কবি আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ে বলেছেন—

হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ শ্লোক ১০০॥ আদি, নবম

কিন্তু নিত্যানন্দ কার সঙ্গে তীর্থে বের হলেন সেই উল্লেখ নেই। তবে আমরা মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন এই উল্লেখ পাই—

গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাতে দুঃখের কারণ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে', ততোধিক পিতা॥

তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞিও।
প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি' আছে পিতা-সনে॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণ-কথা-কথন প্রসঙ্গে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা ঊষাকালে।
নিত্যানন্দ পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে॥
ন্যাসী বলে, "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার"।
নিত্যানন্দ-পিতা বলে, "যে ইচ্ছা তোমার"॥
ন্যাসী বলে, "করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি' দেহ' সংহতি আমার॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে॥"
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।

না দিলেও 'সর্বনাশ হয়' হেন বাসি।।
ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।।
রামচন্দ্র পুত্র-দশরথের জীবন।
পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।।
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে।।
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ-ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর মোরে।।"
দৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি?
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব কহিলেন সব বিবরণে।।
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা।। শ্লোক ৬৯-৯৩।। মধ্য, ৩য়

সন্ন্যাসীকে পুত্রদানে ওঝা ও ওঝাপত্নীর কিরূপ অবস্থা হয়েছিল সেই দৃশ্য বর্ণনা করলেন কবি বৃন্দাবনদাস। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় যেন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন, কী নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের প্রাণস্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য ধারণ পূর্বক বিচার করলেন, পূর্বকালে মহারাজ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম-লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন সেই রূপ আজ এক সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করবেন, নতুবা তাঁদের পরম অধর্ম হবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন। অতীব অনুনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমাদের একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম। আপনি সর্বতোভাবে এঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।" সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে, নবম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ কথাটি বিস্তৃতভাবে আছে—

আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা।।
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।।
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্ছিত।।

সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্ জনে?
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইল বিহ্বল।
লোকে বলে,—"হাড়ো ওঝা হইল পাগল॥"
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যা'র হেন অনুরাগ?
বিষ্ণুবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব॥ শ্লোক ৯৪-১০০॥ মধ্য, ৩য়

নিত্যানন্দের পিতা রামবিহনে দশরথের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে পুত্রবিহনে বিষণ্ণ হলেন। সন্ন্যাসীকে পুত্র দান করলেন নিত্যানন্দের পিতা—

স্বামিহীন দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে॥
যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥ শ্লোক ১০১-১০৬॥ মধ্য, ৩য়

পিতার বিলাপ, মাতার ক্রন্দন সমস্ত পিছুটানকে উপেক্ষা করে নিত্যানন্দ চললেন তীর্থ পর্যটনে—

হেনমতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ শ্লোক ১০৭॥ মধ্য, ৩য়

এরপর নিত্যানন্দ চললেন তীর্থ পর্যটনে। তীর্থ পর্যটনের বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। আদি নবম অধ্যায়ে তীর্থযাত্রা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু আমরা আর তার পুনরুল্লেখ করবো না—

গয়া, কাশী প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারবতী।
*** *** ***
এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায়॥ শ্লোক ১০৮-১১৪॥ মধ্য, ৩য়

কৃষ্ণরসই হল বৃন্দাবনবাসী নিত্যানন্দের একমাত্র আহার। এই সময় নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রকাশ সংবাদ শুনে নিত্যানন্দ দ্রুত নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে এলেন। নিত্যানন্দের মহা অবধূতমূলক প্রকাণ্ড শরীর যেন মহাতেজস্বী সূর্যের মতো প্রকাশিত হল—

নিরবধি বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে।।

*** *** ***

নিত্যানন্দ ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কারে।। শ্লোক ১১৬-১২৬।। মধ্য, ৩য়

তিনি মহামত্ত বলরাম অবতার। তাঁর আজানুলম্বিত রূপের অপরূপ বর্ণনা দিলেন কবি—

মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার।।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর।।
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি।।
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ।। শ্লোক ১২৭-১৩০।। মধ্য, ৩য়

এই নিত্যানন্দ প্রভুই চৈতন্যের দণ্ড ভেঙেছিলেন। প্রচণ্ড তেজস্বিতায় পণ্ডিত-মূর্খ তার নামে ভবসাগর পার হয়ে যায়। নন্দনাচার্য ভিক্ষাবলে ঘরে রাখলেন নিত্যানন্দকে। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের আগমন বার্তা শুনে পরম প্রীত হলেন—

সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড।।
বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁ'র।।
পাইয়া নন্দনাচার্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তা'রে মিলে প্রেমধন।।
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর।। শ্লোক ১৩৩-১৩৭।। মধ্য, ৩য়

প্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্ন দেখলেন। এক তালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহের দ্বারে উপনীত হল, সে রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ। তাঁর স্কন্ধে হল ও মুষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত, তাঁর বাঁ-হাতে বেত্র নির্মিত কমণ্ডলু। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করছেন—এই বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? এই বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের?

আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—আমি তোমার ভাই। আগামীকাল পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচয় হবে। তাঁব এই কথা শুনে আমার বড়ই আনন্দ হল এবং স্বপ্ন ভেঙে গেল। এই কথা বলতেই মহাপ্রভু যেন বিভোর হয়ে গেলেন—

"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে।।
তালধ্বজ এক রথ-সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার।।
তাঁর মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির।।
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে।।
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধরভাব হেন বুঝি যে চরিত্র।।
'এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয়
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দাণ্ড।।
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি, 'কোন্ মহাজন তুমি?'
হাসিয়া আমারে বলে,—'এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়'।। শ্লোক ১৪১-১৪৯।। মধ্য, ৩য়

উন্মত্ত নিত্যানন্দের প্রেমমদিরা তিনি যাকে দেন সেই তা পায়। গৌরসুন্দর রহস্যময় আর্যা তর্জায় নিত্যানন্দের স্বরূপ সন্ধান করতে চাইলেন। হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি নিত্যানন্দ-সন্ধানে বহির্গত হলেন। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের গূঢ় রহস্য জেনে কৌতুক হাস্য করলেন—

"মদ আন, মদ আন" বলি' প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে।।
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে,—"শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি।।
তুমি যা'রে বিলাও, সেই সে তাহা পায়!"
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি' চায়।।
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ।।'
আর্যা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ।।

ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র॥
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥
পূর্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা' সবার স্থানে।
'কোন মহাজন-সনে হৈব দরশনে॥'
চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত॥"
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব-নবদ্বীপ চাহি' বুলয়ে হরিষে॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ॥" শ্লোক ১৫২-১৬২॥ মধ্য, ৩য়

নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করালেই তবে তা দর্শন করা যায়। যদি কেউ নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তবে তার পক্ষে বিষ্ণুভক্তি অসম্ভব। তবু এক কৌতুককর কারণেই গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ একই শহরে থেকে একে অন্যকে খুঁজে বেড়ান—

এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যা'রে, সে' দেখিতে পারে॥
না বুঝি' যে নিন্দে' তা'ন চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ॥
সর্বথা শ্রীবাস আদি তাঁ'র তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥"
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি' সবে করিলা গমন॥
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্যের ঘর।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥ শ্লোক ১৬৯-১৭৬ মধ্য, ৩য়

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের মিলন হল নন্দন আচার্যের গৃহে। গৌরাঙ্গ সমস্ত গণ সহ নমস্কার জানালেন। নিত্যানন্দ যে ঈশ্বরকে এতদিন খুঁজছিলেন সেই ঈশ্বর আজ তাঁর

সম্মুখে দেখে চিনতে পারলেন। এই তো আমার সেই প্রাণের ঈশ্বর। কোটি সূর্য সম নিত্যানন্দকে প্রাণের ঈশ্বর বলে চিনেছিলেন বিশ্বম্ভর এবং দুজনই দুজনকে চিনলেন—

বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন—যেন কোটিসূর্যসম॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া॥ শ্লোক ১৭৭-১৮০॥ মধ্য, ৩য়

কৃষ্ণরূপ শ্লোক পাঠ করে উভয়ে ভাবাবিষ্ট হলেন। গৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করে আত্মহারা নিত্যানন্দ তাঁকে সর্বঅঙ্গ দ্বারা লেহন করতে চাইলেন। গৌরচন্দ্রকে কবি স্তুতিও করেছেন—

জয় জয় জগৎজীবন গৌরচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তব পদদ্বন্দ্ব॥
নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই' বিশ্বম্ভর রূপ চায়॥
রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত॥ শ্লোক ১-৪॥ মধ্য, ৪র্থ

মধ্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে নিতাই-গৌর-এর মিলনের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ মিলন যেন এক হয়ে গেছে কবির কল্পনায়—'ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্য প্রেমজলে'। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের মিলন দেখে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আত্মহারা হলেন। বিশ্বম্ভরও নিত্যানন্দকে পূর্ণ শক্তি বলে বর্ণনা করলেন এবং শুরু হল গৌরাঙ্গের নিত্যানন্দ স্তুতি। নিত্যানন্দ তাঁর পর্যটন সংবাদ বর্ণনা করলেন, কিন্তু কোনো তীর্থেই তিনি কৃষ্ণের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে গৌড় দেশে অন্বেষণে এসেছেন। পতিতপাবন নারায়ণ নবদ্বীপে জন্ম নিয়েছেন শুনেই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসেছেন। দুই মহাপুরুষের সেই মিলনদৃশ্য অপূর্ব—

নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা-গদাধর।
নিত্যানন্দ-জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি'।
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে॥
বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা' দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন॥
তিলার্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তা'র মন্দ নয়॥
বুঝিলাম-কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা'-হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন॥"
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে নাহিক প্রকাশ॥
প্রভু বলে, —'জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়!
কোন্ দিক হইতে শুভ করিলে বিজয়?"
শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম।
করযোড় করি' বলে হই' বড় নম্র॥

প্রভু করি স্তুতি, শুনি' লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বলে, —"তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক-ঠাঞি॥
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব, কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত?
তা'রা বলে,—'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি' গিয়াছেন কতেক দিবসে॥'
নদীয়ায় শুনি' বড় হরি-সঙ্কীর্তন।
কেহ বলে,—'এথায় জন্মিলা নারায়ণ॥'
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায়॥" শ্লোক ৩০-৫৪॥ মধ্য, ৪থ

গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের এই মিলনকে শ্রীবাস হর-হরির পরস্পরের পূজা বলে বর্ণনা করলেন। গদাধর বললেন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মিলন। সমস্ত ভক্তগণ পুলকিত চিত্তে এই মিলনকে 'দুই যুগের মিলন' অথবা 'কৃষ্ণ-রামের মিলন' বলে বর্ণনা করেছেন। এই নিত্যানন্দের নানামুখি কৃষ্ণসেবার বিবরণ দিলেন কবি—

কেহ বলে,—'দুইজন যেন দুই কাম।"
কেহ বলে,—"দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম॥"
কেহ বলে,—"আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি॥'
কেহ বলে,—"দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহপরিপূর্ণ॥"
কেহ বলে,—"দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয়॥"
এই মত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥

নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যা'রে দেন অধিকার, সেই জন পায়।।
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব।। শ্লোক ৬০-৬৮।। মধ্য, ৪র্থ

রঘুনাথ ও যদুনাথ যেমন স্বরূপত একই, নিত্যানন্দ-বলরাম সেইরূপ এক। বৃন্দাবনদাস ঠিক সেইভাবে নিত্যানন্দকে স্তুতি করেছেন—

'রঘুনাথ', 'যদুনাথ'—যেন নাম-ভেদ।
এইমত ভেদ—'নিত্যানন্দ', 'বলদেব'।।
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।। শ্লোক ৭২-৭৩।। মধ্য, ৪র্থ

নিত্যানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ-কথারসে মগ্ন ভক্তদের হৃদয়ে অপূর্ব উল্লাস জাগ্রত হল—

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে।।
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার।।
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি'।
বহয়ে আনন্দধারা সবাকার আঁখি।। শ্লোক ৪-৬।। মধ্য, ৫ম

বিশ্বম্ভর ব্যাসপূজার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নিত্যানন্দের কাছে। নিত্যানন্দের নির্দেশে শ্রীবাস গৃহে ব্যাসপূজা হল। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ-বলরামের মতো বেষ্টন করে রইলেন ভক্তবৃন্দ—

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি?
কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল, যা'রে লয় মন।।"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি' আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।।
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর।।
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর।।"

পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব—ঘরেই আমার॥
বস্ত্র, মুদগ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন শ্রীপাদ গোঁসাই।
শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥"
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই' করিলা গমনে॥
সর্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি' যেন গোকুল কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥ শ্লোক ৭-২০॥ মধ্য ৫ম অ

চৈতন্য-নিতাইয়ের কীর্তনানন্দ প্রেমবিলাস চিরদিবসের। দোঁহে দোঁহা প্রেমে আত্মহারা বিগলিত। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের স্বরূপ বোঝাতে বলরাম ভাবে ভাবিত হয়ে হল-মুষল প্রার্থনা করলেন—

ব্যাস-পূজা অধিবাস উল্লাস কীর্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেড়ি' গায় ভক্তগণ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি' নাচে এক ঠাঞি॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জন।
কেহ মূর্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে-আপন-লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায়॥

যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তা'রে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্তনে বিহরে॥
'বোল বোল' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব-কলেবর॥
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই' অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন যানে বৈষ্ণব সকলে॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
'মদ আন, মদ আন' বলি' ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ' মোরে হল-মুষল সত্বর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি' লৈলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে।
কেহ না দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে॥
যা'রে কৃপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব-জন-স্থানে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
'বারুণী' 'বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হঞা॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া॥ শ্লোক ২৩-৪৬॥ মধ্য, ৫ম

বলরাম স্তুতিতে নিত্যানন্দের আবেশ হওয়ায় তিনি তাঁর নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেললেন ও কমণ্ডলুটি দূরে ফেললেন। পরের দিন সকালে অন্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীবাস

অঙ্গনে এলেন এবং নিত্যানন্দের মহাভাবাবেশের কথা শুনলেন। তখন সেই ভাঙা দণ্ডটি ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসর্জন করলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের কাছে জানালেন নিত্যানন্দ হলেন মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন। তাঁর পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কথার বিস্তৃত বিবরণ দিলেন বৃন্দাবনদাস---

চতুর্দিকে রাম-স্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাড়া, 'নাড়া', 'নাড়া', প্রভু বলে অনুক্ষণ।।
সঘনে ঢুলায় শির 'নাড়া', 'নাড়া' বলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে।।
সবে বলিলেন,—"প্রভু, 'নাড়া' বলে কা'রে?"
প্রভু বলে, —'আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে।।
'অদ্বৈত আচার্য' বলি' কথা কহ যা'র।
সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার।।
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা।।
সঙ্কীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার।।
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যা'র আছে অপরাধে।।
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ।।"
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্বভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।
'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ' প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে,—'কিছু উপাধিক নয়"।।
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্বক্ষণ"।।
হাসে সর্বভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়।।
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ-হৈল সর্ব-কলেবর।।
কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।

কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি-মূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ-মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে॥
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজদণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥ শ্লোক ৪৮-৬৭॥ মধ্য, ৫ম

নিত্যানন্দের ভাঙা দণ্ড হাতে তুলে নিলেন প্রভু। অতঃপর তাঁর নদীতে স্নান, কুম্ভীর প্রসঙ্গ, ব্যাস পূজা, বিশ্বম্ভরের ষড়ভুজ মূর্তি দর্শনে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছালীলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ—

কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু-দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডুল দেখিয়া বিস্মিত॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন,—"যাও ঠাকুরের স্থানে"॥
রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈঞা॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥
চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জন॥
কুম্ভীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে যায়।
গদাধর-শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি' ঝাট করহ সত্বর॥"

শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্তন॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব-কার্য॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন॥
সর্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য যে বিধিবোধিত॥
দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর'॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব অভীষ্ট পাইবা॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ—করে, 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয়॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি' পুনঃ চারি দিকে চায়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥"
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি' দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর॥ শ্লোক ৬৮-৯১॥ মধ্য, ৫ম

এসবের মধ্য দিয়ে এই দুই মহাপ্রেমিকের ভাবাশ্রিত দৈবী লীলার প্রকাশ ঘটেছে। নিত্যানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ, তাঁকে তেজোময় বলেও বিশ্বম্ভরের বন্দনা ও নিত্যানন্দের স্বরূপ বন্দনা করলেন কবি—

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়ভুজ দেখি' মূর্ছা পাইলা নিতাই।

পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই' ঘন বিশাল গর্জন॥
মূর্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ, স্থির কর চিত।
সংকীর্তন শুনহ তোমার সমীহিত॥
যে কীর্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর?
তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনা তুমি দিলে কা'রো ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি' উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ॥
তিলার্ধেক তোমার যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"
পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ দর্শনে॥
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ॥
ছয়ভুজদৃষ্টি তা'নে কোন্ অদ্‌ভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা॥
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদ্‌ভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্বথা।
তিলার্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্য মন-প্রাণ-ধন॥
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥

যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥
সৃষ্টি-স্থিতি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখনো অনন্তরূপ 'সত্য' বেদে কয়॥
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ॥ শ্লোক ৯৩-১১৩॥ মধ্য, ৫ম

বলরাম দাস্যভাবাশ্রিত, শ্রীলক্ষ্মণও তাই। নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গে দাস্যভাবাশ্রিত ভক্তান্ত রূপ নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের সবিস্তার বর্ণনা করেছেন—

যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত, দাস্য পাইয়া॥
অন্ন-পানি-নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥
'স্বামী' করি' শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ-প্রতি।
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি॥
সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয়॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি॥
সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্বথা তাহার॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁ'র স্বভাব চরণসেবা-খেলা॥
সর্বশক্তিসমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাবধর্ম, সেবা সে তাহান॥
অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে॥
ঈশ্বরের স্বভাব—কেবল ভক্তবশ।
বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ॥

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাবচরিত॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ প্রমাণে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য-মন।
"চৈতন্য—ঈশ্বর' মুঞি তাঁ'র একজন॥"
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁ'র, সেহ মোর ঈশ্বর সর্বথা॥ শ্লোক ১১৪-১২৯॥ মধ্য, ৫ম

এঁরা উভয়ে উভয়ের লীলা দর্শনে বাহ্য ভাবাবেগে মূর্ছিত হলেও স্বরূপত নিত্যানন্দ গৌরসুন্দর একই প্রকাশ।

ভক্তিযোগ ছাড়া নিত্যানন্দ স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়—

চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে॥
আপনে করিয়াছেন ষড়্‌ভুজ দর্শন।
তা'র প্রীতে কহি তা'ন এ সব কথন॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়॥
তথাপিহ অবতারে অনুরূপ-খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, কে বুঝিবে লীলা॥
সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে॥
যে কর্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় 'বেদ'।
তাহি গায় সর্ববেদে ছাড়ি' সর্বভেদ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন ন যায়।
জানে জন-কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥ শ্লোক ১৩০-১৩৬॥ মধ্য, ৫ম

যদি কেউ গৌরসুন্দরকে নিত্যানন্দ বিরহিত অবস্থায় ভজনা করে তবে তার গৌর ভজনা সার্থক হবে না—

শ্রদ্ধা করি' মূর্তি পূজে ভক্ত না আদরে'।
মুর্খ, নীচ, পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার॥

বলরাম-শিব-প্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥ শ্লোক ১৪৬-১৪৮॥ মধ্য, ৫ম

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব্যস্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেমে মূর্ছা গেলেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন—শ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্তন প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, তা সিদ্ধ হল। তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভাণ্ডারী, তা হতে তুমি লোককে কিছু দাও তবেই তারা প্রেমলাভ করতে পারে। মহামত্ত দু'ভাইয়ের কীর্তন বিলাস 'বন্ধ বিমোচন' রচনা বলে কীর্তিত হল—

এই নিত্যানন্দের ষড়ভুজ-দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে, তা'র বন্ধবিমোচন॥
বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়নে॥
সবা-প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কা'রো বাহ্য নাই॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
সবেই চরণ ধরে, যে-যাহার পায়॥ শ্লোক ১৫১-১৫৭॥ মধ্য, ৫ম

শচীমাতা নিত্যানন্দকে তাঁর আরও একটি পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। ব্যাস পূজা উপলক্ষ্যে এইভাবে নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করে ভক্তিযোগ প্রকাশ করলেন বিশ্বম্ভর—

চৈতন্য-প্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর-নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
'দুই জন মোর পুত্র' হেন বাসে মনে॥
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র করি' কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাহিলেই হয় হিত॥

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজারঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্বগণ লৈয়া॥ শ্লোক ১৫৮-১৬৪॥ মধ্য, ৫ম

এরপর নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌরচন্দ্রের ভক্তগণ পরিবৃত কীর্তনবিলাস শুরু হল—

জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
হেনমতে নিতানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্তন-রঙ্গ॥ শ্লোক ৬-৭॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

অদ্বৈতকে নিত্যানন্দের আগমন বার্তা জানাতে রামাইকে প্রেরণ করলেন মহাপ্রভু—

নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা, তাঁরে কহিও কথন॥ শ্লোক ১৪॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

যার জন্য এতদিনের প্রতীক্ষা, ক্রন্দন, ভক্তিযোগধারী সেই নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন শুনে আবেগে ক্রন্দন করলেন অদ্বৈত। অদ্বৈতগৃহিণীও ভক্তি ও আবেগের কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এমনকি তাঁর আগমনে অদ্বৈততনয় অচ্যুতানন্দ যে অত্যন্ত বালক সে পর্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল—

পুনঃ বলে,—"কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত?"
বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত॥
"যাঁ'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন॥
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন॥
ষড়ঙ্গ-পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।

প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন।।
তুমি সে জানহ তাঁ'রে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু।।"
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা।।
কান্দিয়া হইলা মূর্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত।।
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
'আনিলুঁ',.'আনিলুঁ' বলে 'প্রভু আপনার'।।
"মোর লাগি' প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।'
এত বলি' কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া।।
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি' কান্দে আনন্দিতা।।
অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম।।
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে।
অনুচর সব বেড়ি' কাঁদে চারি ভিতে।। শ্লোক ২৮-৪২।। মধ্য, ৬ষ্ঠ

সগৃহিণী অদ্বৈত চললেন নিত্যানন্দের অভ্যর্থনায়। নিত্যানন্দ ছত্র ধরলেন মহাপ্রভুর মস্তকে। এই বর্ণনা অপূর্বভাবে বৃন্দাবনদাস আলোচনা করেছেন—

হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভযাত্রা-উদযোগ করিলা ততক্ষণে।।
পত্নীরে বলিলা—"ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান।।"
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে।।
ক্ষীর, দধি, সর, ননী, কর্পূর, তাম্বুল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল।।
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহা প্রভু।
রামা'য়ে নিষেধে, 'ইহা না কহিব কভু।।
....
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।

অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥
আচার্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া॥
হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥
'নাড়া আইসে, নাড়া আইসে'—বলে বারে বারে।
"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে॥"
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥ শ্লোক ৫১-৬৪॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য মূর্তির প্রকাশ বর্ণনা করলেন—

জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর॥
প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'।
তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি॥
শ্রীবৎস, কৌস্তভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে॥
কোটি মহাসূর্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥ শ্লোক ৭৫-৮১॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দকে দেখে অদ্বৈত তাঁকে চিরকালের মতো বেঁধে রাখতে চাইলেন, নিত্যানন্দ কৌতুক হাস্য করলেন। নিত্যানন্দের নানা লীলায় তাঁর প্রতি বিশ্বম্ভরের প্রীতি জন্মাতে থাকে—

ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকটি করি' হাসে॥
হাসি' বলে,—"ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া॥
অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্তি দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায়॥
পূর্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে॥
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান॥ শ্লোক ১৪৬-১৫১॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও অভেদ তত্ত্ব প্রকাশিত হল। এঁরা অনন্ত-শঙ্করের মতো অভিন্ন--

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ করি' জ্ঞান।
এই অবতারে জনে যত ভাগ্যবান্॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার॥
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥ শ্লোক ১৫২-১৫৪॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

যদি কেউ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের নিন্দা করে তবে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়--

যে না বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে।
একে বন্দে আরে নিন্দে, সেই জন মরে॥ শ্লোক ১৫৫॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে কবি বলেছেন—

গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কা'রো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥ শ্লোক ১৭৩॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রেমরঙ্গ ও কীর্তন বিলাসে মুখর। শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দের বাল্যভাব অনুসৃত। মালিনীর সঙ্গে তাঁর পুত্র সম্পর্ক—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।।
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়।। শ্লোক ৫-৮।। মধ্য, ৭ম

মালিনী ও নিত্যানন্দের বাৎসল্য সম্পর্কের বর্ণনা। শ্রীবাসের কাছে বিশ্বম্ভর পরীক্ষার্থেই জানতে চাইলেন যে তিনি কেন এই বিচিত্র অবধূতকে গৃহে স্থান দিয়েছেন, যার জাতি-কুল-গোত্র কিছুই জানা নেই এবং তিনি এও বললেন যে এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে ত্যাগ করাই ভালো। শ্রীবাস মহাপ্রভুর ছলনা বুঝে বললেন নিত্যানন্দই মহাপ্রভুর দেহস্বরূপ। আর অদ্ভুত চরিত্র। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী বিলাস করে, যদি তাঁর জাতি-কুল নাশ করে তবুও তিনি তাঁকে গৃহে রাখবেনই—-

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।।
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়।।
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুত্র মাতা।।
একদিন প্রভু শ্রীবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত।।
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর?
কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি,—বলিলাম আমি।।
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এ অবধূতেরে ঘুচাও।।"
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত।।
দিনেক যে তোমা ভজে' সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ—-তোর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ।।
মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে।।
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা।।" শ্লোক ৬-১৬।। মধ্য, ৮ম

আসলে এই সবই নিত্যানন্দ সম্পর্কে তৎকালোচিত সমালোচনার কবিকৃত যোগ্য

উত্তর। শ্রীবাস নিত্যানন্দ প্রীতির এই অসামান্য পরিচয় দিয়ে মহাপ্রভুর কাছে অচঞ্চলা লক্ষ্মীবর লাভ করলেন আর বললেন তোমার গৃহে কোনদিনও অন্ন-বস্ত্রের অভাব হবে না। তোমার গৃহের সকলেই আমার প্রিয় হবে—

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তা'র বুকে॥
প্রভু বলে'---"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস?
নিত্যানন্দ-প্রতি তোর এতই বিশ্বাস?
'মোর গোপ্য নিত্যানন্দ', জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা' স্থানে।
সর্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥" শ্লোক ১৭-২২॥ মধ্য, ৮ম

এরপর কবি বর্ণনা করলেন নদীয়া নগরে নিত্যানন্দের বাল্যভাবের লীলা। শচীমাতা নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভরকে বৎসর পাঁচেকের কৃষ্ণ-বলরাম স্বরূপ স্বপ্নে দর্শন করলেন—

নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া-নগর॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই' যায় সন্তোষ অপার॥
বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন॥
একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে॥
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ-এই দুই জন॥
বৎসর-পাঁচেক দুই ছাওয়াল হইয়া।

মারামারি করি' দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম-কৃষ্ণ লই' দোঁহে হইলা বাহিরে॥ শ্লোক-২৩-৩১॥ মধ্য, ৮ম

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রকে ভজনা করে কৃষ্ণকেও অস্বীকার করেন। এরপর বিশ্বম্ভরের নির্দেশে শচীমাতা নিত্যানন্দকে ভোজন করালেন। এখানে কবি কৌতুকলীলার যথেষ্ট সুযোগ রেখেছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বল্প উল্লেখে—

নিত্যানন্দ বলে—"তোর কৃষ্ণরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর॥"
এইমতে কলহ করয়ে চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি' সব করয়ে ভোজন॥
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি' লই' খায়।
কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়॥
'জননী' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
"অন্ন' দেহ' মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে॥"
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি, তোমারে কহিলুঁ॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কা'রো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধা-আধি না থাকে, না কহোঁ কা'রে লাজে॥
তোমার বধুরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে॥ শ্লোক ৪০-৫০॥ মধ্য, ৮ম

কৌশল্যার ঘরে রাম-লক্ষ্মণের মতো দুই ভাই ভোজনে বসলে শচীমাতা বাৎসল্য রসাশ্রিত ব্রজের কানাই-বলাই মূর্তি দর্শন করে মূর্ছিত হলেন—

বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুইজন॥

পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে॥
আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচেক শিশু দেখে পরতেকে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মূষল।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥ শ্লোক ৬০-৬৭॥ মধ্য, ৮ম

নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ গৌরচন্দ্র মুহূর্তমাত্র সহ্য করতে পারেন না—

নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ শ্লোক ৮৫॥ মধ্য, ৮ম

শ্রীবাসগৃহে বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের কীর্তনবিলাস। গৌরাঙ্গ বললেন—নিত্যানন্দ আমার প্রকাশবিগ্রহ স্বরূপ, আমা হতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি এই নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে প্রেমভক্তি প্রচার করব। এই বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে গন্ধ লেপন ও কণ্ঠে মালা পরিয়ে স্তুতি করতে লাগলেন—

সর্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস॥
শ্রীবাস মন্দিরে প্রতিনিশায় কীর্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত॥

সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ শ্লোক ১১০-১১৮॥ মধ্য, ৮ম

*** *** ***

ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বম্ভর॥ শ্লোক ১৭৬॥ মধ্য, ৮ম

পাষণ্ডীরা শ্রীবাসের ঘরে অবধূত নিত্যানন্দের এই কীর্তনবিলাস দেখে নানা কথা বলতে থাকেন—

কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ॥'
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥
কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য-ধর্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম॥"
কেহ বলে,—"এ গুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল-কীর্তি যায়॥
ও নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল-লোক দেখে।
সেই এই মত হয়, দেখ পরতেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তা'র হেন হইল চিত॥" শ্লোক ২৪৯-২৫৪॥ মধ্য, ৮ম

বিশ্বম্ভরের অভিষেককালে তিনি খট্টায় উঠলেন। তাঁর ভারে খট্টা টলমল করে উঠলে নিত্যানন্দের স্পর্শে সেই খট্টায় অনন্তের অধিষ্ঠান হয়—

শালগ্রামশিলা সব নিজ-কোলে করি'।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥

*** *** ***

অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥ শ্লোক ২৮২-২৮৪॥ মধ্য, ৮ম

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে নিয়ে শ্রীবাসের ঘরে কীর্তনবিলাসের মধ্য দিয়ে নানা ঐশ্বর্য ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥

আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর রায়।
পরম ঐশ্বর্য করি' চতুর্দিগে চায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দিগে করেন কীর্তন॥ শ্লোক ১২-১৫॥ মধ্য, ৯ম

ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের মাথায় ছত্র ধরণ করলেন। মুরারি গুপ্তকে রামরূপ দেখালেন বিশ্বম্ভর—

ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দূর্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্ধর॥
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে, দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্ছা পাইল বৈদ্যবর॥
মূর্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের পাদে গুপ্ত মুরারি রহিলা॥ শ্লোক ৬-১১॥ মধ্য, ১০ম

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাথায় ছত্র ধরেছেন—

বসি' আছে মহজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥ শ্লোক ১১৩॥ মধ্য, ১০ম

নিত্যানন্দ সকল ভক্তকে গৌরচন্দ্রকেই নিজ প্রভু বলে মেনে নিতে উপদেশ দিলেন—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যা'রে কৃপা করে।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'॥" শ্লোক ১৫৮-১৫৯॥ মধ্য,১০ম

বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী কর্তৃক মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ। চৈতন্যদাসত্ব নিত্যানন্দের একমাত্র চরিত্রমহিমা। নিত্যানন্দ নিজেকে চৈতন্যদাস বলে বর্ণনা করলেন। কবিও বললেন বলরাম তথা নিত্যানন্দের প্রীতিতে এই কাব্য রচনা করেছেন—

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥

পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁ'রে করে আশীর্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়।—"নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকাস্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥"
যা'রে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥
এ সব বচনে যা'র নাহিক প্রতীত।
সত্য অধঃপাত তা'র জানিহ নিশ্চিত॥
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥
চৈতন্যের প্রিয় অতি—ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তা'ন চারি বেদে গাই॥
চৈতন্যের ভক্ত' হেন নাহি যা'র নাম।
যদি সেব্য বস্তু,—তবু তৃণের সমান॥
নিত্যানন্দ কহে,—'মুঞি চৈতন্যের দাস।'
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ্ নাহি কতি॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
বলরামপ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
করে বলরাম প্রভু জগতের হিত॥
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥
নিত্যানন্দকৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি॥ শ্লোক ২৯০-৩০৮॥ মধ্য, ১০ম

নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তি লাভ করেই সকল বৈষ্ণব নিত্যানন্দের প্রিয় হয়ে ওঠে। নিত্যানন্দের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে তিনি চৈতন্যভক্তি থেকেই স্খলিত হন। গৌরচন্দ্রের জীবনস্বরূপ নিত্যানন্দকে কবি তাঁর প্রাণধন বলে বর্ণনা করছেন—

সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়।
সবে নিত্যানন্দস্থানে ভক্তি-পদ পায়।।

*** *** ***

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন।। শ্লোক ৩০৯-৩১৯।। মধ্য, ১০ম

শ্রীবাসের ঘরে বাসকালে নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে পিতা জ্ঞানে সেবা করেন। বাল্যভাবে মালিনীকে মা ডাকলেন। নিত্যানন্দের প্রভাবে মালিনীর বক্ষে দুগ্ধ পূরিত হয়। দিগম্বর বেশে বালক স্বভাব নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে অন্নবৃষ্টি করেন। বিশ্বম্ভর অবশ্য নিত্যানন্দকে সংযত করে বলেন যে, তিনি যেন শ্রীবাসের গৃহে খুব চঞ্চলতা না করেন। এখানে আমরা নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরের কৌতুক সখ্যলাভের পরিচয় পাই—

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি' শ্রীবাসের করয়ে পীরিতি।।
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে।।
কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয়।।
চৈতন্যের নিবারণে কা'রে নাহি কহে।
নিরবধি বাল্যভাব মালিনী দেখয়ে।।
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব।।
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙরে।।
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কা'রে না বাসিবা।।"
বিশ্বম্ভর বলে,—"আমি তোমা ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দোষ কহ দেখি শুনি।।"
হাসি' বলে গৌরচন্দ্র,—"কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার।।"
নিত্যানন্দ বলে,—'ইহা পাগলে যে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে?

আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও?"
প্রভু বলে,—"তোমার অপকীর্ত্যে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥"
হাসি' বল নিত্যানন্দ,—"বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্বকাল॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি' প্রভু চাহি' হাসে খল খল॥ শ্লোক ৭-২০॥ মধ্য, একাদশ

নিত্যানন্দের অদ্ভুত দিগম্বরলীলাকে বিশ্বম্ভর অসংযত বলে বর্ণনা করলেন। নিত্যানন্দ রূপ মত্তসিংহ চৈতন্যের নির্দেশে স্থিত হল—

আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্ কর্ম করে।
দিগম্বর হই' বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গদাধর, শ্রীনিবাস, আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সব দেখে দিগ্‌বাস॥
ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—"এ কি কর কর্ম?
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম॥
এখনি বলিলা তুমি—'আমি কি পাগল?'
এইক্ষণে নিজ-বাক্য ঘুচিল সকল॥"
য'ার বাহ্য নাহি, তা'র বচনে কি লাজ?
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশমাত্র মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥ শ্লোক ২১-২৮॥ মধ্য, একাদশ

এর পর কাক কৃষ্ণের ঘৃতপাত্র নিয়ে গেলে শ্রীবাস পত্নী মালিনীর ক্রন্দন এবং নিত্যানন্দ কাককে দিয়ে সেই ঘৃতপাত্র আবার ফিরিয়ে আনলেন। নিত্যানন্দের আজ্ঞা যম পর্যন্ত অবহেলা করতে পারে না, কাক তো সেখানে অতি তুচ্ছ প্রাণী—

একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥

বাটী থুই' সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য-বদন তাহার॥
মহাতীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হইল অপহার॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"কান্দ কি কারণ?
কোন্ দুঃখ বল?—সব করিব খণ্ডন॥"
মালিনী বলয়ে,—"শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই' গেল কোন্ ঠাঞি॥"
নিত্যানন্দ বলে,—"মাতা, চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর॥"
কাক-প্রতি হাসি' প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন॥"
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তা'র আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি?
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায়॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি' পুনঃ সেখানে আইল॥
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দপ্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্ছিত হৈলা অপূর্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল ঘৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন কর সকল ভুবন॥
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ত্ব তা'রে?
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁ'র নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁ'র, বাটী আনে কাকস্থানে? শ্লোক ৩১-৪৯॥ মধ্য, একাদশ

সীতার পাশে লক্ষ্মণ রূপে এই নিত্যানন্দেরই অধিষ্ঠান ছিল। মালিনীর স্তবে নিত্যানন্দ বাল্যভাবে হাসলেন এবং দুধ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিত্যানন্দের এই অলৌকিক লীলা বর্ণনান্তে কবি নিত্যানন্দ বিদ্বেষীদের শিরে পদাঘাত করতে চেয়েছেন—

যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতাপাশে॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ?
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যা'র।
কাকস্থানে বাটী আনে—কি মহত্ত্ব তাঁ'র?
তথাপি তোমার কার্যে অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয়॥"
হাসে নিত্যানন্দ ত'ান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে,—"মুঞি করিব ভোজন॥"
নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥
এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম, অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে মানয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ময়-ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমন ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥ শ্লোক ৫০-৬৩॥ মধ্য, একাদশ

মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানেই নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। একদিন বিশ্বম্ভর যখন লক্ষ্মীর সঙ্গে বসে আছেন, তখন তো নিত্যানন্দ দিগম্বর বাল্যলীলা দর্শনে শচী বাৎসল্য রসে পূরিত হলেন ও বসন পরিধান করে নিত্যানন্দ ভোজনে বসলেন—

একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি' আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম সুন্দর।।
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল।।
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া।।
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর?
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর।।
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ, বলে,—"আজি আমার গমন।।"
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, ইহা কেনে করি?"
নিতাই বলেন,—"আর খাইতে না পারি।"
প্রভু বলে,—"এক কহি, কহ কেনে আর?"
নিতাই বলেন,—"আমি গেনু দশবার।।"
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু,—"মোর দোষ নাঞি"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, এথা নাহি আই।।"
প্রভু কহে,—"কৃপা করি' পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি করিব ভোজন।।"
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায়।।
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি—হাসে পদ্মাবতীর নন্দন।।
নিত্যানন্দচরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ-পুত্র হেন মনে মনে বাসে।।
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে।।
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে।।

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়। আর চারি ফেলে ছড়াইয়া॥
'হায় হায়',—বলে আই—'কেনে ফেলাইলা?'
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে এক ঠাঞি দিলা?"
আই বলে,—"আর নাহি, তবে কি খাইবা?"
নিত্যানন্দ বলে,—"চাহ, অবশ্য পাইবা॥"
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে॥ শ্লোক ৬৫-৮৬॥ মধ্য, একাদশ

নিতানন্দের চরিত্রমহিমা দর্শন করে শচীমাতা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরলীলা প্রত্যক্ষ করলেন। নিমাই-নিতাইকে ভোজনে দেখে শচীমাতা দেখছেন গৌর-নিতাই ব্রজের কানাই-বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এর রহস্য শচীমাতা আর কাউকে ব্যক্ত করলেন না। নিত্যানন্দের যে পাপিষ্ঠজন নিন্দা করবেন, তাঁকে দেখে গঙ্গাও পালিয়ে যাবে। নিত্যানন্দ বন্দনায় তাঁকে 'বলরাম' অবতার জ্ঞানে প্রণাম নিবেদন করলেন কবি—

অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দমহিমা জানে কোন জনে?
আই বলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়?
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥"
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়,—আই করে পলায়ন॥
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি' করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর॥
যে তে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥ শ্লোক ৯১-৯৮॥ মধ্য, একাদশ

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিত্যানন্দের অলৌকিক বাল্যলীলা সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করে—

কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দরায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত-হাস॥ শ্লোক ৩-৪॥ মধ্য, দ্বাদশ

ভাবাবেশে নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা, গঙ্গায় সাঁতার, জ্যোতির্ময় দিগম্বর মূর্তি, মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দ স্তুতি, নিত্যানন্দের কাছে মহাপ্রভুর কৌপীন প্রার্থনা, সকল বৈষ্ণবমণ্ডলীকে নিত্যানন্দ প্রদত্ত কৌপীনের অংশ দান, তাঁকেই সঙ্গী সখা ইত্যাদি বলে বন্দনা করলেন—

বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্ধেক নাহি ভীত॥
সর্বলোক দেখি' ডরে করে—'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দরায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্বলোক করে—'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিনি চারিদিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি' করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার॥"
হাসে প্রভু দেখি' তা'ন মূর্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন—তথাপিহ হাস॥
আপনে লেপিলা তা'ন অঙ্গ দিব্য গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুন সর্ব ভক্তগণ॥

"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম-মূর্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ-পর্যটন, ভোজন, বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের র'স নিত্যানন্দমহামতি।
যে বলেন, যে ক'রেন—সর্বত্র সম্মতি॥
প্রভু বলে,—"এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"
এত বলি' প্রভু ত'ার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে,—"এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়—ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥ শ্লোক ৬-২৭॥ মধ্য, দ্বাদশ

নিত্যানন্দ বন্দনান্তে ভক্তদের নিত্যানন্দ পাদোদক গ্রহণ করতে বললেন মহাপ্রভু—

বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্বজীব-জনক, রক্ষক সর্বমিত্র॥
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি, ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্বভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বলে,—শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ॥ শ্লোক ২৮-৩২॥ মধ্য, দ্বাদশ

এই পাদোদক পানেই কৃষ্ণভক্তি সম্ভব এবং নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণে বৈষ্ণব সমাজে ভাবোন্মত্ত আনন্দ-বিলাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন কবি—

করিলেই মাত্র এই পাদোদক-পান।
কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন।।"
....
কেবা কা'র গলা ধরি' করয়ে রোদন।
কেবা কোন্ রূপ করে,—না যায় বর্ণন।। শ্লোক ৩৩-৪৭।। মধ্য, দ্বাদশ

নিত্যানন্দ-চৈতন্য পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। কম্পিতা পৃথিবী আনন্দিত শিহরণে ধন্য হল নিত্যানন্দের পদতলে। এই লীলা সর্বব্যাপী অশেষ। প্রভু এই নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনকেই তাঁর প্রতি নিবেদিত বলে গ্রহণ করলেন। নিত্যানন্দ-চরণ শিব-ব্রহ্মার দ্বারাও বন্দিত। নিত্যানন্দের প্রতি যার দ্বেষ থাকবে, সে কখনই চৈতন্যের প্রিয় হবে না। কবি বারে বারেই এই কথা উল্লেখ করেছেন—

নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী।।
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদ-তলে।
দেখিয়া আনন্দে সর্বগণে 'হরি' বলে।।
প্রেম রসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর।।
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ।।
এই মত সর্বদিন প্রভু নৃত্য করি'।
বসিলেন সর্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি।।
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর।।
প্রভু বলে,—"এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।।
ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত।।
তিলার্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।। শ্লোক ৪৯-৫৭।। মধ্য, দ্বাদশ

হরিদাস ও নিত্যানন্দকে ঘরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিতে বললেন চৈতন্য। নিত্যানন্দ হরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বললেন, তোমরা আমার একটা কথা শোন। উভয়ে বললেন—হে দয়াময়, কি আদেশ আমাদের প্রতি কৃপা করে বলুন। প্রভু বললেন—আদেশ এই —তোমরা প্রতি ঘরে ঘরে যাও এবং ভিক্ষা কর। কি ভিক্ষা? "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা'। মুখে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের চরণ আরাধনা কর, ভক্তি ও সদাচার পালন

কর। এই সমস্ত শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই একমাত্র ভিক্ষা, অন্য কোনো ভিক্ষা করবে না।"এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস অপূর্ব বর্ণনা করেছেন—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"
আজ্ঞা শুনি' হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কা'র আছে বল?
হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যা'র, সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে॥
আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ-হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি' হাস॥
আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন॥"
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-ঈশ্বরে॥
দোহান সন্ন্যাসিবেশ—যান যা'র ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—"এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥" শ্লোক ৭-২০॥ মধ্য, ত্রয়োদশ

সেই সময় নদীয়ার কোতোয়ালের কাজ করত জগাই-মাধাই। তাঁরা ভয়ঙ্কর পাপী, মদ্যপানে সর্বদা বিভোর থাকত। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম তাদের। একদিন গঙ্গাঘাটে দুই মহাপাপী মদ্যপানে বিভোর হয়ে পড়ে আছে। দয়াল নিতাই মনে মনে ভাবলেন এই দুইজনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে—

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল।।
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তাঁরা নাহি করে,—হেন পাপ নাহি আর।।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ।।
দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।।
দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়।।
দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ।।
ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চ'কার-'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি' বলে।।
নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি-নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কা'রে করয়ে আশ্বাস।। শ্লোক ৩১-৩৮।। মধ্য, ত্রয়োদশ

জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করলেন। সুতরাং তাদের সর্বনাশও সমুৎপন্ন। এই কথা বললেন কবি—

সর্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল।। শ্লোক ৩৯।। মধ্য, ত্রয়োদশ

নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই-এর বংশ পরিচয় জানলেন। জানলেন তাদের পাপকর্মের সংবাদ। তাঁর মনে করুণা জাগল। মনে হল পাতকীতারণ যদি মহাপ্রভুর কর্ম হয়, তবে এত বড় পাতকী আর কোথায় পাওয়া যাবে—

শুনি' নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয়।।
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর?
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা-প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে,—করে উপহাস।।
এ দুইয়ের প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে।।

তবে হও নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এই দুইয়েরে করাও যদি চৈতন্য-প্রকাশ।।
এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে।।
মোর প্রভু' বলি' যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন।।
যে যে জন এ দু'য়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া।।
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান হেন মানে, তবে মোরে লিখি।।"
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁ'র অবতার।। শ্লোক ৫৩-৬২।। মধ্য, ত্রয়োদশ

নিত্যানন্দ হরিদাস পাপিষ্ঠ জগাই-মাধাইকে কৃষ্ণকথা শোনাতে গেলেন। কিন্তু মহাক্রোধী সেই দুই পাপিষ্ঠ বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আরক্ত নয়নে বলতে লাগল—তোর নাম কী? নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে বললেন, আমার নাম অবধূত। জগাই-মাধাই বলল, তুই কী বলছিস? নিত্যানন্দ বললেন—আমি হরিনাম করতে বলছি। সে কথা শুনে মাধাই আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, শালা আমাদের প্রতি আবার উপদেশ। বলে ভাঙা হাড়ির টুকরো ছুঁড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। হাঁড়ির টুকরোর আঘাতে মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল, তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় করে বলতে লাগলেন—তোরা মেরেছিস তো ভালোই হয়েছে, তবুও তোরা একবার হরিনাম কর। মাধাই পুনরায় মারতে উদ্যত হল নিত্যানন্দকে। তখন জগাই মাধাইয়ের দু'খানি হাত চেপে ধরে বলল—ভাই মাধাই। ওকে মেরে লাভ নেই। এই অবস্থা দেখে হরিদাস ত্রাস ভয়ে ভীত হলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ নিজ আদর্শে অবিচল—

নিত্যানন্দ বলে,—"ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে—তবে পাই সব।।"
হরিদাস বলে,—ঠাকুর আর কেনে বল?
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল।।
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ।।"
এত বলি' ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু-পাছে ধায় তর্জিয়া গর্জিয়া।।
দোঁহার শরীর স্থূল,—না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মধ্যপ ত্বরিতে।।

দুই দস্যু বলে,—"ভাই কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?
তোমার না জান, এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ', উলটিয়া হের দেখ পাঁছে।।"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ বলিয়া।।
হরিদাস বলে,—"আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে।।
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঞি।
চাঞ্চল্যের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই।।'
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু যে বিহ্বল।। শ্লোক ৯৩-১০৩।। মধ্য, ত্রয়োদশ

বিশ্বম্ভরকে গিয়ে তাঁরা জানালেন জগাই-মাধাইয়ের সংবাদ। ক্রুদ্ধ হলেন মহাপ্রভু। তিনি জগাই-মাধাইকে বিনাশের সংকল্প করলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাদের বিনাশ চান না। তিনি ওই দুজনকে দিয়েই কৃষ্ণনাম বলাতে চান। নইলে গৌরাঙ্গের পাতকীপাবন নামের প্রকাশ হবে না। হরিদাস প্রভুর কাছে, নিত্যানন্দের কাছে অস্থির চাঞ্চল্যের বিবরণ দিলেন। অদ্বৈত নিত্যানন্দের ব্যজস্তুতি করলেন (নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করলেন)—

প্রভু বলে,—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।।"
নিত্যানন্দ বলে,—"খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সেই দুই থাকিতে কোথা' না যাইব আমি।।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই।।
স্বভাবেই ধার্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণ' নাম।
এই দুই বিকর্ম বই নাহি জানে আন।।
এই দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম।।
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দু'য়ের উদ্ধারের সীমা।।"
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—'হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।।
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তা'র করিব কুশল।।"

শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
'জয়-জয়'-হরিধ্বনি করিলা তখন॥
'হইল উদ্ধার',—সবে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতেরে স্থানে হরিদাস কথা কহে॥

....

হাসিয়া অদ্বৈত বলে,—"কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে॥
তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তা'র ভিত?
নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল।
উহার চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী মাঝে॥"
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
'দিগম্বর হই' বলে অশেষ বিশেষ॥
'শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তা'ন শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে॥" শ্লোক ১২৬-১৫৬॥ মধ্য, ত্রয়োদশ

মহাপ্রভুর কীর্তনধ্বনি শুনে জগাই-মাধাই আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। একদিন নিত্যানন্দ নগরে ভ্রমণ করে ফিরছেন, সেই সময়ে জগাই-মাধাই তাঁকে আক্রমণ করলেন। নিত্যানন্দ অবধূতকে কলসীর কানা দিয়ে আক্রমণ করল মাধাই। কিন্তু জগাই তাকে নিবারণ করল। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের আঘাত সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন ও নিত্যানন্দের নিবেদনে মহাপ্রভু কৃপা করলেন ও চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন—

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে, দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥

....

আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবৎ হৈয়া॥ শ্লোক ১৭৩-২০২॥ মধ্য, ত্রয়োদশ

সুতরাং দুষ্ট দুর্জনের প্রতি গৌরাঙ্গের যে করুণাবতার মূর্তির প্রকাশ তার সূচনা নিত্যানন্দের জীবনাচরণের সাহচর্যেই হয়েছিল। নিত্যানন্দের অঙ্গেতে রক্তপাতে মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে রক্তপাতের যন্ত্রণা অনুভব করলেন। এ অমার্জনীয় অপরাধ। প্রভু জানালেন,

নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া মাধাইয়ের মুক্তি অসম্ভব। তাই সমস্ত সুকৃতি মাধাইকে দিয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিত্যানন্দ। উভয় দুর্জনের মুক্তি সম্ভব হল—

মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেনমতে দু'জনেতে পাইল মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ॥
প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বলে,—"আর নারে বাপ॥"
প্রভু বলে,—"শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্—সব দায় মোর॥
তো-দোহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্ছিত হই' পড়িল তথাই॥ শ্লোক ২২৩-২২৯॥ মধ্য, ত্রয়োদশ

সকলে মিলিত কৃষ্ণনাম মহোৎসব এবং জগাই-মাধাই, নিতাই-গৌর স্তুতি বন্দনা করলেন কবি—

জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা॥
আপ্তগণ সান্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কা'রো শক্তি নাহি যাইতে॥
বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ।
চারিদিকে বৈসে সব-বৈষ্ণবসমাজ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব-গায়।
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়॥

....

জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে।।
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়।।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে—যা'র যেই তত্ত্ব।।
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়।।
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর।। শ্লোক ২৩৫-২৫০।। মধ্য, ত্রয়োদশ

কবি এই গ্রন্থে নানা স্থানে নানাভাবে জগাই-মাধাইয়ের গৌর-নিতাই সম্পর্কে স্তুতির বর্ণনা দিয়েছেন—

জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্বকার্য।।
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ।।
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু।।
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর।।
সেই জয়প্রভু—তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ।।
জয় জয় শঙ্খ-চক্র, গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর।।
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ।। শ্লোক ২৫১-২৫৭।। মধ্য, ত্রয়োদশ

গঙ্গাস্নানে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের জলক্রীড়া এবং জলক্রীড়া প্রসঙ্গে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেমকলহকে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন কবি। অদ্বৈত এখানে ব্যাজস্তুতিতে নিত্যানন্দের বন্দনা করেছেন। পশ্চিমার ঘরে নিত্যানন্দের অন্নগ্রহণ, জাতি-কুল পরিচয়হীন অবধূত নিত্যানন্দের নবস্তব রচনা করেন অদ্বৈত। নিত্যানন্দ গোরাচাঁদের কৃপা ছাড়া এই কৌতুক রহস্য পরিপূর্ণ অদ্বৈত আলাপন বোঝা যায় না—

অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী।।

দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
"নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥'
নিত্যানন্দ বলে,—"মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ?"
গৌরচন্দ্র বলে,—"একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি॥"
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক দেহ—দুই ঠাঞি॥
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে।
একবার জিতে কেহ, আরবার হারে॥
আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে,—"মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত॥
পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ?
খায়, পরে সকল, বলায় 'অবধূত'॥" শ্লোক ৩৪২-৩৫৪॥ মধ্য, ত্রয়োদশ

নিত্যানন্দকে লঙ্ঘন করার জন্য মাধাইয়ের অনুতাপের ক্রন্দন—

বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ-পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি' নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার॥"

মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি' মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥ শ্লোক ১৩-১৭॥ মধ্য, পঞ্চদশ

নিত্যানন্দ বালকবেশে নিরভিমানী চিত্তে নবদ্বীপে পরিভ্রমণ করেন। একদিন নিভৃতে নিত্যানন্দকে পেয়ে মাধাই প্রেমাশ্রুতিতে তাঁর চরণ ধৌত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও স্তুতিগানে তাঁকে পরিতুষ্ট করেন—

একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি' করে প্রভুর স্তবন॥
....
এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব-দুঃখ মাধাইব হৈল বিমোচন॥ শ্লোক ২০-৭০॥ মধ্য, পঞ্চদশ

এই স্তুতি শুনে নিত্যানন্দ তাকে আশ্বস্ত করেন। চৈতন্যে ভক্তিহীন নয়, যে মানুষ চৈতন্যকে ভজে সেই ব্যক্তি নিত্যানন্দের প্রাণস্বরূপ। এই বলে তিনি মাধাইকে জীবহিংসা ত্যাগ করার জন্য বিশেষ উপদেশ দিলেন। নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করে মাধাই কঠোর তপশ্চর্যা করে এবং যে গঙ্গার ঘাটে তিনি ব্রহ্মচর্য সাধন করেন তা মাধাইয়ের ঘাট নামে খ্যাতনামা হয়—

পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥
"সর্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি॥
কা'র বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তা'রা মোরে করিবে প্রসাদ?
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥"
প্রভু বলে,—"শুন, কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ্ সদায়॥
....
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায়॥ শ্লোক ৭১-৯৪॥ মধ্য, পঞ্চদশ

চৈতন্যকৃপাতেই একমাত্র চৈতন্যলীলা দর্শন সম্ভব—

চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে, যা'রে প্রভু দেন অধিকারে॥

এই মত প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্বজন।। শ্লোক ২২-২৩।। মধ্য, ষোড়শ

চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের একত্রিত উন্মত্ত কীর্তনবিলাসের বর্ণনা দিলেন কবি বৃন্দাবনদাস—

'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর।।
অদ্বৈত আচার্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল।। শ্লোক ৯৭-৯৮।। মধ্য, ষোড়শ

নিত্যানন্দ সর্বসেব্য কলেবর। মহাপ্রভুর নগরকীর্তনের সময় পাষণ্ডীরা তাঁর নিন্দাবাদ করে। সেই দুঃখ ভোলার জন্য আর অধিক কীর্তনানন্দে মুখরিত হন গৌরসুন্দর। প্রেম ভাবে মহাপ্রভু গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলে নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁকে রক্ষা করলেন—

দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে।
প্রভু বলে,—"তোমরা বা ধরিলে কিসেরে?
কি কার্যে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন।।"
দুইজনে মহা-কম্প—'আজি কিবা ফলে'!
নিত্যানন্দ দিগ চাহি' গৌরচন্দ্র বলে।।
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে?"
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে যাহ মরিবারে।।"
প্রভু বলে,—"জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বলে,—'প্রভু, ক্ষমহ সকল।।
যা'রে শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তা'র লাগি' চল নিজ-শরীর ছাড়িতে।।
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"।।
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যা'র প্রাণ, ধন, বন্ধু—চৈতন্য সকল।। শ্লোক ৩৬-৪৩।। মধ্য, সপ্তদশ

নিত্যানন্দের কৃপাতেই চৈতন্যকীর্তন স্ফুরিত হয়। নিত্যানন্দ কৃপাতেই চৈতন্য রতিলাভ সম্ভব বলে জানালেন বৃন্দাবনদাস—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহ প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন?।।
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।

তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি॥ শ্লোক ১১৪-১১৬॥ মধ্য, সপ্তদশ

চৈতন্য তাই নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ। রুক্মিণী বেশে নিমাই নৃত্য অভিনয় করলে নিত্যানন্দ তা দেখে কৃষ্ণাবেশে মূর্ছা যান—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে॥ শ্লোক ১৫৮-১৬০॥ মধ্য, অষ্টাদশ

একমাত্র গৌর আনুগত্য প্রকাশেই নিত্যানন্দের সার্থকতা। তাই গৌরাঙ্গের গোষ্ঠীনৃত্য কালে বড়াই-বুড়ির ভাবাবেশ হল নিত্যানন্দের উপর। অল্প ভাগ্যের দ্বারা এই নিত্যানন্দের স্বরূপকে জানা যায় না। যারা না বুঝে নিত্যানন্দের নিন্দাবাদ করে কবি তাদের পদাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেন না—

অদ্ভুত গোপিকা নৃত্য চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥
হইলা বড়াই বুড়ি প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র॥
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥
প্রভু হইলেন গোপী, নিত্যানন্দ বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যা'র অনুভব নাই॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যা'রে, সে এ মর্ম জানে।
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনে॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥ শ্লোক ২১৬-২২৩॥ মধ্য, অষ্টাদশ

নিত্যানন্দ ও গদাধরকে নিয়ে মহাপ্রভু নবদ্বীপে পরিভ্রমণ করেন—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব-নয়নগোচর॥

আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে।। শ্লোক ২-৩।। মধ্য, ঊনবিংশ

একদিন গৌর-নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পরিভ্রমণ করছেন। মনে হল যেন নবদ্বীপের আকাশে দুই চন্দ্রের উদয় হয়েছে। সমস্ত দেবগণ পর্যন্ত দুই চাঁদ দেখে বিভ্রান্ত হলেন—

একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।।
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
"মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে।।"
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায়।।
অন্তরীক্ষে থাকি' সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে গণে মনে মন।।
আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চান্দ দেখি' পৃথিবীর হৈল স্বর্গ ভান।।
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল।।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার।।"
কোন দেব বলে,—"শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র—এক, এক প্রতিবিম্ব আর।।"
কোন দেব বলে,—"হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে বা চন্দ্রে বিধি করিল যোজন।।"
কেহ বলে,—'পিতা-পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক—'বুধ' চন্দ্রের তনয়।।"
বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে', এ নহে কৌতুক।।
হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন।।
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্যের ঘর।।"
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্যের ঘর।। শ্লোক ২৮-৪১।। মধ্য, ঊনবিংশ

এই সময়ে ললিতপুর গ্রামে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর কুটির দেখে নিত্যানন্দের কাছে

গৌরসুন্দর গৃহস্থের পরিচয় জানতে চাইলেন। সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে গৃহীসুলভ ধন-যশ-পত্নী লাভের আশীর্বাদ করলে প্রতিবাদী গৌরাঙ্গ তাকে কৃষ্ণকৃপা লাভের আশীর্বাদ করতে বললেন—

নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ জান কহ কা'র বাসা?"
নিত্যানন্দ বলে,—'প্রভু, সন্ন্যাসি-আলয়।"
প্রভু বলে,—"তা'রে দেখি, যদি ভাগ্য হয়।।"
হাসি' গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণাম।।
দেখিয়া মোহন-মূর্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন।।
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।
'ধন, যশে, সুবিবাহ, হউ বিদ্যালাভ।।"
প্রভু বলে,—"গোসাঞি এ নহে আশীর্বাদ।"
হেন বল—"তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ।।
বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয়।।"
হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,—''পূর্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল।। শ্লোক ৪৪-৫১।। মধ্য, ঊনবিংশ

দ্বারী সন্ন্যাসী কোনভাবেই প্রভুবাক্য মানতে চাইলেন না—

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনে' প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল দ্বিজ—মন্ত্রের কারণ।।
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই' যায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া।।"
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল।।
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া বদরিকাশ্রম।।
গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত্ত আছে পুরী।।
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়।।" শ্লোক ৭২-৭৭।। মধ্য, ঊনবিংশ

তখন নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে সন্তুষ্ট করলেন এবং উভয়ে সন্ন্যাসীর গৃহে আহার্য গ্রহণ

করলেন। নিত্যানন্দকে বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করতে বললে সন্ন্যাসীপত্নী তাঁকে নিষেধ করলেন। অতীব রম্য ও নাটকীয় সংলাপে মুখর সে আখ্যান—

হাসি বলে নিত্যানন্দ,—"শুনহ গোসাঞি।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাঞি॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥"
আপনার শ্লাঘা শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে'।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বলে,—"কার্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ' স্নান করি' পথেতে খাইব॥"
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই' স্নিগ্ধ হই' করহ গমনে॥"
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন॥
দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি করি' কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খেয়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাৎ॥
বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে॥
"শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব?
তোমা-হেন অতিথি বা কোথায় পাইব?
দেশান্তর ফিরি' নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে॥
'আনন্দ আনিব'—ন্যাসী বলে বার-বার।
নিত্যানন্দ বলে—"তবে লড় সে আমার॥"
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তা'র নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি?"
প্রভু বলে,—"কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী?"
নিত্যানন্দ বলয়ে,—"মদিরা হেন বাসী॥" শ্লোক ৭৮-৯২॥ মধ্য, ঊনবিংশ

এরপর নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ গঙ্গা অতিক্রম করে দ্রুত অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করলেন—

দুই প্রভু চঞ্চল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য'—গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া।। শ্লোক -৯৪।। মধ্য, ঊনবিংশ

একমাত্র বৈষ্ণবনিন্দুক ছাড়া গৌরাঙ্গ সকলকেই কৃপা করেন। গঙ্গায় ভাসমান গৌর-নিত্যানন্দকে দেখে মনে হয় ক্ষীরোদ সাগরে ভাসমান অনন্ত-মুকুন্দ। এইখানে কি অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করলেন কবি—

তর্জে গর্জে মহাপ্রভু, গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই, নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে।।
দুই প্রভু ভাসি' যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে।। শ্লোক ১২২-১২৩।। মধ্য, ঊনবিংশ

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের যে সকৌতুকী লীলা, তা অভিজ্ঞজন ছাড়া বুঝতে পারেন না। মহাপ্রভু ক্ষুধার্ত মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাত্ত্বিক নিত্যানন্দের কাছে সকৌতুকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—

অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এই মত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যা'র।।
*** *** ***
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম।। শ্লোক ২১৭-২২২।। মধ্য, ঊনবিংশ

নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে চললেন বিশ্বম্ভর—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে।। শ্লোক ২২৯।। মধ্যে ঊনবিংশ

নিত্যানন্দের কৌতুকী বালক স্বভাবের উল্লেখ করতে ভোলেননি কবি বৃন্দাবনদাস। প্রেমাবেশে অদ্বৈত মহাপ্রভুকে এবং হরিদাস অদ্বৈতকে প্রণাম করলে তাঁদের জ্ঞানের এই ত্রয়ী সেতু দর্শনে নিত্যানন্দ কৌতুকহাস্য করে। বিশ্বম্ভর-অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসেও নিত্যানন্দের বালক স্বভাব প্রকাশিত হয়। অদ্বৈত নিত্যানন্দের সারা ঘরে খাবার ছড়ানো দেখে ক্রোধচ্ছলে নিত্যানন্দকে বলেন—

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু-মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ।।
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে—'হায় হায়', হাসে হরিদাস।।
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে।।

"জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি' হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি বলয়ে, 'সন্ন্যাসী' করি' নাম।
জন্মিলা না জানিয়া নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥
কেহ ত' না চিনে নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সর্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥" শ্লোক ২৪২-২৪৯॥ মধ্য, ঊনবিংশ

অদ্বৈতের ক্রোধ ও নিত্যানন্দের মনের মধ্যে কৌতুক রসের জন্ম নেয়। প্রেমরসে কুতূহলী দুই ভক্তের মিলন ঘটে। নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহাপ্রভুর দুই হস্তস্বরূপ। উভয়ের কলহ লীলারই প্রকাশ। বলরামকৃপাতেই চৈতন্যলীলাগান করেন কবি—

ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়॥ শ্লোক ২৫৮-২৫৯॥ মধ্য, ঊনবিংশ

কীর্তনকারীর জিহ্বাতে বলরাম কৃপাতেই সরস্বতীর অধিষ্ঠান। নিত্যানন্দ এই বলদেবেরই অবতার। একদিন শ্রীনিবাস গৃহে নিত্যানন্দ সঙ্গে বসে আছেন, মুরারি গুপ্ত এসে উভয়কে প্রণাম করলেন—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি' আছে নানা-রঙ্গে॥
আইলা মুরারি গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয়॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম॥ শ্লোক ৫-৭॥ মধ্য, বিংশ

কিন্তু বলদেব নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ বলে তাঁকে প্রণাম না করায় প্রভু প্রতিবাদ করলেন। মুরারিকে স্বপ্ন দর্শনে নিত্যানন্দ তত্ত্ব ব্যাখা করলেন গৌরসুন্দর। নিত্যানন্দের হলধর স্বরূপও ব্যাখ্যা করলেন মহাপ্রভু—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে॥
"যে করিলা মুরারি, না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥

কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে?"
মুরারি বলয়ে—"প্রভু জানিব কেমতে?
মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ যেন-মতে॥"
প্রভু বলে,—"ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে॥"
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয় হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে॥
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল-মুষল তা'ন বানা॥
নিত্যানন্দ-মূর্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে,—"জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি॥"
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিকে গেলা শিখাইয়া॥ শ্লোক ৮-১৮॥ মধ্য, বিংশ

মুরারি নিত্যানন্দকে জ্যেষ্ঠ জেনে ক্রন্দনাকুল হলেন—

চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি' শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥
মহা-সতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই' সচকিতা॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া॥
....
'ভাই বলি' মুরারিকে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি' বলে সদয় বচন॥ শ্লোক ১৯-৪৮॥ মধ্য, বিংশ

এই সঙ্গে কবি বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে নিত্যানন্দ বিদ্বেষী যে, সে চৈতন্য কৃপালাভের যোগ্য নয়—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে॥ শ্লোক ৫০॥ মধ্য, বিংশ

মুরারির কাছে নিত্যানন্দ স্বরূপ যথার্থ উন্মোচিত হল বলে মুরারি চৈতন্যের কৃপাও প্রাপ্ত হলেন—

ঘরে যাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা॥
হেন-মতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান্ মাত্র॥ শ্লোক ৫১-৫২॥ মধ্য, বিংশ

বৃন্দাবনদাস ভণিতায় জানালেন যে তিনি এই কাব্যকথায় যা কিছু লিখেছেন তা সবটাই সম্ভব হয়েছে চৈতন্যমাহাত্ম্যে। তিনি আশা প্রকাশ করছেন, যে আজন্মকাল নিত্যানন্দ তার হৃদয়ে অধিষ্ঠান হয়ে থাকেন, যার কৃপায় তিনি চৈতন্য লাভ করেছেন, তিনি তার প্রভু—

নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান॥ শ্লোক ১৫৬-১৬০॥ মধ্য, একবিংশ

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ প্রাণ, শুধু চৈতন্য নয়, চৈতন্য ভক্তদের উদ্দেশ্যেও কবি প্রণতি জানিয়েছেন। চৈতন্যের প্রিয় দেহস্বরূপ নিত্যানন্দই তার প্রভু। তাঁর কৃপাতে তিনি এ কাব্য লিখতে সক্ষম হয়েছেন—

চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥ শ্লোক ৮৩-৮৬॥ মধ্য, একবিংশ

গদাধর ও নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে লীলা করেন। গৌরাঙ্গের মাথায় ছাতা ধরেন নিত্যানন্দ—

দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি' ছত্র ধরিল মাথায়॥

বামদিকে গদাধর তাম্বুল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।। শ্লোক ১৮-১৯।। মধ্য, দ্বাবিংশ

অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বলেছেন। নিত্যানন্দ প্রসাদেই গৌরভক্তকে জানা যায়। বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ অভেদ শরীর---

নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া।।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি।।
....
নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার।।
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক-ঠাঁই।।
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।। শ্লোক ১৩৪-১৪৬।। মধ্য, দ্বাবিংশ

প্রিয়তম নিত্যানন্দের সঙ্গে চলে বিশ্বম্ভরের বিবিধ লীলা। নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে বৈষ্ণব সঙ্গে প্রেম বিতরণ করেন। কবির এই বর্ণনা অপূর্ব--

"কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।।"
সবে মিলি' গায় হই' মহা-কুতূহলী।।
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায়।। শ্লোক ২৯-৩০।। মধ্য, ত্রয়োবিংশ

গৌরাঙ্গের কীর্তনবিলাসের আনন্দসঙ্গী তিনি। গৌরাঙ্গ নৃত্যাবেশে ভূমিতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে দুই বাহু মেলে তাঁকে নিজের হাতে রক্ষা করেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের শরীর মনে নারায়ণ ভাবে অবস্থান করেন গৌরাঙ্গ--

নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্তন,
সবা' চা'হি চা'হি হাসে'।।
যাঁহার কীর্তন করি' অনুক্ষণ,
শিব 'দিগম্বর ভোলা'।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্তন-খেলা।।
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ,
কমলা লালসা করে।

সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বহি আর'
না বোলই কা'রো মুখে॥
অপূর্ব কৌতূক, দেখি' সর্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে ভাই "হরি বোল"॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥
নিত্যানন্দ ধরি', বীরাসন করি,'
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
'হরি হরি' বলি' হাসে'॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুঞি দেব নারায়ণ॥ শ্লোক ২৭৯-২৮৬॥ মধ্য, ত্রয়োবিংশ

নগর ভ্রমণরত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর লীলা অন্তরে দর্শন করে শ্রীবাসের গৃহে গমন করেন। বিশ্বম্ভরের বিশ্বমূর্তি দর্শন করে, নত হলে গৌরাঙ্গ তাঁকে জানালেন, নিত্যানন্দের প্রতি যেই প্রীতি প্রকাশ করেন সেই তাঁর প্রিয়। আর অদ্বৈত-নিত্যানন্দ অভিন্ন মূর্তি। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের যুগল নৃত্য দর্শন করে গৌরাঙ্গও আনন্দিত হলেন—

পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
পর্যটনসুখে ভ্রমে' সর্ব নদীয়ায়॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জেন প্রচুর॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি'।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বুজি' আঁখি॥

প্রভু বলে,—"উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥
যে তোমারে প্রীতি করে, মুঞি সত্য তা'র।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভাল-মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥"
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর॥ শ্লোক ৫৬-৬৪॥ মধ্য, চতুর্বিংশ

দুজনের নৃত্যবিলাসে পূর্বের মতো এখানেও অদ্বৈত-নিত্যানন্দের রঙ্গমুখর প্রেম-কলহ বর্ণিত হয়েছে—

বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম-আনন্দ॥
বৈভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥
কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥
এই মতে দুই জনে মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেই বাজিল গালাগালি॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"অবধূত মাতালিয়া!
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্তাইলি কেনে?
'সন্ন্যাসি' করিয়া তো'রে বলে কোন্ জনে?
হেন জাতি নাহি, না খাইলা যা'র ঘরে।
'জাতি আছে', হেন কোন্ জনে বলে তোরে?
বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল?
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল॥"
নিত্যানন্দ বলে,—"আরে নাড়া, বসি' থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ আগে দেখাই প্রতাপ॥
আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা' সনে তুমি অকারণে গর্ব কর॥" শ্লোক ৭৬-৮৭॥ মধ্য, চতুর্বিংশ

গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা গ্রহণ করলেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত 'পরম কারুণ্য বাক্য' শুনে হর্ষে উল্লিসিত ভক্তগণ জয়ধ্বনি করতে লাগলেন—

আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর।।"
শ্রীমুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি'।
চতুর্দিকে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি।। শ্লোক ৭৬-৭৭।। মধ্য, পঞ্চবিংশ

মহাপ্রভু বিবিধ অবতারের ভাব প্রকাশ করে বলরাম ভাবে স্থিত হলে নিত্যানন্দ তাঁকে গঙ্গাজল দান করলেন। কেননা চৈতন্য যতই উন্মত্ত বলরাম ভাবে ভাবিত হয়ে মদ্যপান করতে চান না কেন, নিত্যানন্দ জানেন সত্য মদ্য নয়, গঙ্গাজল রূপ মদ্যই চৈতন্যের প্রার্থিত—

মহা-মত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে।
'মদ-আন' 'মদ আন' ডাকে উচ্চরবে।।
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘর ভরি' গঙ্গাজল দেন সাবহিত।।
হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন।।
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব-প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড।।
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে।।
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।।
আর্যা-তর্জা পড়েন পরম-মত্ত প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায়।।
কি সৌন্দর্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কা'রো আর্তি নাহি ভাগে।।
অতি অনির্বচনীয় দেখি' মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ'।।
কদাচিৎ কখনও প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয়।। শ্লোক ৬৬-৭৫।। মধ্য, ষড়বিংশ

বলরাম-বন্দনা শুনে আবিষ্ট গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে ভ্রমণসঙ্গী হতে আহ্বান করলেন। কখনো বিশ্বম্ভর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন ভাবেও স্থিত হলেন।

এই সময় হেঁয়ালিচ্ছলে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসবার্তা প্রেরণ করলেন, নিত্যানন্দ বুঝলেন প্রভু শীঘ্রই সন্ন্যাস নেবেন। তিনি দুঃখিত হলেন, সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সন্ন্যাস নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন—

এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥'
বলি অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সবা'ত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্বথায়॥

....

সন্ন্যাসীরে সর্ব লোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥

....

নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ-পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি'।
চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ শ্লোক ১২০-১৫২॥ মধ্য, ষড়বিংশ

নিত্যানন্দ নিস্পন্দ শরীরে বেদনাহত মনে গৌরাঙ্গের এই সন্ন্যাস সংবাদ শুনলেন—

'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিষ্পন্দ॥
স্থির হই' নিত্যানন্দ মনে মনে গণে'।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিবা-রাতি।"
এতেক চিন্তিত মূর্ছা পায় মহামতি॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥ শ্লোক ১৫৩-১৫৬॥ মধ্য, ষড়বিংশ

শচীমাতা গৌরাঙ্গকে নিত্যানন্দ সহ নবদ্বীপে কীর্তন করতে বললেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর জননীকে নিজ স্বরূপ দেখিয়ে নিবৃত্ত করলেন।

একমাত্র নিত্যানন্দের কাছে এবং আরও পাঁচজন ভক্তের কাছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত দিনক্ষণ ও স্থান জানালেন এবং তিনি আরও জানালেন কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস নেবেন—

'শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি!
এ-কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি॥

এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।।
'ইন্দ্রাণী' নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম।।
তান স্থান আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত।।" শ্লোক ৮-১১।। মধ্য, অষ্টাবিংশ

মাত্র পঞ্চজন স্থানে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস রহস্যের প্রকাশ করলেন নিত্যানন্দ—

আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, অপর মুকুন্দ।।"
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে।।
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন।। শ্লোক ১২-১৪।। মধ্য, অষ্টাবিংশ

গৌরাঙ্গের কেশমুণ্ডনকালে নিত্যানন্দও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ক্রন্দন করলেন—

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলবর উঠিল তখনে।।
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে।
মাথে হাত না দেয় ক্রন্দন মাত্র করে।।
নিত্যানন্দ-আদি করি' যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন।। শ্লোক ১৪০-১৪২।। মধ্য, অষ্টাবিংশ

নিত্যানন্দস্বরূপের সন্ধান পেয়েই কবি এই চৈতন্যকথা প্রকাশ করেছেন বলে মধ্যখণ্ডের শেষে আবার নিত্যানন্দ বন্দনা করলেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু।।
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্ত-বৃন্দ।।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।
মুখেহ যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ।।
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায়।।
....
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।। শ্লোক ১৮৯-১৯৯।। মধ্য, অষ্টাবিংশ

অন্ত্যখণ্ড

গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিত্যানন্দ পশ্চিম মুখে গমন করলেন। ক্রন্দনরত গৃহী ভক্তবৃন্দকে প্রভু কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও কৃষ্ণসেবার নির্দেশ দিলেন—

তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি' হরিধ্বনি॥
নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশবভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায়॥
চতুর্দিগে লোক কান্দি' বন ভাঙ্গি যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥
"সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা' সবার শরীরে॥" শ্লোক ৫১-৫৬॥ অন্ত্য, ১ম

গৌরাঙ্গ জানালেন তিনি নীলাচলে যাবেন। এই সঙ্গে তিনি নিত্যানন্দকেও সত্বর নীলাচলে এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে বললেন—

পূর্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ-কুতূহলে।
বলিলেন,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।"
"নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্ত্বরে॥" শ্লোক ৮৯-৯১॥ অন্ত্য, ১ম

এরপর মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করলেন—

সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে।
সান্ধ্যকালে গঙ্গার তীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বলি বহু করিলে স্তবন॥ শ্লোক ১১২-১১৩॥ অন্ত্য, ১ম

নিত্যানন্দের সঙ্গে নিশাযাপনও করেন চৈতন্য। অতঃপর তিনি নিত্যানন্দের উপর নবদ্বীপের ভার অর্পণ করলেন। তাঁকে বললেন, নীলাচল যাত্রাপথে শান্তিপুরে তিনি

শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের অপেক্ষায় থাকবেন এবং অদ্বৈতাচার্যের গৃহে বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বে তিনি হরিদাসের ফুলিয়ানগর ঘুরে আসবেন—

প্রভু বলে,—'শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।
শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন।।
এই সব কথা তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে।।
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের ঘরে।।
তাঁ সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া-নগরে।।''
নিত্যানন্দ পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর।। শ্লোক ১২৭-১৩২।। অন্ত্য, ১ম

নিত্যানন্দ চৈতন্য অর্পিত সেই দায়িত্বভার মাথায় নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন—

প্রভুর আজ্ঞায় মহা-মল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ।।
প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যনন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায়।।
....
আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি' প্রভুর আলয়।। শ্লোক ১৩৩-১৪৫।। অন্ত্য, ১ম

শচীদেবীর কাছে এসে নিত্যানন্দ জানালেন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে চৈতন্যাগমনের আনন্দ সংবাদ। শচীমার তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা। কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে মুগ্ধ নিত্যানন্দ। শচীদেবী তাঁকে অক্রুরসম জ্ঞান করেছেন। তাঁকে দেখেই শচীদেবী মূর্ছিত হয়ে পড়লে নিত্যানন্দের সেবা-পরিচর্যায় পুনঃ সঞ্জীবিত হলেন তিনি। তারপর চৈতন্য-বিরহার্ত ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের চৈতন্য মিলনাকাঙ্ক্ষায় অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গমন। এই আখ্যানবৃত্তে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ যে শচীদেবীকে কতখানি ব্যথিত করেছিল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস।

যে দিবস গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস।।
দ্বাদশ-উপাস তা'ন—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন।। শ্লোক ১৬০-১৬১।। অন্ত্য, ১ম

শচীমাতাকে নিত্যানন্দ মধুর বাক্যে সান্ত্বনাও দিলেন—

দেখি' নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর।।
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি।।
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ।।
বেদে যাঁ'রে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন।।
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার।।
ব্যবহার-পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার-বার।।
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তা'নে।। শ্লোক ১৬২-১৬৮।। অন্ত্য,১ম

শচীমাতাকে রন্ধনে প্রবৃত্ত করে নিত্যানন্দ। এসবই শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিত্যানন্দের ছলনা—

শীঘ্র গিয়া কর মাতা, কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব ভক্ত-গণ।।
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপবাসে সে কৃষ্ণের উপবাস।।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন।।"
তবে আই শুনি' নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি' বিরহ গেলা করিতে রন্ধন।।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি।।
তবে আই সর্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া।।
পরম-সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপবাসে আই করিলা ভোজন।। শ্লোক ১৬৯-১৭৫।। অন্ত্য, ১ম

এরপর নিত্যানন্দের সঙ্গে নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দগণ ফুলিয়ায় গেলেন মহাপ্রভুর দর্শনার্থে—

তবে সর্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে।।
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী।।"

....

আনন্দে চলিলা সবে বলি' 'হরি 'হরি'।। শ্লোক ১৭৬-১৮০।। অন্ত্য, ১ম

শান্তিপুরে নিত্যানন্দ-বলরাম সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৃন্দাবন লীলার পুনঃপ্রকাশ--

পূর্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তা'রাও সপরিকরে করিল গমন।।
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
"না বুঝিয়া নিন্দা করিলাঙ তা'ন ধর্ম।।
এবে লই গিয়া তা'ন চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন।।" শ্লোক ১৮১-১৮৩।। অন্ত্য, ১ম

প্রভু যখন নীলাচলে যাত্রা করলেন, তখন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিত্যানন্দ নীলাচল অভিমুখী হলেন। নীলাচল পথে বিপ্রলব্ধ শ্রীচৈতন্যের প্রেমাশ্রু বিগলিত ভাবের মর্ম একমাত্র নিত্যানন্দের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। নিত্যানন্দ ও সমস্ত ভক্তদের নিয়ে ভোজন সাঙ্গ করে নীলাচলে প্রভু জগন্নাথ সন্ধানে সচেষ্ট হলেন চৈতন্য—

কা'রে বা করেন আর্তি, কান্দেন বা কা'রে।
এ মর্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে।।
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি' বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা' না জানে প্রভু আপন-লীলায়।।
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে
আপনে করিয়া আর্তি লওয়ায়েন জনে।।
যদি কৃপা দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি।
তবে কা'র্ আছে তা'নে জানিতে শকতি।।
নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।।
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি।।
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি' আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ?" বলে ঘনে ঘন।। শ্লোক ১১৫-১২১।। অন্ত্য, ২য়

ভক্তরা বিপদাচ্ছন্ন হলে নিত্যানন্দ সবাইকে চৈতন্যবিরহে প্রবোধ দিলেন--

পাছে প্রভু সবা ছাড়ি' করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি' ধরিলেন মন।।

নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন—"চিন্তা নাই।
আমা' সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি।।"
দানী বলে,—"তোমরা ত' সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমার সে উচিত দান দেহ'।।" শ্লোক ১৭২-১৭৪।। অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। চৈতন্য আবেশে মগ্ন নিত্যানন্দ বিহ্বল হলেন—

কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া।।
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্বথায়।।
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য, ক্ষণে বা গর্জন।।
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার।।
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্বলোক বাসে।।
আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ।।
এ সকল কথা তা'নে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়।।
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়।। শ্লোক ১৯৪-২০১।। অন্ত্য, ২য়

প্রভু নিত্যানন্দের কাছে দণ্ড রেখে ভিক্ষার্থে গমন করলে নিত্যানন্দ সেই দণ্ড ভেঙে ফেললেন—

নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে।।
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দুই থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে।।
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি' আমিহ আসিব এইক্ষণে।।"
আথে-ব্যাথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি' করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে।।
দণ্ড হাতে করি' হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।।

"অহে দণ্ড, আমি যাঁ'রে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে।।"
এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড।। শ্লোক ২০২-২০৮।। অন্ত্য, ২য়

এই লীলার একমাত্র মর্মজ্ঞ নিত্যানন্দই। বলরাম ছাড়া চৈতন্যের দণ্ড ভাঙা আর কারো সাধ্যাতীত। নিত্যানন্দ সর্বদেব অধিষ্ঠাতা চৈতন্যের হাতে সামান্য বংশদণ্ড সহ্য করতে পারেননি—

ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে।।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর।।
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ।।
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি, বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে।।
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড?
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম, সেই জন সুখে তরে।। শ্লোক ২০৯-২১৪।। অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দের দণ্ড ভাঙার ঘটনায় মহাপ্রভু ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি একাই তাঁর সাধনার পথে চললেন—

দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি'।
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌর-হরি।।
প্রভু বলে,—"সবে দণ্ড-মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ।।
এতেকে আমার সঙ্গে কা'রো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই।।"
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কা'র।
সবেই হইলা শুনি, চিন্তিত অপার।।
মুকুন্দ বলেন,—"তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে।।" শ্লোক ২৩১-২৩৫।। অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দ কেন তাঁর সন্ন্যাসভঙ্গ করে তাঁকে উন্মত্ত করেছেন, গৌরসুন্দর তার কারণ জানতে চাইলেন—

নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁ'রে কিছু কুতূহলে॥
"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ॥
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর, তবে মোর মাথা খাও॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য-সত্য এই আমি সবা-স্থানে কই॥" শ্লোক ২৫৩-২৫৬॥ অন্ত্য, ২য়

কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি সকলকে সাবধান থাকার শিক্ষা দিলেন। কোনো বৈষ্ণব ভক্ত যেন নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষ না করে—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দ-প্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
সত্য-সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়॥
নিত্যানন্দ-স্থানে যা'র হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তা'র প্রেম-ভক্তি-বাধ॥
নিত্যানন্দে যাহার যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
আত্ম-স্তুতি শুনি' নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
পরম-আনন্দ হইলা সর্বভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ শ্লোক ২৫৭-২৬২॥ অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে পুরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত গেলেন। বাসুদেব সার্বভৌম পদধূলি নিলেন নিত্যানন্দের—

নিত্যানন্দ দেখি' সার্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণ-ধূলি করিয়া বিনয়॥ শ্লোক ৪৫৮॥ অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দ প্রভুকে স্নান করতে বললে নিজ দেহ মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে দান করলেন—

নিত্যানন্দ বলে,—"বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল॥" শ্লোক ৪৯০॥ অন্ত্য, ২য়

নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি আচরণের আদেশ দিলেন গৌরচন্দ্র। তাঁর দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ—

আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
ভক্তি করি' সেবিহ তাঁহার পদ-দ্বন্দ্ব॥ শ্লোক ১৫০॥ অন্ত্য, ৩য়

শ্রীচৈতন্য রসোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির।।
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে।। শ্লোক ১৯২-১৯৩।। অন্ত্য, ৩য়

পুরীর সুবর্ণ সিংহাসনে উঠে বলরামকে আলিঙ্গন করলেন নিত্যানন্দ—

একদিন উঠিয়া সুবর্ণ-সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে।। শ্লোক-১৯৪।। অন্ত্য, ৩য়

নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যস্বভাব, সেই কারণে বলরামের মালা নিয়ে নিজের গলায় পরলেন--

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই' পরিলেন গলে আপনার।।
মালা পরি' চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে।।
"এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে।।
মত্তহস্তী ধরি' মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে।।
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই' গিয়া কোথা বা পড়িলুঁ।।
এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয়।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ সখ্যভাব বাল্য-ভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে।। শ্লোক ১৯৬-২০২।। অন্ত্য ৩য়

অবধূত অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করেন—

বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁ'রে আপনে নাচায়।।
আপনে কখন নৃত্য করে তাঁ'র সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে।। শ্লোক ৪২৯-৪৩০।। অন্ত্য, ৩য়

কুলিয়া গ্রামে জগৎগুরু নিত্যানন্দের নিন্দুকদের কবি জানালেন, নিত্যানন্দই মূর্তিমান ভাগবতরস, তবুও তিনি সেই ভাগবতের অন্ত পান না—

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া।।

ভাগবত-রস-নিত্যানন্দ-মূর্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত-অর্থ সে গাহেন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥ শ্লোক ৫৩৪-৫৩৭॥ অন্ত্য, ৩য়

অনন্ত অবতার রূপে নিত্যানন্দ প্রকটিত। তাঁরই আজ্ঞায় কবির এই কাব্য রচনা—

এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর॥
সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত রায়।
সূত্র-মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥ শ্লোক ৩০১-৩০২॥ অন্ত্য, ৪র্থ

অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে কবি মহোৎসবে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে নৃত্যের উল্লেখ করলেন—

নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সুখময়।
বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥ শ্লোক ৪৯৬॥ অন্ত্য, ৪র্থ

অন্যান্য ভক্তগণের পূর্বে নিত্যানন্দকে মালা-চন্দন দিলেন গৌরাঙ্গ—

তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে॥ শ্লোক ৫১১॥ অন্ত্য ৪র্থ

নিত্যানন্দকে গৌরসুন্দরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার জন্য পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতকে গুহ্য উপদেশ দিলেন মহাপ্রভু—

পানিহাটী-গ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
রাঘব পণ্ডিত-প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর॥
"রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সে-ই করি আমি এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥ শ্লোক ৯৯ ১০৪॥ অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দের সেবা করার জন্য রাঘবকে আদেশ দিলেন মহাপ্রভু--

মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা-সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ---যেহেন ভগবান্॥'' শ্লোক ১০৫-১০৬॥ অন্ত্য, ৫ম

নীলাচলে পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দের মধ্যে কেবলই গৌরচন্দ্রের নাম প্রকটিত---

নিত্যানন্দ-প্রভুবর---পরম উদ্দাম।
সর্ব নীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহ-অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব॥
সদাই জপেন নাম---শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥ শ্লোক ২১৬-২১৮॥ অন্ত্য, ৫ম

যেন রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের প্রীতির মতোই, বলরাম-নিতাইয়ের প্রীতি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি। দেহাবসানের পূর্বে শ্রীচৈতন্য নিতাইকে উপদেশ দিয়ে গৌড়দেশে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের জন্য পাঠালেন---

প্রভু বলে,— "শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে॥'
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি'।
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি'॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার?
ভক্তি-রস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে?
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও॥
মূর্খ-নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর তবে সবারে মোচন॥'' শ্লোক ২২৩-২২৯॥ অন্ত্য, ৫ম

পথে নিত্যানন্দের পার্ষদদের দেহে দেখা দিল ভাবাবেশের লক্ষণ---

পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ-আগে কৈলা প্রেম-ময়॥

সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
'কা'র দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত।। শ্লোক ২৩৪-২৩৫।। অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দ সকল ভক্তদের গৌরভাব দান করলেন। সেই নিত্যানন্দলীলা বর্ণনা করার সাধ্য কার আছে। তারপর নিত্যানন্দ এলেন পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে। ক্রমে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ সেই গৃহে অবস্থান করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্তন করতে লাগলেন—

এই মত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম।।
....
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গা-তীরে পাণিহাটী-গ্রাম।। শ্লোক ২৪২-২৫১।। অন্ত্য, ৫ম

রাঘব পণ্ডিতের ঘরে সপার্ষদ অবস্থান করে ঘোষ ভ্রাতাদের সঙ্গে কীর্তনবিলাস অন্তে নিত্যানন্দের অভিষেক রাজোচিতভাবে সম্পন্ন হল----

রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সর্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদ-গণ লৈয়া।।
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত।।
হেন মতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে।।
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।।
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি' মিলিলা সত্বরে।।
সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর।।
যাহারে কহেন---বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা-প্রিয়তম।।
....
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন।।
'ত্রাহি ত্রাহি, সবেই বলেন বাহু তুলি'।
কা'রো বাহ্য নাহি, সবে মহা-কুতূহলী।। শ্লোক ২৫২-২৭৫।। অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দ চারিদিকে প্রেমবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। তাঁরই ইচ্ছা অসময়ে রাঘবের গৃহে জম্বিরের গাছে কদম্ব ফুল ফোটান এবং তাঁর ইচ্ছাতেই ফুটল সেই ফুল। অলৌকিক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর সেই ঘটনা—

স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি করি' চারি দিকে চায়॥
আজ্ঞা করিলেন,—"শুন রাঘবপণ্ডিত!
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প-প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥"
কর-যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে॥"
প্রভু বলে,—"বাড়ী গিয়া ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়ে বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়ে চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি' মহা-অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল॥
কি অপূর্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ববন্ধ॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-হরষিত॥
আপনা' সম্বরি' মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে॥
কদম্বের মালা দেখি' নিত্যানন্দরায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি' মহা-অনুভব॥ শ্লোক ২৭৬-২৮৭॥ অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দ রহস্যপূর্ণ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করলেন—

সবার বচন শুনি' নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বলে,—'শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥ শ্লোক ২৯২-২৯৩॥ অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দ সকলকে কৃষ্ণগান গাইতে বললেন। ভাগবত বর্ণিত গোপিকাদের প্রেম নিত্যানন্দের কৃপাতেই সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হল—

এতেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি॥"
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে॥"

এত কহি' 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
সর্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
আবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে॥
শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্বজগতেরে ভক্তি॥
যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে॥ শ্লোক ২৯৮-৩০৩॥ অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দের অভিষেককালে তাঁর ভক্তদের ব্রজবালকদের মতো চঞ্চলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কবি বৃন্দাবনদাস এখানে তার বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
....
নিত্যানন্দ-স্বরূপের ধরিবারে ধায়।
হাসে' নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥ শ্লোক ৩০৪-৩১৫॥ অন্ত্য, ৫ম

নিত্যানন্দের কৃপাতেই সমস্ত পারিষদগণের দেহে শক্তি অধিষ্ঠান হল—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবারে হইল সর্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান॥
সর্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার॥
সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সে-ই হয় বিহ্বল পাসরিয়া॥ শ্লোক ৩১৬-৩১৮॥ অন্ত্য, ৫ম

সমস্ত অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ই নিত্যানন্দ মহিমায় পরিপূর্ণ। নিত্যানন্দ সংকীর্তন বিহার, নিত্যানন্দর গঙ্গাতীরে সপ্তগ্রামে বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, সেখানে সমাজের অবহেলিত-পতিত বণিককুলকে উদ্ধার করা এবং বিষ্ণুদ্রোহী যবনকে আশ্রয়দান, প্রেমোন্মাদ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের মিলন এবং উভয়ের কৃষ্ণকথা আলাপন, নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে নিত্যানন্দের আগমন, কীর্তনবিহার, নবদ্বীপকে মথুরানগরী করে তোলা, দস্যু দম্পতি ব্রাহ্মণের পুত্রের কাহিনীর মধ্যে নিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ ইত্যাদির বর্ণনা করে সমস্ত নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন কবি। বিশেষভাবে নিত্যানন্দের মহিমাকে প্রকাশ করবার জন্যই যেন কবি অন্ত্যখণ্ডে এই পঞ্চম অধ্যায়ের উপস্থাপনা করেছেন। নিত্যানন্দের আলোড়নে ভূকম্পন, ইন্দ্রের ঝড়-বৃষ্টি আনয়নের দ্বারা নিত্যানন্দের সেবা, দস্যু সেনাপতি দ্বারা নিত্যানন্দের স্তব, পাপীকে কৃষ্ণনামে আসক্ত করানো এবং সমাজের পতিত উদ্ধারের ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সমগ্র

অধ্যায়টি কবি যেন নিত্যানন্দের মহিমাকেই নিবেদন করেছেন। এই অধ্যায়ে তাই নিত্যানন্দ পার্ষদ-ভক্তগণদের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। রঘুনাথ বৈদ্য, গদাধর দাস, সুন্দরানন্দ, পণ্ডিত কমলাকান্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বলরাম দাস, জগদীশ পণ্ডিত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, দ্বিজ কৃষ্ণদাস, সদাশিব কবিরাজ ও তৎপুত্র পুরুষোত্তম দাস, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পরমানন্দ উপাধ্যায়, গঙ্গাদাস, আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (রঘুনাথ পুরী), আচার্য কৃষ্ণদাস, আচার্য মাধবানন্দ, গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শ্রীজীব পণ্ডিত প্রভৃতি চৈতন্যভাবরসমুগ্ধ নিত্যানন্দভক্তবৃন্দের উল্লেখ করে বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দ ছিলেন নিত্যানন্দের বিশেষ প্রিয়ভাজন এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে শেষ ভৃত্য হলেন নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস স্বয়ং—

> নিত্যানন্দ-প্রিয়—মনোহর, নারায়ণ।
> কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন॥
> ....
> সর্বশেষ ভৃত্য তা'ন—বৃন্দাবনদাস।
> অবশেষপাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত॥ শ্লোক ৭৫২-৭৫৭॥ অন্ত্য, ৫ম

অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বিলাসলীলার বর্ণনা। নিত্যানন্দের অলঙ্কার সাজসজ্জা দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন সন্ন্যাসী হয়ে কেন তাঁর মণিমুক্তার বেশ ধারণ—

> সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম॥
> অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলেবর।
> কর্পূর-তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর॥
> . ...
> নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
> কিছু ত' না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ॥
> সন্ন্যাস-আশ্রম তা'ন বলে সর্বজন।
> কর্পূর-তাম্বুল সে ভোজন সর্বক্ষণ॥
> ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
> সোনা, রূপা, মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥
> কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
> ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
> দণ্ড ছাড়ি' লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
> শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে॥
> শাস্ত্র মত মুঞি তা'ন না দেখোঁ আচার।
> এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥

'বড়লোক' বলি' তাঁ'রে বলে সর্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু, কহ শ্রীবদনে॥ শ্লোক ৫-২৩॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

মহাপ্রভু বিপ্রকে বোঝালেন যে নিত্যানন্দ মহা অধিকারী বলেই, তিনি রুদ্রের মতো বিষ পান করলেও তাঁর কিছু যায় আসে না, পদ্মপত্রে জলের মতোই নিত্যানন্দের চরিত্র স্বভাবতই নির্মল--

শুনিঞা বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর॥
"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তা'ন দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে করে বিষ-পান॥ শ্লোক ২৫-৩১॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দ-নিন্দুকদের কোনো অভিযোগই সত্য প্রমাণ হয় না—

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তা'ন কর্ম্ম।
নিজ-দোষ সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥ শ্লোক ৩৪-৩৫॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

গৌরচন্দ্র বিপ্রকে আরও বললেন—

যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥ শ্লোক ১২২-১২৩॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দের প্রতি সমস্ত দ্বিধা ছাড়তে পরামর্শ দিলেন গৌরচন্দ্র। সেই বিদ্বেষী বিপ্র নবদ্বীপে এসে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন॥

নিত্যানন্দ-প্রতি তার জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি' নবদ্বীপে।
সর্ব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥ শ্লোক ১২৫-১২৭॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

এরপর নিত্যানন্দ চরিত্রের স্বরূপের বর্ণনা করেছেন কবি—

হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁ'রে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র॥
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যর কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥ শ্লোক ১২৯-১৩৪॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দ সঙ্গীরা নবদ্বীপে নৃত্য,গীত ভজন করলেন—

হেন মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন॥
গোপশিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে॥ শ্লোক ৬-৮॥ অন্ত্য, ৭ম

অতঃপর নিত্যানন্দ নীলাচলে এলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নামে ভাবাবিষ্ট হয়ে পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করতে লাগলেন—

আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে॥
কমলপুরেতে আসি' প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন হুঙ্কার॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে॥

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি' ভক্তবৃন্দ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র॥ শ্লোক ১৪-১৯॥ অন্ত্য, ৭ম

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতি করলেন—

প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর॥
শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বলিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দ মতি॥
মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য''—বলে গৌরচন্দ্র॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি'।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি॥ শ্লোক ২০-২৫॥ অন্ত্য, ৭ম

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ পরস্পরকে প্রেম সম্ভাষণ করলেন—

ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন॥

....

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি'।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥ শ্লোক ৩০-৩৯॥ অন্ত্য, ৭ম

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের যে অলঙ্কার তা নবধা ভক্তি স্বরূপ এবং সমাজের নীচ-পতিতের ত্রাণকর্তা নিত্যানন্দ, সেকথা বলেছেন কবি—

স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কাসা-রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছে নিজ-সুখে॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা' হৈতে হৈল এবে সবার মোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে॥ শ্লোক ৪০-৪২॥ অন্ত্য, ৭ম

নিত্যানন্দের মহিমা বোঝার ক্ষমতা ক'জনের আছে—

তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কা'র।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥

....

তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥ শ্লোক ৪৪-৪৮॥ অন্ত্য, ৭ম

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে যেভাবে চালাচ্ছেন, তিনি সেভাবেই চলেছেন। মুনিধর্ম ছেড়ে নিত্যানন্দকে তিনি সংসারী করালেন। এই অংশে তাই বর্ণিত হয়েছে—

তাড়ু খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা, ছান্দ, দড়ি,
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ ভক্তি আচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারী জনে সে সকলে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপ।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষ দ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম॥ শ্লোক ৫৪-৫৮॥ অন্ত্য, ৭ম

নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দের ভৃত্যগণ যে ব্রজে নিত্যসিদ্ধ পরিকর তার বর্ণনা দিলেন বৃন্দাবনদাস—

যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥
সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠী-ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥"
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ, অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিবে তা'র অন্ত॥ শ্লোক ৬৮-৭২॥ অন্ত্য, ৭ম

নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনকালে চৈতন্য-নিত্যানন্দের মিলন হল। নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন ও মহাভাব লীলাতে ভাবাবিষ্ট হলেন। ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের যে সুন্দর-নিপুণ কথাচিত্র এঁকেছেন কবি তা অনুপম--

নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
জগন্নাথ দেখি' মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই' গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন।
সবা' দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃ-পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিঞা॥
নিত্যানন্দ দেখি', যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস॥ শ্লোক ১০৩-১০৯॥ অন্ত্য, ৭ম

ভাববিহ্বল নিত্যানন্দের সঙ্গে শিষ্য গদাধরের মিলনদৃশ্যটিও বড়ো করুণ-কোমল—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ শ্লোক ১১৭-১১৮॥ অন্ত্য, ৭ম

নিত্যানন্দ-নিন্দুকের মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন গদাধর—

গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দুকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিতগোসাঞি॥ শ্লোক ১২৪-১২৫॥ অন্ত্য, ৭ম

নিত্যানন্দ গৌড়দেশ থেকে যে তণ্ডুল এনেছিলেন তা দিয়ে গোপীনাথের ভোগ প্রস্তুত হল—

"গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥"

তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত' এমন তণ্ডুল দেখি' নাঞি॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া॥ শ্লোক ১৩১-১৩৩॥ অন্ত্য, ৭ম

গৌরচন্দ্র এলেন গদাধরের গৃহে—

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥"
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর॥ শ্লোক ১৪২-১৪৮॥ অন্ত্য, ৭ম

নীলাচলে গৌরাঙ্গ গদাধর ও নিত্যানন্দ একত্রে অবস্থিতি করছেন—

তিনজন একত্র থাকে নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীর্তনে॥ শ্লোক ১৬৪-১৬৫॥ অন্ত্য, ৭ম

নীলাচলে অদ্বৈতের আগমনবার্তা শ্রবণে মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ-গদাধরাদি তাঁকে অভিনন্দিত করতে অগ্রসর হলেন—

"আইলা অদ্বৈত' শুনি' শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি॥ শ্লোক ৫৪॥ অন্ত্য, ৮ম

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কোলাকুলি বর্ষিত হল—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি।
নাচে দুই মত্তসিংহ হই' কুতূহলী॥[৭] শ্লোক ৮৬॥ অন্ত্য, ৮ম

বৃন্দাবনদাস এই গ্রন্থে নিজেকে সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ অনুগৃহীত এবং তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' কাব্যকে নিত্যানন্দের কৃপার ফসল বলে বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দের বাল্যলীলা, তীর্থভ্রমণ, নবদ্বীপে অবস্থানকালের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, নীলাচল হতে গৌড়দেশে প্রত্যাগমন ও তাঁর অভিনব ধর্মপ্রচার, নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্যদের পরিচয় ইত্যাদি আখ্যানসমূহ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সুতরাং নিত্যানন্দের জীবনী রচনায় চৈতন্যভাগবতই প্রধান অবলম্বন। তবে নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ক কাহিনী সংগ্রহে অন্য গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন। এই গ্রন্থটি হল—নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'। সেখানে নিত্যানন্দের বিবাহ-কাহিনী বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। তবে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিত্যানন্দের স্ত্রী-পুত্র'র বর্ণনা পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবত' একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থ। চৈতন্যের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব সমাজের বহুবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের তৎকালীন চিত্র পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় তথ্যের সমাবেশ গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সেই কারণেই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবভক্ত সমাজে এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট আদৃত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ঃ লোচনদাস— বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পর রচিত হয় লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। গ্রন্থটি সম্ভবত ১৫৫০-৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। যে কবিই চৈতন্যজীবনী লিখুন না কেন, চৈতন্য জীবনকথার সঙ্গে সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট নিত্যানন্দ জীবন প্রসঙ্গ তাঁকে লিখতেই হবে। কেননা চৈতন্য জীবনের প্রথম পর্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ অধ্যায়ের সঙ্গে যেমন নিত্যানন্দের অচ্ছেদ্য যোগ, ঠিক তেমনি চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের পরে এবং চৈতন্য তিরোভাবের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং চৈতন্যতত্ত্ব প্রসারের সর্বাধিক কৃতিত্ব নিত্যানন্দের। জীবনীকার লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে সাধারণ ভাবে চৈতন্য জীবনচিত্রণের ঐতিহাসিক ক্রমরক্ষা অপেক্ষা গৌরনাগর ভাব ও গৌর পারম্যবাদের আলোকেই গৌরাঙ্গ জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবনদাস যেভাবে তাঁর চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ জীবনদর্শন এবং নিত্যানন্দ-তত্ত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ আবির্ভাবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ও দার্শনিক উপযোগিতার বিশেষ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলেন, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে নিত্যানন্দ সেরূপ দার্শনিক গভীরতায় আসেননি। জীবনীসূত্রে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ-কেন্দ্রিত কাহিনীগুলিকে কবি বর্ণনা করেছেন মাত্র। কেননা লোচনদাসের দার্শনিক অভিপ্রায় ছিল গৌরনাগর ভাবের বর্ণনা। সেখানে গৌরাঙ্গ-রূপমাধুরী বিলসিত নদীয়ানাগর সমাজের বর্ণনায় কবি যতটা উচ্ছ্বসিত, অবধূত নিত্যানন্দের পরবর্তী গৃহীজীবন যাপনের অথবা পূর্বজীবনের খেয়ালী প্রেমময় জীবনযাত্রা বর্ণনায় ততটা উচ্ছ্বসিত নন। শ্রীনিত্যানন্দের গৃহীজীবন লোচনকে বিশেষ অভিভূত করেনি।

তথাপি লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আমরা নিত্যানন্দের যে বিস্তৃত মূল্যায়ন পাই তার গুরুত্বও কম নয়। চৈতন্যমঙ্গলের বন্দনাংশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দকে একই সঙ্গে বন্দনা করেছেন কবি—'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ' বলে। 'রোহিণীসুত' নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ সঙ্গী যত ভক্ত জন তাঁদেরও বন্দনা করেছেন কবি—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি' কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
করুণা-ভরণ সব হেম-গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
ওপদ-শীতল বা' লাগুক কলেবরে॥
শচীর দুলাল প্রভু করোঁ পরণাম।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি-দেবশিরোমণি।
যাঁর পদ পরসাদে ধন্য এ ধরণী॥
বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাণনাথ।
করুণা করহ প্রভু করোঁ যোড়হাত॥
অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দরাম বন্দোঁ রোহিণীর সুত॥
গোরা-গুণ-গরবে গর্গ মাতোয়ার।

....

আগে আশীর্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ,
তবে সে গাইব গুণ-গাথা॥
মো ছার অধমাধম কি জানিমু তত্ত্ব।
গোরা গুণ-চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব॥
না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ। পৃ. ৩

অতঃপর লোচন নিত্যানন্দ দর্শন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন—

তবে ত কহিব কথা অপূর্ব কথন।
যে মতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন॥ পৃ. ৫

'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিত্যানন্দ বলরাম অবতার—

শেষ বলিয়ে যারে, শিরে সব সংসারে,
সে আজু নিতাই নাম ধরি॥
প্রেমরসে গরগর, না চিনে আপনা-পর,
সভারে বুঝায় এই কথা।
পদতল-তাল-ভরে, ধরণী টলমল করে,
যেন মদমত্ত হাতী মাতা॥ পৃ. ৬

সূত্রখণ্ডে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের মিলনকে হরিদাস ঠাকুর ও চৈতন্য মহাপ্রভুর মিলনের তুল্য সমগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লোচন নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলেই গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থারম্ভে লোচনদাস চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে বললেন, কলিযুগের ধর্ম সংকীর্তন। সেই সংকীর্তন প্রকাশ এবং 'পরম পিরীতির' প্রচারের জন্যই বিষ্ণু কাত্যায়নীকে তাঁর গৌর অবতার গ্রহণের কথা জানালেন—

কলিযুগবিশেষে, সঙ্কীর্ত্তন-পরকাশে,
হব আমি মনুজ-মূরতি।
তনু হ'ব হেম-গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব পরম পীরিতি॥ পৃ-১৭

সমস্ত অনুচরেরাই গৌর অবতারের সঙ্গী হলেন। বলরাম গৌরাঙ্গের আপন অঙ্গস্বরূপ বলেই তিনি হলেন 'সাঙ্গ'।

সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর।
সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার॥
অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঞি সে 'উপাঙ্গ'॥ পৃ. ২১

নারদ মুনিকে বিষ্ণু জানালেন কলিযুগের নিস্তারের জন্য এবং নিজ ভক্তিরস প্রচারের জন্য তিনি নদীয়া সমাজে জন্ম নেবেন—

আর অপরূপ শুন কলিযুগ-মর্ম।
আশ্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তনধর্ম॥ পৃ. ২৪

তবে অনন্তের অংশীভূত একাদশ রুদ্রবংশের অন্তর্গত তাঁর সহোদর বলরাম যাকে মহেশ আপনি সেবা করেন, তাকে অবতার রূপ গ্রহণের কথা জানাতে হবে, তাই নারদকে ভার দেওয়া হল তিনি যেন রেবতীর সঙ্গে জলবিহারে রত বলরামকে নিত্যানন্দ নাম নিয়ে জন্ম নিতে বলেন।

পুনঃ জনমিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-সংসার,
আচরিয়ে এই প্রেমভক্তি॥
ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
জনমিব নদীয়া-সমাজ॥
পৃথিবী চলহ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
বলরাম নাম সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥
রেবতী-রমণী-সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে,
ক্ষীরজলনিধি-মহী-মাঝে।
যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
আগে করি---করি নিজ কাজে॥
চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
কহিও করিয়া পরবন্ধ।
নিজ নিজ অংশ লঞা, পৃথ্বিতে জন্ম গিয়া।
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ॥
আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,
হিয়াসুখে বোলে হরিবোল।
কহয়ে লোচনদাস, এ দোঁহার সম্ভাষ,
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল॥ পৃ. ৩০

কলিযুগের ধর্মলেশহীন পাপে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে অধর্মবিনাশ হেতু প্রভু অবতার রূপ নেবেন বলে জানালেন। নারদ এই অবতার সংবাদ জানাবার জন্য শ্বেতদ্বীপে প্রভু বলরামের কাছে অবস্থান করলেন। এই বলরামকে সহায় করেই কৃষ্ণ যুগে যুগে অবতার হন---

সেই বলরামরায়, যুগে যুগে সহায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদলীলা,
করি করে অসুর-সংহার॥

সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পীরিতি।
আদ্য, মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক ফণার ধরি রহে ক্ষিতি।। পৃ. ৩২

এবং কবি আরও বললেন—

জয় জয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী।।

সুতরাং বলরাম নিত্যানন্দ অবতার রূপ গ্রহণে স্বীকৃত হলেন। নিত্যানন্দকে কবি বললেন—'নিত্য আনন্দ কন্দ সহজ স্বরূপ'। নিত্যানন্দের জন্ম বিবরণ, পিতামাতা, বংশপরিচয় প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে দিলেন কবি লোচনদাস—

নিত্য আনন্দকন্দ সহজ স্বরূপ।।
এক অংশে যাঁহার সহস্র ফণা ধরে।
এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে।।
পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে—পরমানন্দ নাম।।
পিতা মাতা নাম থুইল—কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস-আশ্রমে—নিত্যানন্দ সুচরিত।।
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথিবী-জনম নৈলা পরম-হরিষে।। পৃ. ৩৩

কবি তাঁর গ্রন্থে মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপের মাটিতে নিত্যানন্দের আগমন বর্ণনা করলেন—

হাসিয়া কহিল প্রভু—শুন অদভূত।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত।।
তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্য ভাগ্য আজি দেখিব চরণে।।
হেন রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ—কোথা আছে নিত্যানন্দ।।
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণে চাহিল।।
বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার।
পাদাম্বজ-সন্নিকটে আইলা আর-বার।।

নিত্যানন্দের মহিমা তত্ত্বকে ব্যাখ্যাতীত ঘোষণা করে প্রভু স্বয়ং তাঁর চরণ দর্শনকে বড় পুণ্য ভাগ্য বলে ঘোষণা করলেন। প্রভুর নির্দেশে নারায়ণ, মুরারি, মুকুন্দ প্রমুখেরা নিত্যানন্দের অন্বেষণে গ্রামের দক্ষিণে যাত্রা করলেন; কিন্তু নিত্যানন্দকে কোথাও খুঁজে পেলেন না—

করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে—
বিচার করিয়া প্রভু না পাইল লাগে।।
পুনরপি কহে প্রভু—শুন সর্ব্বজন।
বিচার করহ সভে আপন-আশ্রম।।
প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সত্বর।
একে-একে সভে গেলা আপনার ঘর।।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া।
প্রভুবিদ্যমানে সভে মিলিলা আসিয়া।। পৃ. ১১০

পরে গৌরাঙ্গের সঙ্গে অবধূত নিত্যানন্দের মিলন হল। লোচনদাস শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে সে মিলনদৃশ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

পথে যাইতে 'মুরারি' ডাকে পহুঁ।
না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে নহু।।
নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয়।
আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয়।।
এ বোল শুনিঞা সবে হরষিত হঞা।
চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া।।
পথে যাইতে ঘনঘন হরি-হরি বোলে।
গণ্ড পুলকিত-কণ্ঠ গদগদ রোলে।।
নয়নে গলয়ে নীর সাত-পাঁচ-ধারা।
চলিতে না পারে প্রেমে সোনার কিশোরা।।
ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর হেন উলটি না চায়।।
নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার—আনন্দ উন্মাদ।।
এইমনে আনন্দে-সানন্দে চলি যায়।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দ রায়।।

আরক্ত গৌরাঙ্গকান্তি পরম-সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শির লটপটি পাগ চম্পকের আভা॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝন শুনি।
কুরঙ্গী-নয়নী-চিত্ত-তরল-সন্ধানী॥
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে॥
মেঘ জিনি গরজে গম্ভীরশব্দ শুনি।
কলি-মত্তহাথীর দমন সিংহধ্বনি॥
মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর॥
পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগি।
কম্প-স্বেদ-আদি ভাবে রস-অনুরাগী॥—ইত্যাদি। পৃ. ১১১

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ শচী ও নিত্যানন্দের মিলনে বাৎসল্যরসের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে সেকথা বর্ণনা করেছেন তিনি। নিত্যানন্দকে দেখে শচীদেবীর বিশ্বরূপের স্মৃতি জাগরিত হল এবং নিত্যানন্দকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন তিনি। নিত্যানন্দও শচীদেবীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করলেন। মাতা-পুত্রের মিলনের বর্ণনায় অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন কবি—

নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াইল নয়ান।
পিরিতি-পাগল হঞা নেহারে বয়ান॥
প্রভু বোলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা—শচীদেবী কহে॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রুনেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বোলে মধুরবচনে॥

যে কহিলে মাতা তুমি—সব সত্য হয়।
তব পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয়।।
পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা।
তব পুত্র বটি মুঞি—জানিবে সর্ব্বথা।।
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল—গদ্‌গদ বাণী।।
এইমতে স্নেহরসে সভে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াইল অন্তর।। পৃ. ১১২

এরপর গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দকে নিয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে গেলেন। সেখানে নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করালেন। প্রভুর একই অঙ্গে তিন অবতারের মূর্তি দেখালেন—রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ—

আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাঁহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল।।
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই।।
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গেলা ভগবান্।
শ্রীবাস-অঙ্গনে গেলা প্রসন্ন-বয়ান।।
দেবালয় প্রবেশিয়া বৈসে দিব্যাসনে।
কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে।।
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ ন্যাসিবর।
সাদরে নিরিখে বিশ্বম্ভর-কলেবর।।
তত্ত্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাঁহার।
কি কাজ কহিল প্রভু ইঙ্গিত-আকার।।
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর।।
সবজন হও এই মন্দির বাহিরে।
মন্দির বাহির হইল আজ্ঞা পালিবারে।।
অবশেষ কথা কি কহে আপনার।
নিভৃতে কহয়ে মর্ম কে জানিবে তার।।
কহিল—আমারে এই দেখহ আপনে।
আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রমে।।

ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ তবে।।
দেখিয়া ঐছন রূপ—অতি অদভুত।
পূর্ব স্মঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত।।
দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা।।
রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্য তনু।
পশ্চাৎ দেখিল—নব-কৈশোর রাধাকানু।।
হরিষে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার।
দিগবিদিগ নাহি—প্রেমের পাথার।। পৃ. ১১৩

স্বরূপত বলরাম অবতার বলেই তিনি মধুমত্ত, তদুপরি তিনি অলৌকিক বাল্যস্বভাব। নিত্যানন্দ সেখানে গৌরাঙ্গ মিলনকে 'চোরধরা' বলে ব্যাখ্যা করলেন। নিত্যানন্দ বালস্বভাব, উন্মত্ত গতি, কলিদর্প-দমন এবং পতিত উদ্ধারক। পাষণ্ডী দুরাচার মূঢ়জন যে যেমনই হোক নিত্যানন্দের সে প্রেম ফাঁদে না পড়ে কারুর উপায় নেই। লোচনের এটিই হল প্রভু নিত্যানন্দ-মূল্যায়ন। গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মিলনে জন্ম নিল অপূর্ব সংকীর্তনরস। ভক্তরা নিত্যানন্দ সংগমের প্রেমস্থল হয়ে পড়ল।

লোচনদাস নিত্যানন্দের মূল্যায়ন করলেন এইভাবে—(ক) নিত্যানন্দ অনুপম। তাঁর প্রেমভক্তি অসামান্য। (খ) জ্ঞানমার্গ থেকে তিনি উপনীত হয়েছেন ভক্তিমার্গে। শচীদেবী নিত্যানন্দের প্রতি প্রীতিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন। বাৎসল্য রসাশ্রিত শচীর পুত্রস্বরূপ হয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ প্রথমে গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝতে না পারলেও মহাপ্রভু তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়ে নিত্যানন্দকে পূর্বস্বরূপের পরিচয় দেওয়ালেন। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের একাঙ্গ অবতার দেখে নিত্যানন্দ প্রেমপ্লাবিত হয়ে গেলেন।

তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
প্রভুবিদ্যমানে তেহোঁ করিলা বিদায়।।
তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর।
প্রেম পালটিতে নারে—গেলা বহুদূর।।
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূত রায়।
প্রভুবিদ্যমানে তেহোঁ করিলা বিদায়।। পৃ. ১১৫

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ তাঁর কৌপীন সকল ভক্তগণকে ছিঁড়ে এক খণ্ড এক খণ্ড করে দিলেন, নিত্যানন্দের সেই প্রসাদী কৌপীন সকল ভক্তগণ মস্তকে বাঁধলেন—

বিদায় সময় প্রভু কহে এক বাণী—।
এ সভারে দেহ ত কৌপীন একখানি।।

প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত।
সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভূত।।
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া।
নিজ ভক্তজনে দিল সভারে বাঁটিয়া।।
কৌপীন প্রসাদ তাঁরা পাইয়া কৌতুকে।
আনন্দ করিয়া সভে বান্ধিল মস্তকে।। পৃ. ১১৫

কবির এর পরের বর্ণনায় নিত্যানন্দের অদ্বৈত-হরিদাস মিলন—শ্রীনিবাসের ঘর থেকে নিত্যানন্দ এসে বিশ্বম্ভরের অপরূপ বিষ্ণুকৃষ্ণমিলিত রূপ দেখলেন। সুতরাং লোচনদাসের নিত্যানন্দ বলরাম অবতার হলেও তিনি কিন্তু প্রথমত নিজের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। গৌরাঙ্গের অলৌকিক ভাবতনু দর্শন করে তিনি স্বরূপে স্থিত হলেন। তখন অপূর্ব প্রেমমহাধন-নিধির আবেশ ঘটল নিত্যানন্দের মধ্যে। নিত্যানন্দ গেলেন অদ্বৈত আচার্যের ঘরে। সেখানে উভয়ের নৃত্যরত মিলন অপূর্ব আনন্দ সাগরে তরঙ্গ তুলল। উভয়ে গৌরাঙ্গের গুপ্তচরিত আলোচনা করলেন। নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে কবি বারবার প্রয়োগ করেছেন 'প্রেমানন্দ' শব্দটি। গৌরাঙ্গের নির্দেশে নিত্যানন্দ গৌর-অনুগামীদের কৌপীন প্রদান করলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গ আপন প্রেমধর্ম প্রচারের সাংগঠনিক দায়িত্ব যে ভবিষ্যতে নিত্যানন্দকেই অর্পণ করবেন তার ইঙ্গিত আছে এখানে। নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে রাত্রিদিন গৌরাঙ্গের কথা আলোচনা করলেন। লক্ষণীয় যে 'কৃষ্ণকথা' নয়, নিত্যানন্দ কিন্তু বলেছেন গৌরাঙ্গকথা। কৃষ্ণভক্তি প্রেমরস নয়, গৌরাঙ্গ ধর্ম, গৌর ভক্তিই নিত্যানন্দের একমাত্র অন্বিষ্ট। গৌরভক্তদের মধ্যেও নিত্যানন্দের যে বিশেষ স্থান ছিল লোচনদাস তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা অন্যান্য গৌরভক্তগণ যথা শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি প্রমুখ যাঁরাই থাকুক না কেন, নিত্যানন্দের আগমন মাত্র জয়ধ্বনি উতরোল হয়ে ওঠে। প্রেমানন্দ বয়ে যায়, যা সমবেত ভক্তজনের মিলিত উচ্ছ্বাসে হয় না। একা নিত্যানন্দ তা দিতে পারেন। গৌর-নিতাই-এর মিলনে উল্লসিত প্রেমানন্দ দেখে মনে হয় যেন অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের মিলন হল। গৌরাঙ্গ যে নিজেই তাঁর পরিকরমণ্ডলীর মধ্যে নিত্যানন্দের বিশেষ স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন, তা লোচনদাস আরও একবার বোঝালেন—যখন গৌরাঙ্গ সমস্ত সভাসদকে নির্দেশ দিলেন নিত্যানন্দের পাদ প্রক্ষালন করে তাঁর পাদোদক গ্রহণের জন্য, যা পান করলে পরম প্রেমানন্দ লাভ হবে। এই অভূতপূর্ব সম্মানে নিত্যানন্দের নয়নে অশ্রু ছলছল। নিত্যানন্দকে আশ্রয় করেই গৌরাঙ্গাশ্রিত প্রেমানন্দ লহরী বিকশিত হয়ে উঠল। কবি বললেন—

নদীয়ামাঝারে ওকি ও না অপরূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে বড় অপরূপ।।
কি আরে রে হয়।।

হেনরূপে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পাশরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর।।
স্বতন্ত্র হইয়া হ'য়ে ভকত-অধীন।
সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন।।
লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলক্ষিত।
তাঁর নিজজন জানে তাঁহার ইঙ্গিত।।
শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায়—বাঢ়ে প্রেমানন্দ।।
আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়।
হেনকালে আইলা পুনঃ অবধূতরায়।।
অবধূত আইলা বলি' পড়ে জয় জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল গায়।।
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরিহরি-ধ্বনি শুনি' অবশ অন্তর।।
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ দুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া।।
পুলকিত সব অঙ্গ—আপাদ-মস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক।।
বক্র গ্রীবা দু-ভিত নেহালে রাঙ্গা আঁখি।
ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি।।
এইমত শত শত লোক পাছে ধায়।
আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায়।।
নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে—প্রেমে গরগর।।
দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ-নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে অথির-শরীর।। পৃ. ১১৬-১১৭

লোচনের ভাবনেত্রে গৌর-নিতাইয়ের প্রেমনৃত্যের আনন্দ আর কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে ক্রীড়ারত শিশুগণের প্রেমানন্দ অভিন্ন হয়ে গেছে।

আনন্দে নাচয়ে দুঁহে সঙ্গে নিজজন।
কৃষ্ণ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগণ।। পৃ. ১১৭

গৌরাঙ্গ হরিনাম সংকীর্তনকে 'কলিযুগ ধর্ম' বলে নির্দেশ করে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সমস্ত ভক্তজনকে নিয়ে নগর পরিক্রমা করে কীর্তন রসাল পরিবেশন করবেন। নিত্যানন্দ

ছিলেন এই সংকীর্তনে প্রধান সঙ্গী। জগাই-মাধাই উদ্ধার এই পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিত্যানন্দ আহত হন, এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হন গৌরাঙ্গ। তাঁর বসন দিয়ে নিত্যানন্দের রক্তাক্ত জর্জরিত আঘাতকে আবৃত করেন। লোচনদাস এখানে নিত্যানন্দের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। এইভাবে যদি নিত্যানন্দের প্রেমময় শরীরের রক্ত স্পর্শ করে পৃথিবীর মাটি, তবে অমঙ্গল হবে। নিত্যানন্দের আঘাতে ব্যথার্ত গৌরাঙ্গ সুদর্শনকে স্মরণ করলেন--

ক্রোধ করি' সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি।
দাণ্ডাইলা সুদর্শন করযোড় করি'॥
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর॥
প্রভু বোলে জগাই-মাধাইরে সংহার।
নিত্যানন্দ মারি' ব্যথা দিলেক অন্তর॥
শুনি' সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই-মাধাই-পানে চলিলা ধাইয়া॥
দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—তরাসিত মন॥ পৃ. ১২০

গৌরাঙ্গের সুদর্শন দেখে নিত্যানন্দ হেসে বললেন---গৌরাঙ্গের পতিত উদ্ধার ঐশ্বর্যের দ্বারা নয়, পতিত উদ্ধার হবে করুণার দ্বারা। এরপর জগাই-মাধাই নিজ পাপ-কর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে নিত্যানন্দের পদতলে পড়ে। নিত্যানন্দ তাদের তুলে নিয়ে তাঁর কোলে আশ্রয় দিলেন—

সুদর্শন দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু হাসে।
কি করিল ভগবান্ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন
দীনহীন পতিত পামর দুষ্টজন॥
জগাই মাধাই তারি' দীনবন্ধু হব।
পতিতপাবন-নামের গরিমা রাখিব॥
ইহা বলি' নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভুপদে বিনয় করিয়া—॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।
পতিতপালন-নাম থাকুক ব্যাখ্যান॥ পৃ. ১২০

তিনি প্রেমময় গৌরাঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দিলেন গৌর অবতারের বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রেম ও করুণার দ্বারা পতিত উদ্ধারই তো গৌরচরিতের মূল ধর্ম। সুতরাং নিত্যানন্দ এখানে গৌরাঙ্গকে মূল ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে তাত্ত্বিক প্রয়োজনকে রক্ষা করলেন,

আপন চরিত্রধর্মের মহত্ত্বেরও পরিচয় দিলেন। তিনি গৌরাঙ্গের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন, জগাই-মাধাই নামক দুই পতিত উদ্ধারের। তবে নিত্যানন্দ মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য মিলিয়ে দৈত্য সংহারের কথাটিও এই প্রসঙ্গে বলে দিলেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের বশ—শুধু এই যথেষ্ট নয়, যে একবার নিত্যানন্দের নাম করবে সে গোবিন্দের নিজের লোক হয়ে যাবে। লোচনের কাব্যে এইভাবে নিত্যানন্দকে বরণীয় স্থান দেওয়া হয়েছে।

গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ স্বরূপত একাঙ্গ—একথা বোঝানোর জন্য গৌরাঙ্গ নিজে হলায়ুধ রূপ ধারণ করলে, তখন মহাপ্রভু সেই অপরূপ বলরাম রূপদর্শন করে—

সকল বৈষ্ণবজন আনন্দে বিহ্বল।
বলরাম-প্রেমে সভে করে টলমল।। পৃ. ১৫৭

সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিত, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রামাই-এর সঙ্গে নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন—

আমি আর গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রামাই।।
জানিবে আমার দেহ এসব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে রাখিব হিয়াতে।। পৃ. ১৫৭

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে বিচলিত—

গৌরাঙ্গ গোলোকে যায়—কি হবে রে বাপ।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বোলে বীরদাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে।। পৃ. ১৫৭

গোধন চারণে রত এক শিশু যার নাম ছিল হরি, নিত্যানন্দ তাকে আহ্বান করলেন। গৌরাঙ্গ সেই বালক হরির মধ্যে হরির নাম শুনে ধন্য হলেন। নিত্যানন্দকে নদীয়ার সমস্ত ভক্তজনের দায়িত্ব দিয়ে মহাপ্রভু জানালেন তিনি অদ্বৈত আচার্যের ঘরে আসবেন। নিত্যানন্দ নদীয়ায় গিয়ে গোরার বিরহ দুঃখ-বিবশ নবদ্বীপবাসীকে শক্তি দিলেন। কিন্তু তারা যে তখন গোরাবিরহে উন্মত্ত। পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে নিত্যানন্দ জানালেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে পুত্রের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। নিত্যানন্দের কাছে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ শুনে পীড়িত হলেন—

নিত্যানন্দ-অঙ্গ হেলিয়া রহিলা।
অঝোর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা।।
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি।
শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি।।
শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল।
দেখা দিব সভাকারে—এই সত্য কৈল।।

কহয়ে লোচনদাস কাতর-হিয়ায়।
তবে প্রভু গোরাচাঁদ করিলা বিজয়॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে চলি' যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায়॥
নবদ্বীপ যাহ তুমি—শুনহ বচন।
নদিয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন॥
সভারে কহিও মোরে 'নারায়ণ'-বাণী।
অদ্বৈত-আচার্য-ঘরে উত্তরিব আমি॥
সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্রে হইবে দেখা আচার্য্যের ঘরে॥ পৃ. ১৫৯-১৬০

এরপরের বর্ণনায় কবি মহাপ্রভুর নীলাচল গমন ও নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গ লীলা, নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড তুলে দিলেন মহাপ্রভু। কিন্তু নিত্যানন্দ সহ্য করতে পারলেন না, সন্ন্যাস প্রতীক দণ্ড ভেঙে ফেললেন—

সে হেন সুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্য-মোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড—সহিব কেমন॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।
জন্মাবধি রহিল দারুণ এই ব্যথা॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাঢ়িল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন থুঞা দণ্ড উরূর উপর॥
ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা জলে। পৃ. ১৬৫

মহাপ্রভু দণ্ড নেই দেখে বিস্মিত হলেন। নিত্যানন্দ জানালেন—'তোর করে দণ্ড দেখি পোড়োঁ মো হিয়ায়'। প্রভু দুঃখিত হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। নিত্যানন্দকে রোষভরে তিনি জানালেন যে দণ্ডে সর্ব দেবের নিবাস সে দণ্ড তুমি ভাঙলে কেন। নিত্যানন্দ উন্মত্ত, অস্থির বুদ্ধি, পাগল স্বভাব, 'বালোচিত আবেগ তার পাণ্ডিত্য ধর্মে অজ্ঞ'—এই কথা বলে নিত্যানন্দকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন মহাপ্রভু। কিন্তু নিত্যানন্দ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হলেন না এ বক্তব্যে। তিনি বললেন, সব ভালমন্দ কার্যের ভার তিনি সঁপে দিলেন গৌরাঙ্গকেই। তাঁর দণ্ডভঙ্গ দেবতাশ্রমের বিরুদ্ধতা নয়। সব দেবতা যে দণ্ডে বাস করে সে দণ্ড তাঁর প্রভু কাঁধে করে নিয়ে যাবেন এটাই তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তবুও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি এবং গৌরাঙ্গের পতিত উদ্ধারক রূপের স্তুতি করে নামধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবেশে তাঁর ব্যথার্ত হৃদয় কোনোভাবেই মানতে পারলেন না নিত্যানন্দ। মহাপ্রভু আনন্দিত হৃদয়ে অথচ বিরস বদনে কিছু উত্তর দিলেন না। নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গ ঘটনা তাঁর মানবিক ব্যথা-বেদনার প্রতীক হয়ে রইল।

এর পরের বর্ণনায় সার্বভৌম সম্মেলন। শচীনন্দন গৌরাঙ্গের সঙ্গে গদাধর, নরহরি, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, দামোদর, মুরারি মুকুন্দ প্রভৃতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহাঙ্গনে রাধা-কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করতে করতে নৃত্যের হর্ষে প্রেমানন্দে ভাববিহ্বল হলেন। সার্বভৌম নিজেও মহাপ্রভু ও সঙ্গীদের এই নৃত্যবিলাস দেখে পরম আহ্লাদিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হলেন—

দেখি' সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য॥ পৃ. ১৭২

অতঃপর মহাপ্রভু ও সার্বভৌমের মহামিলন—

তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
ভিক্ষা-আমন্ত্রণ তারে দিল সার্বভৌমে॥
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভুসঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন॥ পৃ. ১৭২

এ সময়ে মহাপ্রভুর গম্ভীর হুঙ্কারশব্দে—সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হল—

হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর শবদে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু সিংহনাদে॥
দেব, গন্ধর্ব, নর, শৃগাল, কুক্কুর।
আইলা গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল॥
সভার মুখেতে সেই প্রসাদ আনন্দে।
দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে॥[৮]। পৃ. ১৭২

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবতের তুলনায় আকারে অনেক ক্ষুদ্র। তাছাড়া লোচনদাস শ্রীখণ্ডের ও নবদ্বীপের চৈতন্যপন্থীদের অনুবর্তী ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সুযোগ্য শিষ্য। এই নরহরি সরকার গৌরনাগর শাখার প্রবর্তক। লোচনও সেই দৃষ্টিতেই চৈতন্যকে দেখেছেন। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিত্যানন্দের বন্দনা এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে আজও ভক্তদের মুখে মুখে সেই গান গীত হয়। মুরারিগুপ্তের কড়চার আদর্শে লোচনদাস তাঁর কাহিনী বিন্যস্ত করেছিলেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য লোচনদাস মুরারির নিকট ঋণী। গ্রন্থটিতে নানাস্থানে অলৌকিকের মেঘমালা ছিন্ন হয়ে মানবীয় রসের প্রকাশ ঘটেছে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গ ল'-এ নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ যথেষ্ট মানবিক, কেননা সূত্রখণ্ডে একদিকে যেমন নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জগাই-মাধাই উদ্ধার ও দণ্ডভঙ্গের ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেম করুণাধর্ম ও সন্ন্যাসবিরোধী পার্থিব জীবনাসক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বাস্তববোধ ও পরিমাণ-সামঞ্জস্যবোধ লোচনের গীতিগ্রন্থটিকে একটি বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছে।

'চৈতন্যমঙ্গল' ঃ জয়ানন্দ— ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করে যে ক'টি জীবনীসাহিত্য রচিত হয়েছে, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' তার মধ্যে নানা কারণেই স্মরণযোগ্য। বিশেষত নির্দিষ্ট ইতিহাসবোধ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জয়ানন্দ যা বর্ণনা করছেন তা অলৌকিকতা বর্জিত, ইতিহাস সমর্থিত চৈতন্যজীবনীর সূচক হয়ে উঠেছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্ভবত ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। কাব্যটির সাহিত্য-মূল্য খুব উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু এর মধ্যে এমন দুই-একটি অভিনব তথ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যার জন্য পণ্ডিতগণ গ্রন্থটির মূল্য স্বীকার করেছেন। জয়ানন্দ সর্বত্র চৈতন্যজীবনীর ঐতিহাসিকতা রক্ষা করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বাংলার চরিতকারদের গ্রন্থাদিও তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করেননি, সেইজন্যই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আখ্যানাদি যাচাই না করে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বহু সংবাদ সমাকীর্ণ। নিত্যানন্দ ও তাঁর পার্ষদ সম্বন্ধীয় সংবাদ এবং তৎকালীন ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ক অনেক তথ্য এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই গ্রন্থ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্যও লাভ করা যায়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল-আদিখণ্ডে চৈতন্য-পার্ষদদের আলোচনায় নিত্যানন্দের পার্ষদগণের প্রসঙ্গ এসেছে—

> নিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীরামদাস আদি।
> চৈতন্য পার্ষদ জগাই মাধাই অবধি।। পৃ. ২

নদীয়া খণ্ডে ৬৮ পরিচ্ছেদে জয়ানন্দ বর্ণনা করেছেন বারাণসী থেকে নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ—

> নিত্যানন্দ গোসাঞি আছিলা বারাণসী।
> গৌরাঙ্গ মহিমা শুনি নবদ্বীপে আসি।। পৃ. ৭৫

সেখানে নিত্যানন্দের বর্ণনায় কবি জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে বলরাম অবতার বলেই বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় মদোন্মত্ত বলরাম ও নিত্যানন্দ একাকার হয়ে গেছেন। নিত্যানন্দের চপল অস্থিরতা, উন্মত্ত পদক্ষেপ, উত্তাল জীবনোল্লাস যেন এখানে শব্দস্পন্দে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> ঘূর্ণিত লোচন বারুণী মদোন্মত্ত।
> হরস ভ্রমর জিনি অসীম মহত্ত্ব।।
> কিরে কিরে শব্দ মহা গভীর হুঙ্কার।
> ভাববেশে রসাবেশ আবেশ বিকার।।
> রঙ্গী সঙ্গী চপল অশেষ চারুবাণী।

সতত রভস মৃদু হাস্য বরু ভালি।।
অস্থির চরণ ক্ষেণে চলে লাফে লাফে।
পদতলাঘাতে ঘন ঘন ক্ষিতি কাঁপে।।
অবিরত কীর্ত্তন লালশ সঙ্গী সঙ্গে।
সুরনদীতীরে নবদ্বীপে গেলা রঙ্গে।। পৃ. ৭৫

নবদ্বীপের নন্দনাচার্যের ঘরে নিত্যানন্দ কিছুকালের জন্য বিশ্রাম নিলেন। এই সময় মুকুন্দ ভারতী নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ দিলেন গৌরাঙ্গকে। নন্দন আচার্যের গৃহে বিশ্বরূপের আগমন সংবাদ শুনে সমগ্র নবদ্বীপ সমাজবাসীরা সেখানে ধেয়ে গেলেন। এই সময় গৌরচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হল। এই দৃশ্যকে কবি জয়ানন্দ ব্যাখ্যা করলেন দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ দৃশ্য বলে—

বহুদিন দুই ভাই নবদ্বীপে দেখা।
উথলিল প্রেমসিন্ধু নাঞি লেখাজোখা।।
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প হুঙ্কার গর্জন।
সঘন চুম্বন পুন পুন আলিঙ্গন।।
পুলকে উজোর দেহ অপূর্ব্ব বসন। পৃ. ৭৬

এই প্রথম সাক্ষাতেই গৌরাঙ্গ নিজের ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করালেন নিত্যানন্দকে—

অবশেষে গৌরাঙ্গ ষড়ভূজ দরশন।
অবশেষে গৌরাঙ্গ ষড়ভূজ মূর্তি হইলা।। পৃ. ৭৬

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের এই অপূর্ব মূর্তি দর্শনে বিভোর হয়ে গেলেন। এরপরে অন্যান্য চৈতন্য পরিকর যথা হরিদাস, মুরারি গুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ দৃশ্য বর্ণনা করলেন জয়ানন্দ—

হরিদাস নিত্যানন্দে দিল আলিঙ্গন।
ঠাকুর পণ্ডিত মুখে সঘন চুম্বন।।
মুরারি গুপ্ত মুকুন্দ শ্রীগর্ভ বক্রেশ্বর।
পাদোদক পানে তুষ্ট দাস গঙ্গাধর।। পৃ. ৭৬

এরপর গৌরাঙ্গের নির্দেশে নিত্যানন্দ শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কেননা জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের শোকে শচী মুহ্যমান। সুতরাং নিত্যানন্দ যেন সেই হারানো পুত্র বিশ্বরূপের স্থান গ্রহণ করে শচীদেবীর শূন্য হৃদয়কে ভরে দিলেন অপরূপ বাৎসল্যে। নিত্যানন্দের প্রতি এই মাতৃদর্শনের নির্দেশে গৌরাঙ্গের যেমন মাতৃ আনুগত্যের নিদর্শন মিলল, তেমনি নিতানন্দের স্নেহপীড়িত হৃদয়ও যেন এতে ধন্য হয়ে গেল। এখানে জয়ানন্দ গৌরাঙ্গের মুখ দিয়ে নিত্যানন্দকে দ্বিতীয় বিশ্বরূপ বলে বর্ণনা করলেন—

বড় দুঃখ পান মা বিশ্বরূপ শোকে।
তুমি বিশ্বরূপ ইহা বলে সর্ব্বলোকে।।
আকৃতে প্রকৃতে নিত্যানন্দ বিশ্বরূপে।
ভেদ করিতে কেহো নারে নবদ্বীপে।। পৃ. ৭৬

শচীদেবীও নিত্যানন্দকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করলেন। নিত্যানন্দকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বললেন---

হাপুতির পুত মোর নিমাঞি নিতাই।।
যজ্ঞসূত্র ধরিআ করিবে তুমি বিভা।
মোর বাক্য পালিহ এই তুমার শোভা।।
আমার বচন সত্য পালিহ নিতাই।
অবধূতাশ্রম দেখি বড় দুঃখ পাই।। পৃ. ৭৬

নিত্যানন্দের সংসার বিবাগী অবধূত জীবন শচীকে পীড়া দিল। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের মিলন উৎসবে সমাগত নবদ্বীপের সমগ্র ভক্তসমাজ যেন ধন্য হয়ে গেল---

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত সমীপে।
মহান্তে তিলার্ধ স্থান নাই নবদ্বীপে।।
গৌড় বঙ্গ তেলঙ্গ মগধ উৎকল।
নানাদেশের পারিষদ পূরিল সকল।। পৃ. ৭৭

গৌরাঙ্গের মোহিনী বেশে নৃত্য দেখে নিত্যানন্দের বিস্ময়ের বর্ণনা করলেন কবি-

একদিন গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনে নাচে।
নটবর বেশে অকিঞ্চন প্রেম জাচে।।

....

মুকুন্দ আলাপে নিত্যানন্দ আনন্দিত।। পৃ. ৭৭

জগাই-মাধাই উদ্ধারপর্বে নিত্যানন্দের চরিতের বর্ণনায় জয়ানন্দ যথাযথ। নিত্যানন্দকে মাধাই ভীতিপ্রদর্শন করে বলে—

মাধাই বলে ওরে নিত্যানন্দ অবধূত।
আজি মাধাই হইল তোরে যমদূত।।
মরিবি মরিবি আজি ওরে নিত্যানন্দ।
কি করিতে পারে তোর ভাই গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দশিরে মাধাই মুটুকি মারিল।
বজ্রাঘাতসম রক্ত চৌদিগে স্রবিল।। পৃ. ৭৮

নিত্যানন্দের শিরে এই রক্তস্রোতের সংবাদ যখন গৌরচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌছল, ততক্ষণে জগাই নিত্যানন্দের এই আঘাতে কাতর হয়ে মাধাইকে বলে—

জগাই বলে মাধাই কেন মারিলে সন্ন্যাসী।
পতিত ব্রাহ্মণ হত্যা ভয় নাঞি বাসি॥
জগাইরে বন্দী কৈল মাধাই পালাইল।
আর জত দস্যুগণ কান্দিতে লাগিল॥ পৃ. ৭৮

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রকে জগাই-এর উদারতার কথা জানালেন—

নিত্যানন্দ বলে মোরে মারিল মাধাই।
আজিকার দুঃখে মোরে রাখিল জগাই॥
হাসিয়া আসিয়া বলে শ্রীনিত্যানন্দ।
দুই ভাইরে প্রেমভক্তি দেহ গৌরচন্দ্র॥
প্রভু বলে প্রেমভক্তি পাবেক জগাই।
ব্রহ্মবধী হবেক তুমায় মারিল মাধাই॥
জগাই বলে অপরাধ ক্ষেম গৌরচন্দ্র।
না জানিঞা মাধাই মারিল নিত্যানন্দ॥
পতিত তারিতে দুভাই আল্যা ক্ষিতি তলে।
জগাই মাধাই তারিলে সংসার ভাল বলে॥
পতিতপাবন তুমার নামখানি জাগে।
পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে॥ পৃ. ৭৮–৭৯

এই দুই ভাইয়ের জন্য গৌরচন্দ্রের কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করলেন নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গ জানালেন জগাইকে তিনি ক্ষমা করলেও নিত্যানন্দের প্রহারকারী মাধাই তাঁর কাছে ক্ষমার্হ নয়। কিন্তু পতিত জগাই-মাধাই প্রেমভক্তির অবতার গৌরাঙ্গের কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করলেন। এখানে জগাই-মাধাই উদ্ধারপর্বে নিমাই ও নিতাই পরস্পর একই ভূমিকা পালন করলেন। লোচনদাসের কাব্যে যেমন নিত্যানন্দকে অনুনয় করতে হয়েছিল গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য, এখানে জয়ানন্দও সেরূপ দৃশ্য এনেছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ নয়, জগাই-মাধাই নিজেরাই প্রেমভক্তি প্রার্থনা করেছেন। তবে প্রহারকারী মাধাইকে কৃপা করে নিত্যানন্দ নিজের করুণাপরবশ হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করলেন।

সন্ন্যাসখণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে নিমাই-এর সন্ন্যাসগ্রহণ প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের উল্লেখ করেছেন কবি জয়ানন্দ। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে নিমাই ও নিতাইয়ের উদ্দাম সংকীর্তনলীলার বর্ণনা করেছেন কবি—

নৌতন গামছা দিয়াছিলা বিষ্ণুপ্রিয়া।
স্তুতি কৈল নিত্যানন্দে সে গামছা দিয়া॥
সে গামছা নিত্যানন্দ গঙ্গাএ সমর্পিল। পৃ. ১৩৬

এই উদ্ধৃতিতে দেখতে পাচ্ছি বিষ্ণুপ্রিয়া তার নূতন গামছা নিত্যানন্দকে সমর্পণ করেছিলেন। নিত্যানন্দ সেই গামছা দান করলেন গঙ্গার জলে। নিত্যানন্দ সেখানে কনক কুণ্ডল হার ইত্যাদি স্বর্ণালংকার লাভ করলেন। হয়তো এই ঘটনার মধ্যে নিত্যানন্দের পরবর্তী গৃহী-সন্ন্যাস জীবনের আভাস রয়ে গেল। নিত্যানন্দের উপরেই সমর্পিত হল গৌরাঙ্গ বিরহিত ক্রন্দনাতুরা বাংলার ভার।

তারপরে বিজয়খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের লীলা প্রসঙ্গ—

তবে শত শত পারিষদ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
গোসাঞিও গেলা পানিহাটি গ্রাম নিজ রঙ্গে।।
রাঘব পণ্ডিত ঘরে ভোজন করিল।
রাঘবের শাক অন্ন প্রভু প্রশংসিল।।
শাকে বড় প্রিয় গোসাঞিও আম্রে বড় প্রিয়।
শ্রীনিবাস বলে রাঘব জিয় জিয়।।
নিত্যানন্দ বলেন আমি শাক খাই নাঞিও।
সভারে খাওয়াএ চৈতন্য গোসাঞিও।।
বৌশার পড়িল শাকে জত করে ব্যয়।
জত জত দেন শাক ততোধিক হএ।।
অদ্যাপি ঘোষণা আছে এই পানিহাটি।
রাঘবের শাক অন্ন পরিপাটি।। পৃ. ২২২

পানিহাটীতে বৈষ্ণব সমাজ সংগঠনে নিত্যানন্দের ভূমিকার উল্লেখ্য বর্ণনা করেছেন কবি—

পানিহটি সম গোষ্ঠী নাঞিও গঙ্গাতীরে।
বড় বড় পতাকা সমাজ মন্দিরে।।
ইষ্টকা রচিত হাট বাট রম্যস্থান।
দেউল দেহারা মঠ প্রাসাদ পুষ্পোদ্যান।।
মহা পণ্ডিত মহা কবি মহাগুণী।
রাজ-বিশ্বাস সব মহা মহা গণি।।
মহান্ত বৈষ্ণব তাতে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্য নিত্যানন্দের অনুগৃহীত।। পৃ. ২২২

এরপরে নিত্যানন্দের অসংখ্য লীলারহস্যের কথা বললেও কবি সে লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দেননি। বিজয়খণ্ডে ৭ম পরিচ্ছেদে গঙ্গাতীরস্থ গ্রামগুলিতে নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম সংগঠনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কবি—

গঙ্গার দুকূলে গ্রাম নাম রম্যস্থান।
জথা জথা নিত্যানন্দের হইল অধিষ্ঠান॥
আদৌ পানিহাটি আর আক্না মহেশ।
পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম মধ্য রাঢ় দেশ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দহ কোঠনা তামুলিত পাথরঘাটা॥
হাথ্যাগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোতরঙ্গ বানেদিরঙ্গ চাতরা মনোহর॥
হাথিকান্দা পাঁচপাড়া বেতড়ি বুড়ন।
আম্বুয়া বড়গাছি কাঁচড়াপাড়া সুপত্তন॥
কাশিআই পঞ্চাগাঁড়ি যাজহ কালিয়া।
খানা কুলিয়া চৌড়া দোগাছিয়া॥
নিমদা চৌয়রিগাছা উদ্ধরণপুর নৈহাটী।
বসই বেনড়া খণ্ড হাটাই চরখি॥ পৃ. ২৩৩-২৪৪

এখানে নিত্যানন্দের অলঙ্কার সজ্জিত মহামল্ল বেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন জয়ানন্দ সেখানেও তাঁর বলরাম অবতার রূপকে স্পষ্ট করেছেন কবি—

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রাএ।
রুনু ঝুনু কনক নূপুর বাজে পাএ॥
স্বর্ণ বৈদুর্য্য বিদ্রুম মুক্তা দাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ দেখি অনুপাম॥
হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙ্গা চরণ যুগলে॥
লটপটি পাগড়ি পিন্ধন পট্টাবাস।
অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র বদন প্রকাশ॥
আরও লোচন ভুরু মদন কামান।
কটাক্ষ সন্ধান শর বিধির নির্ম্মাণ॥
মৃদুল মধুর সুধা বচন গম্ভীর।
গজেন্দ্রগমন মত্ত চলন অস্থির॥
সুচারু দশন মণিমাণিক্যের ছটা।
বচনে খসিয়া পড়ে মুক্তা গোটা গোটা॥
নানা ফুলে বিরচিত গলা দিব্য মালে।

ধরণী অন্দোলে প্রেমরসের হিল্লোলে।।
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সেবক প্রতিঘরে। পৃ. ২২৪

নিত্যানন্দের নৃত্যগীতাদি সম্বলিত বৈষ্ণব সংকীর্তন বিলাস ও চৈতন্য নাম প্রচার পদ্ধতির পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন—

চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে।। পৃ. ২২৪

এরপর কবি জয়ানন্দ নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীরামদাস ছিলেন জয়ানন্দের শিক্ষাগুরু, ইনি বড়ই তেজস্বী ছিলেন। সাত সাঙ্গের ভারী কাষ্ঠ অতি সহজেই তুলতে পারতেন। তা দিয়ে মোহনবাঁশী করেছিলেন। প্রেমরাশি প্রতিমূর্তিরূপে মোহনবাঁশীতে সুর তোলেন। তাঁর দেহে কৃষ্ণচন্দ্র অধিষ্ঠান করার ফলে মহাভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন ছয় মাস কাল—

অনুক্ষণ ভাবগ্রস্ত শ্রীসুন্দরানন্দ।
তাহার দেহেতে নিত্যানন্দের আনন্দ।। পৃ. ২২৪

আর নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান করেন সুন্দরানন্দের শরীরে। নিত্যানন্দের পার্ষদদের মধ্যে অনেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যিনি সর্প এবং বাঘের সঙ্গে খেলতেন তিনি মুরারি চৈতন্যদাস। রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ের হৃদয়ে নিত্যানন্দের অবস্থান প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ—

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়।। পৃ. ২২৪

এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ অনুরাগী যাঁদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁদের বিবরণ দিলেন জয়ানন্দ। কালিআ কৃষ্ণদাস, ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন—

সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ কালিআ কৃষ্ণদাস।
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।। পৃ. ২২৪

পরমেশ্বর দাস, ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সখা। পরমেশ্বর দাস ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। জাহ্নবা মাতা আয়োজিত খেতুরি মহোৎসব সময়কালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন—

প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর দাস মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ জাহার হৃদয়।। পৃ. ২২৪

কমলাকর পিপলাই, ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভুক্ত এবং নিত্যানন্দের শাখা এবং সহচর ছিলেন—

কমলাকর পিপলাই ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিল যারে পানিহাটি গ্রাম।। পৃ. ২২৫

মহান্তদের শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। গৌরীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বসুধা ও জাহ্নবাকে

নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। গৌরীদাসই প্রথম নিমবৃক্ষের তৈরি গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা প্রবর্তন করেন—

মহাশক্তিধর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত।
জাহার দেহে নিত্যানন্দ হইল বিদিত পৃ. ২২৫

পণ্ডিত পুরন্দর, যিনি খড়দহবাসী নিত্যানন্দের অতি প্রিয় ভক্ত। খড়দহে আগমনের পর নিত্যানন্দ এই পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহেই অবস্থান করেন—

রাঢ় গৌড়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরন্দর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ সোসর।। পৃ. ২২৫

বলরাম দাস ছিলেন সঙ্গীতে প্রসিদ্ধ, সুগায়ক এবং প্রসিদ্ধ পদকর্তা—

সঙ্গীতে প্রসিদ্ধ বলরাম দাস।
জাহার* হৃদয়ে নিত্যানন্দের প্রকাশ।। পৃ. ২২৫

কৃষ্ণদাস মহাশয়, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীআচার্য চন্দ্র এরা সকলেই ছিলেন নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত—

প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কৃষ্ণদাস মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ জাহার হৃদয়।।
মহামহিম যদুনাথ কবিচন্দ্র।
নিরবধি জাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ।।
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ জাহার* হৃদয়।।
মহামহিম শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
জাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দের প্রকাশ।।
নিত্যানন্দের প্রিয় বড় শ্রীআচার্যাচন্দ্র।
নিরবধি জাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ।। পৃ. ২২৫

মহেশ পণ্ডিত মসিপুর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচার করেন এবং অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন—

মহেশ পণ্ডিত মহামহিম মহান্ত।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত।। পৃ. ২২৫

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, ইনি ব্রজের স্তোক-কৃষ্ণ। নবদ্বীপে জন্ম, নিত্যানন্দের মহাভক্ত ছিলেন—

* জাহার যাহার। মধ্য বংলায় প্রাকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী য স্থলে জ-এর ব্যবহার দুর্লভ ছিল না।

পুরুষোত্তম পণ্ডিতের নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যনন্দ স্বরূপের কেবল মহামর্ম্ম।। পৃ. ২২৫

কালা-কৃষ্ণদাস মহাশয়ের হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বদা বিরাজ করতেন—

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ জাহার হৃদয়।। পৃ. ২২৫

মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ দুই ভ্রাতা নিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন। দুই ভ্রাতাই সু গায়ক ছিলেন। চৈতন্যদেব এদের অভঙ্গ স্বর দান করেছিলেন—

প্রসিদ্ধ মাধবানন্দ বাসুদেব ঘোষ।
দুই ভাই নিত্যানন্দের করাএ সন্তোষ।। পৃ. ২২৫

শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীবংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রঘুনাথপুরী, পরমানন্দ উপাধ্যায় এঁরা সকলেই ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত বল্লভ।

নবদ্বীপের নন্দন আচার্যের গৃহে নিতাই-গৌরের প্রথম মিলন হয়েছিল। ইনি নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্তদের একজন ছিলেন—

নবদ্বীপে ঘর নন্দন আচার্য্য।
নিত্যানন্দ প্রিয় তারে জানে সর্ব্বরাজ্য।। পৃ. ২২৫

শ্রীপরমেশ্বরপুরী, রামদাস নিত্যানন্দের অতি কাছের ভক্ত ছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সখা। উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বণিক সম্প্রদায়রা ছিলেন সমাজের পতিত। নিত্যানন্দ এঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন—

'নিত্যানন্দ-প্রিয় বড় উদ্ধারণ দত্ত'। পৃ. ২২৬

চিরঞ্জীব, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ, মহানন্দ, নারায়ণ এঁরা সকলেই নিত্যানন্দের প্রিয়ভাজন ছিলেন। পণ্ডিত গঙ্গাদাসের গৃহে নিত্যানন্দ নানারকম লীলা করতেন—

নিত্যানন্দ-প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।। পৃ. ২২৬

নবদ্বীপে জগদীশ-হিরণ্যের গৃহে অবস্থান কালে নিত্যানন্দ চোর-দস্যুকে উদ্ধার করেছিলেন—

জগদীশ হিরণ্য দুই ভাই সহোদর।
নিত্যানন্দ-প্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর।। পৃ. ২২৬

পুরুষোত্তম দত্ত নিত্যানন্দের ভক্তদের মধ্যে একজন—

পুরুষোত্তম দত্ত কেবল উদার।
জাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিহার।। পৃ. ২২৬

এরপর কবি জীব পণ্ডিতের কথা বর্ণনা করেছেন—

জীব পণ্ডিত মহা উদার চরিত। পৃ. ২২৬

নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত শ্রীগর্ভ পণ্ডিত—

নিত্যানন্দ প্রিয় বড় শ্রীগর্ভ পণ্ডিত। পৃ. ২২৬

মকরধ্বজ কর নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাঁর ঘরে অবস্থান করতেন। ইনি পানিহাটীবাসী ছিলেন। তাঁর বাস্তুভিটা বর্তমানে বড় হরিসভা নামেই খ্যাত—

মকরধ্বজ কর পরম উদার।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিহার॥ পৃ. ২২৬

উপরোক্ত বর্ণিত সকলেই ছিলেন নিত্যানন্দের পরিকরবৃন্দ।

উত্তরখণ্ডে কবি জয়ানন্দ বর্ণনা দিচ্ছেন কবি-গোঁসাঞির বারাণসী ছেড়ে নবদ্বীপে আসার সংবাদ। আবার সেই সূত্রখণ্ডের প্রসঙ্গই পুনরালোচনা করেছেন কবি—

নিত্যানন্দ গোসাঞি ছাড়ি বারাণসী।
গৌরাঙ্গ-মহিমা শুনি নবদ্বীপে আসি॥ পৃ. ২২৮

নিত্যানন্দ সেখানে গৌরচন্দ্রের হলধর রূপ ধারণ দেখে তার হাতে মুষল, হল দিলেন। উত্তরখণ্ডে পুনরায় জগাই-মাধাই প্রসঙ্গ আবার আলোচনা করলেন কবি—

মহাপাপে মুক্ত কৈল জগাই মাধাই।
ধুতাল্যা সিন্ধাল্যা মত্ত দুই ভাই॥ পৃ. ২২৯

গৌরাঙ্গের আদেশে গৌড়দেশের ভার অর্পিত হল নিত্যানন্দের উপরে। বৈদ্য-উপাধ্যায় নিত্যানন্দ ভাবে ভাবিত হয়ে বলরাম প্রিয়া রেবতীর স্থান গ্রহণ করলেন। জাম্বির গাছে কদম্ব ফুল বিকশিত হয়ে পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হল—

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
নিত্যানন্দ-ভাবে তিহোঁ হইলা রেবতী॥
তিন মাস বিহ্বল আছিল স্বতন্তরে।
পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে॥
শ্রীরামদাস কৃষ্ণ ভাবে হাসি হাসি।
কদম্ব ফুল ফুটিল জাম্বির গাছে আসি॥
কদম্ব ফুল ফুটিল জাম্বির গাছময়।
নিত্যানন্দ অভিষেক-(স)ময় নির্ণয়॥ পৃ. ২৩১

আবার কবি বর্ণনা করেছেন—

কাজি মুখে হরি বোলাইল নিত্যানন্দ।
মুরারি চৈতন্যদাসের রাঘব সনে দ্বন্দ্ব॥

পানিতে ডুবিআ থাকে দিন পাঁচ সাত।
কাল সর্প খাওাল শরীরে রক্তপাত।।
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ বণিকের ঘরে।
মহা মহোৎসবে রাত্রিদিনে নৃত্য করে।।
স্বর্ণক হীরা মুক্তা রজত নূপুরে।
ছবি মনোহর পটবস্ত্র প্রচুরে।।
শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে নিত্যানন্দ।
অচ্যুতানন্দ সঙ্গে ভ্রমেন স্বচ্ছন্দ।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ হিরণ্যের ঘরে।
দস্যু ব্রাহ্মণে রাত্রে গেল কাটিবারে।।
রাত্রি পোহাইল দস্যু পলাইল ভয়ে।
ঝড়ে বৃষ্টে অন্ধকার অন্ধ হআ রয়ে।।
দস্যুপতি ব্রাহ্মণেরে বড় কৃপা করি।
প্রেমাশ্রুপুলকে ভাসে দেখি সর্ব্বোপরি।।
নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা।
নিত্যানন্দে গৌড় রাজ্য ভাসিলা।। পৃ. ২৩১

এখানে কবি জয়ানন্দ বর্ণনা করলেন নিত্যানন্দের কৃপায় পাপীজনের উদ্ধার সংবাদ।

নিত্যানন্দের মুখে সার কথাটি প্রকাশ করলেন জয়ানন্দ। গৌরাঙ্গের কাছে সমর্পিত হল নিত্যানন্দের এই গুঞ্জ অলংকার সজ্জিত, নৃত্য-গীতাদি ভূষিত ধর্ম প্রচারের নির্দেশ কে দিয়েছে—

গৌরচন্দ্রে জিজ্ঞাসিল শ্রীপাদ গোসাঞিঃ।
তুমার গৌড়রাজ্যে কার অধিকার নাঞিঃ।।
কর্ত্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙা বেত্র গুঞ্জাহারে নূপুর আভরণে।।
মহোৎসব মাগি জায় নাচে সঙ্কীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তুমারে দিলেক কোন্ জনে।। পৃ. ২৩২

গৌরাঙ্গের এই কথা শুনে হেসে নিত্যানন্দ বললেন—

শুনি নিত্যানন্দ গোসাঞিঃ হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ-ধর্ম্ম নহে।। পৃ. ২৩২

এখানে রবীন্দ্র কথিত সেই উক্তির পূর্ব সংকেত—

"বড় শক্ত বুঝা
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।"

কবি জয়ানন্দ আরও বলেছেন—

তিনমাস রৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন পাতিলেক খেলা।।
তবে নিত্যানন্দ বৈল ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি সেই গৌড়দেশে।। পৃ. ২৩২

এই বর্ণনায় দেখতে পাচ্ছি, নিত্যানন্দ গৌড় দেশে গৌরাঙ্গের মূর্তিপূজা এবং নাম প্রচারে বের হয়েছিলেন। এরপর চৈতন্যের বৈকুণ্ঠ গমন সংবাদে নিত্যানন্দের শোক প্রসঙ্গের বর্ণনা করলেন কবি—

চৈতন্য-বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ।
চৈতন্য-বিজয় বিনে না করে শ্রবণ।।
নিত্যানন্দে প্রবোধিয়া সর্ব্ব পারিষদ।
চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্ত্তন সম্পদ।। পৃ. ২৩৫

এরপরেই যেন নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা করলেন জাতিভেদ-বিবর্জিত এক সর্বাত্মক কীর্তন বিলাসের। যেখানে তাঁর সঙ্গী হবেন শ্রীরামদাস। সেখানে শুধু অন্ধ-বধির-পঙ্গু নয়, কুলবধূরাও গৌরাঙ্গ নামে আকুল হলেন—

জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিআ সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে।।
সর্ব্বশক্তি ধরে মোর শ্রীরামদাস।
ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ করিব প্রকাশ।।
কূলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে।।
গাওয়াইমু চৈতন্য নুঙাঞিমু চৈতন্য।
গৌড়ে উৎকল রাজ্যে করামু ধন্য ধন্য।। পৃ. ২৩৫

সকল বৈষ্ণব নিত্যানন্দের এই প্রতিজ্ঞা শুনে তাঁর জয়ধ্বনি দিলেন। এরপরে বেশ কিছুকাল মহামল্লবেশে ক্ষিতি পর্যটনের পরে নিত্যানন্দের বিবাহ সংবাদ প্রকাশ করলেন কবি। সূর্যদাসের কন্যাদ্বয় বসু ও জাহ্নবার পাণিগ্রহণ করেন এবং দুই পত্নীগর্ভে দুই সন্তানের জন্ম হয় তারই উক্তি উদ্ধৃত হল—

সূর্য্যদাস-নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী।।
বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামর্দ্দ।। পৃ. ২৩৫

'চৈতন্যভাগবত'-এর শুরুতেই বৃন্দাবনদাস বলরামের রাসলীলার পৌরাণিকতা সন্ধান করেছেন, সম্ভবত নিত্যানন্দের স্ত্রীদের ও তাঁদের সখীদের সঙ্গে মিলে নৃত্য করাকে সঙ্গত বলে প্রমাণ করার জন্য। তন্ত্রের মতে অবধূত গৃহস্থ হতে পারেন এবং একই সঙ্গে ভোগী ও ত্যাগী হতে পারেন। এদিক দিয়ে নিত্যানন্দ কোনো অন্যায় করেননি।

এরপরে আছে নিত্যানন্দের খড়দহে গৃহী জীবনযাপনের কথা--

'নিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দহে'। পৃ. ২৩৬

নিত্যানন্দের সেবকের পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সমৃদ্ধি লাভ হয়। উত্তরখণ্ডের সমাপ্তিতে নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণনা করলেন কবি। এইভাবে নিত্যানন্দের তিরোভাবেই কাব্য সমাপ্তি করেন জয়ানন্দ—

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি।।
একাদশী দিবসে প্রলয় ঝড় হইলা।
অনন্তের নাক-শ্বাসে পৃথিবী কাঁপিলা।।
নিত্যানন্দ-বিজয় শুনিল জে মহান্ত।
বীরভদ্র দেখি সভে দাঁড়াইল একান্ত।।
সীতা অদ্বৈত অন্তরে রহিল বড় দুঃখ।
হাহা চৈতন্য নিতানন্দ স্বরূপ।। পৃ. ২৩৬

জয়ানন্দ নিত্যানন্দের ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় নিত্যানন্দ খুব ভ্রমণপিপাসু ছিলেন। জয়ানন্দ চৈতন্যদেব অপেক্ষা নিত্যানন্দ ও তাঁর পরিকরদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, মনে হয় তাঁদের সম্পর্কে অনেক সংবাদও তিনি জানতেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ গোরা বিরহদুঃখে বিবশ সমস্ত কাতর ভক্তদের মনে আশা উদ্দীপনা দিয়েছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—

প্রেমভক্তি দিয়া সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে।।
কূলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে।।
গাওয়াইমু চৈতন্য নুঙাঞিমু চৈতন্য।
গৌড়ে উৎকল রাজ্যে করামু ধন্য ধন্য।।
এই প্রতিজ্ঞা নিত্যানন্দ-মুখে শুনি।
সকল বৈষ্ণব করিল জয়ধ্বনি।।[৯]

জয়ানন্দ নিত্যানন্দের শিষ্যদের গুরুতুল্য মনে করতেন এবং তিনি বলেছেন বীরভদ্রের 'প্রসাদমালা' লাভ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাস

নিত্যানন্দের বিবাহ এবং পুত্রকন্যার জন্মের উল্লেখ করেননি। কিন্তু জয়ানন্দ করেছেন। জয়ানন্দ নিত্যানন্দের শিষ্য অভিরাম গোস্বামী এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কোনো কোনো বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের তুলনায় সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অসংগত নয়। জয়ানন্দ নিত্যানন্দের তিরোধানের মাস-তিথি উল্লেখ করেছেন। যেটা আমরা অন্য কোনো গ্রন্থে পাইনি। শেষে চৈতন্যের জয়ধ্বনি দিয়ে নিত্যানন্দ মহিমা প্রকাশে কবি জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ— কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ বটে। এই গ্রন্থটি গৌরতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা-সমন্বিত একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি রচিত হয় ১৬১২-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ এবং বৈষ্ণব সমাজে ভাগবত সদৃশ সমাদৃত এই গ্রন্থে কবি চৈতন্যদেবের ভগবৎস্বরূপের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। চৈতন্যজীবন ইতিহাসের সঙ্গে সেই ভগবৎস্বরূপ তত্ত্বের মিলনে কাব্যটি হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব দর্শনের অমৃতভাষ্য। এই অপূর্ব চরিত কাব্য রচনা করে তিনি ভক্তের সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার সহায়ক হন। এতে আছে চৈতন্যতত্ত্ব তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা। ফলে এটি কেবল চরিতগ্রন্থ নয় এতে আছে সুগভীর পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা ও ভক্তি ও কাব্য কুশলতা। চরিত এখানে উপলক্ষ্য। লক্ষ্য বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের অমৃত পরিবেশন। মননের ভাষা, দার্শনিক প্রকাশ-ভঙ্গিমা, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ইত্যাদির সাহায্যে কবি চরিতামৃত রচনা করেছেন। চৈতন্যজীবনের গভীর তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও পরিণাম নির্দেশ এবং তৎসহ ভক্তিশাস্ত্র, দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়াই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবের রসসাধনা, রাধাকৃষ্ণের যুগল রসতত্ত্ব ও সখী সাধনা, চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বকথাকে তিনি অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাই স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল রহস্য সহজেই অবধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। চৈতন্যদর্শন এবং চৈতন্যজীবনী কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আদি-লীলা ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রকে যুগ্মভাবে প্রণাম জানিয়ে লিখেছেন—

> বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
>
> গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।। শ্লোক ২, আদি, ১ম পঃ

একাধিক ভণিতায় কৃষ্ণদাস চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে একত্রিত জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত করেছেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে 'চৈতন্যের দুই অঙ্গ' বললেন কৃষ্ণদাস, নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ হলধর বলরাম এবং অদ্বৈত সাক্ষাৎ ঈশ্বর—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেইসব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥ শ্লোক ৭২-৭৬, আদি, ৩য় পঃ

নিত্যানন্দের কৃপাতে যে তিনি নিত্যানন্দের স্বরূপ অনুভব করছেন তা জানাচ্ছেন কৃষ্ণদাস (বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্), আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ মহিমা এবং নিত্যানন্দ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন চরিতকার। সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁরই দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম—

সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ-দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম-সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥ শ্লোক ৪-৬॥ আদি, ৫ম পঃ

সুতরাং হলধর ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক, শুধু ভিন্ন কায়ায় তাঁরা নবদ্বীপে দুই নামে অবতীর্ণ। বলরাম সঙ্কর্ষণ পঞ্চরূপে কৃষ্ণের সেবা করেছেন। কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেছেন তিনি, আর চার রূপে তিনি করেন সৃষ্টিকার্যের সহায়তা—

সৃষ্ট্যাদিক সেবা,—তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণে বিবিধ সেবন॥
সর্বরূপে 'আস্বাদয়ে' কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ॥ শ্লোক ১০-১১॥ আদি, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনি সর্বলোকের কাছে নিত্যানন্দ মহিমা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির পরপারে আছে 'পরব্যোম' নামে পরমধাম, যেখানে নানা বিভূতিগুণ সমৃদ্ধ কৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান। সেখানে সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ অবতারের বিশ্রাম। তার উপরে আছে দ্বারকা মথুরা গোকুল বিস্তৃত 'কৃষ্ণলোক'; তারও ওপরে ব্রজলোকধাম

শ্রীগোকুল। যার অন্তর্গত শ্রীগোলক শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই একই স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নানারূপে প্রকাশিত। সেখানে গোপ-গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের নিত্য বিলাস--

সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম।।
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়।।
চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।।
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।। শ্লোক ১৮-২১।। আদি, ৫ম পঃ

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ একই কৃষ্ণের চারিবিধ প্রকাশ। নিজগণসঙ্গে কৃষ্ণের বলে অনন্ত লীলা, যেখানে তিনি নারায়ণ রূপে প্রকাশিত—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ।।
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়।।
পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস।। শ্লোক ২৪-২৬।। আদি, ৫ম পঃ

ব্রহ্মালোকের উপরে যে পরব্যোম, সেখানে জ্যোতির্বিম্বের স্বাভাবিক প্রকাশ—

তৈছে পরমেব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ।। শ্লোক ৩৭, আদি, ৫ম পঃ

সেই পরমব্যোমে নারায়ণের চারপাশে যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি চতুর্ভুজ মূর্তি, তার মধ্যে সঙ্কর্ষণ রামের রূপ। এই বলরাম চিচ্ছক্তিময় শুদ্ধসত্ত্ব, ষড়বিধ ঐশ্বর্যে তাঁর চিন্ময় প্রকাশ—

নির্বিশেষে-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়।।
সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে।।
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই-তুরীয়, বিশুদ্ধ।।

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ।।
চিচ্ছক্তি-বিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম।।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয়।। শ্লোক ৩৮-৪৪, আদি, ৫ম পঃ

জীব যেখানে তটস্থ শক্তি, সেখানে মহাসঙ্কর্ষণ সকলের আশ্রয়। এই সঙ্কর্ষণই প্রধান পুরুষ। যার থেকে সবকিছুর উৎপত্তি সেই বিষ্ণুর সঙ্গে এক—

'জীব'-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়।। শ্লোক ৪৫-৪৬, আদি, ৫ম পঃ

সেই অনন্ত সঙ্কর্ষণ বলরামই নিত্যানন্দরায়—

সর্বাশ্রয়, সর্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য অপার।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার।।
তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম।। শ্লোক ৪৭-৪৮, আদি, ৫ম পঃ

গোবিন্দের প্রতিমূর্তি বলরাম, বলরামের স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ তাই পরপারের অংশীভূত —

আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।।
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার।।
সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম।।

....

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্তি হঞা।। শ্লোক-৮১-৯৪, আদি, ৫ম পঃ
শেষনাগ-জলে তা বৈকুণ্ঠাধিপতির বিশ্রাম—
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন জলে করিল বিশ্রাম।।

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন।।
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ।।
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম।।
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।।
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত-বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে।।
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার।।
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট-কম্পন।। শ্লোক ১০০-১০৬, আদি, ৫ম পঃ

নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ সেই প্রভু নিত্যানন্দই সকলেরই সার—

হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ-সর্ব-অবতংস।।

.. ..

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি।।
তাঁহা ক্ষিরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম।। শ্লোক ১০৭-১১১, আদি, ৫ম পঃ

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু জগৎপালক, সেই বিষ্ণু শেষ মহাসর্পরূপে ধরণীকে ধারণ করেন। নিত্যানন্দ সেই শেষ নাগগত অংশীভূত—

দেবগণ না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন।।
তবে অবতার' করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন।।
সেই বিষ্ণু হয় যার অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ-সর্ব-অবতংস।।

সেই বিষ্ণু, 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি।।

শ্লোক ১১৪-১১৭, আদি, ৫ম পঃ

কৃষ্ণভক্ত সেই শেষরূপ বিষ্ণুভক্ত অবতার। ভক্তি ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। সহস্র বদনে তিনি কৃষ্ণগুণগান গান করে কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত হন--

সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল।।
পঞ্চাশৎকোটি—যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্বপ আকার।।
সেই ত' অনন্ত 'শেষ'—ভক্ত—অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।।
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান।।
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম সুখে।।

শ্লোক ১১৮-১২২, আদি, ৫ম পঃ

দশদেহে ছত্র-পাদুকা শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসনের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন তিনি—

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাদান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন।। শ্লোক ১২৩, আদি, ৫ম পঃ

কৃষ্ণের শেষ জ্ঞাত হয়েই তিনি 'শেষ' নাম ধরেন। তিনি অনন্ত, তিনিই নিত্যানন্দ-অবতার-অবতারী, নিত্যানন্দ-কৃষ্ণ অভিন্ন—

এত মূর্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে।।
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা।।
এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা।।
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতরি।।
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।

পূর্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয়।
সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥ শ্লোক ১২৪-১৩১, আদি ৫ম পঃ

সর্ব অবতার লীলা দেখাবার সঙ্কল্প করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিত্যানন্দ তাঁরই প্রকাশ। গুরু, সখা, ভৃত্যরূপে বৃন্দাবনলীলায় বলরাম যেভাবে কৃষ্ণসেবা করেছিলেন, নিত্যানন্দ সেভাবেই চৈতন্যসেবা করেন—

যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত' প্রকাশ।
সেইভাবে—কহে মুঞি চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাখামাখি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥ শ্লোক ১৩২-১৩৭, আদি, ৫ম পঃ

অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দুই অঙ্গ, তারা প্রভুর লীলারঙ্গের সাথী। নিত্যানন্দ লক্ষ্মণরূপে রামের সেবা করেছেন। রামের দুঃখের কারণ, মৌন হয়ে লক্ষ্মণ ছোট ভাই হিসেবে শুধু রামের সেবা করে যান। তাই জ্যেষ্ঠের সেবালাভের জন্য কৃষ্ণ অবতারে তিনি বড় হয়ে কৃষ্ণকে নানা সুখ আস্বাদন করান—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর॥
গুরুবর্গ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য।

শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য।।
সবে পারিষদ, সব লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ-কার্য সাধে গৌর-রায়।।
অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।।
অদ্বৈত-আচার্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর।।
আচার্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন।।
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ।।
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই'।।
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন।। শ্লোক ১৪২-১৫২, আদি, ৫ম পঃ

রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-বলরামই গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ—

রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ বিশেষ।
অবতারে-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ।।
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশি-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান।। শ্লোক ১৫৩-১৫৪, আদি, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দই চৈতন্যের কামনাকে পূর্ণ করেন। নিত্যানন্দের মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার তার এককণা কৃপাস্পর্শ পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়। অধম ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বায়িত করাই নিত্যানন্দের মহিমা। নিত্যানন্দের মহিমায় কবি কৃষ্ণদাস এই বেদগুহ্য চরিতকথা প্রকাশ করেছেন—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার।।
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চড়াইল উর্ধ্বসীমা।।

বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ॥ শ্লোক ১৫৬-১৬০, আদি, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দের শিষ্য মীনকেতন রামদাসের অঙ্গনে প্রেমময় নিত্যানন্দ অবস্থান করেন। ভক্ত রামদাসের হুঙ্কারে লোক চমৎকৃত হয়। গুণার্ণব মিশ্র অঙ্গনে এসে নিত্যানন্দকে সম্ভাষিত না করলে রামদাস ক্রুদ্ধ হন, বলরাম সম্ভাষিত না হওয়ায়। গুণার্ণবের চৈতন্য প্রভুতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর বিশ্বাস তত নয়। কিন্তু এই সংবাদও তো যথার্থ নয়। রামদাস এই ভেবে দুঃখ পেলেন যে নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ যেহেতু এক তনু, তাই উভয়ের প্রতি বিশ্বাসে কেউ পৃথক হতে পারেন না। তবু এই অখণ্ডকে খণ্ড জ্ঞান করার জন্য অভিশপ্ত হতে হল বিপ্রকে। 'দুই ভাই একতনু' সমান প্রকাশ—

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব,
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য।
শ্রীমূর্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা-কার্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদগম'॥
এত বলি নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য করে বিপ্র—না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা জানি, রামদাসের দুঃখ হইল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই একতনু-সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ॥

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাযণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড॥ শ্লোক ১৬৬-১৬৭, আদি, ৫ম পঃ

গৌর ব্যতীত নিতাই ও নিতাই ব্যতীত গৌরে বিশ্বাস ভক্তির বিরোধ। রামদাস তখন বংশী ভেঙে দেন। ভক্তের অপমানে গৌরনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্বনাশ ও অধঃপতন হল—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সংকীর্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে, কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ॥ শ্লোক ১৬১-১৬৫,১৭৮, আদি, ৫ম পঃ

কবি বাস করতেন নৈহাটী নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। এক রাত্রিতে নিত্যানন্দ প্রভু কবিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন—

নৈহাটি-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার॥ শ্লোক ১৮১-১৮৩, আদি, ৫ম পঃ

এখানে কবি নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা করেছেন—

শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-নয়ান।

পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দনলেপিত-অঙ্গ, তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান॥
কোটিচন্দ্র জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বুল-চর্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাইনে-বামে দোলে।
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা-যষ্ঠি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে॥
শিঙ্গাবাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা-অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥ শ্লোক ১৮৪-১৯৪, আদি, ৫ম পঃ

অতঃপর নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কবিকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিলেন এবং তাঁর কৃপায় সমস্তকে লাভ করলেন কবি—

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্বলভ্য হয়॥
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবনে যাইবার॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ শ্লোক ১৯৫-২০৪, আদি, ৫ম পঃ

কবির সমস্ত মন-প্রাণ আশ্রয় করেছেন নিত্যানন্দ—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার॥ শ্লোক ২০৮, আদি, ৫ম পঃ

কবি বলেছেন, নিত্যানন্দ কৃপাতেই গোবিন্দর সেবা লাভ করা যায়। নিত্যানন্দের কৃপাতেই বৈষ্ণব পাদপদ্ম লাভ হয়—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ দয়া॥ শ্লোক ২৩০, আদি, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দের কৃপায় ভক্তজীবের সর্ব অভীষ্ট পূরণ হয়। কবি নিজেও নিত্যানন্দের কৃপায় এই কাব্যকথা লিখতে পারেন। সহস্র বদনে বললেও নিত্যানন্দ প্রভুর গুণকীর্তন বলে শেষ করা যায় না—

'তাঁহা সর্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র—এই তার কৈল বিবরণ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর॥ শ্লোক ২৩১-২৩৪, আদি, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দ অবধূত চৈতন্যের দাস্য প্রেমে পাগল—

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল॥ শ্লোক ৪৮, আদি, ৬ষ্ঠ পঃ

বলরাম ও তার সব অংশাবতারই কৃষ্ণ দাসাভিমানী। বলরাম সঙ্কর্ষণ-লক্ষ্মণ শেষাবতার সকলেরই আছে সেবকের অভিমান—

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্বক্ষণ॥
তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥
তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যর অনুচর'।
মুঞি তার ভক্ত—মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথিবী ধরেন সেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥
এ-সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার'।
'ভক্ত-অবতার'-পদ উপরি সবার॥
একমাত্র 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার॥
জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান॥ শ্লোক ৮৮-৯৯, আদি,৬ষ্ঠ পঃ

ভক্তভাবে অঙ্গীকার করেই বলরাম, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণ সেবা করেন—

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন॥ শ্লোক ১০৫-১০৬, আদি, ৬ষ্ঠ পঃ

নিত্যানন্দ গোস্বামীকে গৌড়দেশে ভক্তি প্রচারের জন্যই প্রেরণ করা হল—

নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।

তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে।। শ্লোক ১৬৫, আদি, ৭ম পঃ

তাই সমস্ত কুতর্ক ছাড়িয়ে চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে ভজনা করতে বলেছেন কবি কৃষ্ণদাস—

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্ধ্ববাহু হঞা।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া।।

যদি বা তার্কিক কহে,—তর্ক সে প্রমাণ।

তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।। শ্লোক ১৩-১৫, আদি, ৮ম পঃ

নিত্যানন্দ নাম নিতেই তাই ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়—

নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।

আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়।। শ্লোক ২৩, আদি, ৮ম পঃ

চৈতন্য-নিত্যানন্দ অপরাধের বিচার না করেই প্রেম বিতরণ করেন—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।

নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।। শ্লোক ৩১, আদি, ৮ম পঃ

চৈতন্য-নিত্যানন্দের মহিমা বৃন্দাবনদাসের কাব্যে যথাযথ প্রকাশ হয়েছে—নিতাইয়ের লীলা বর্ণনে কবির ভাবাবেশ হওয়ায় তিনি চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করতে পারেননি। তাই কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করেছেন—

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনা হইল আবেশ।

চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ।। শ্লোক ৪৮, আদি, ৮ম পঃ

পণ্ডিত হরিদাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ স্মরণে পরম উল্লাসের কথা বর্ণনা করেছেন কবি—

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য।

কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব-আর্য।।

তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।

তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহ—পণ্ডিত হরিদাস।।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।

চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস।। শ্লোক ৫৯-৬১, আদি, ৮ম পঃ

এরপর অভিরাম, মাধব ও বাসু ঘোষের সঙ্গে নিত্যানন্দ গৌড়ে নাম প্রচারের জন্য যাত্রা করলেন—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা।।
রামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ।। শ্লোক ১১৭-১১৮, আদি, ১০ম পঃ

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের শেষে নিত্যানন্দ গুণসমূহের বন্দনা ও বর্ণনা করেছেন কবি—

এঁকৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল।।
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে।।
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা।।
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন'।।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। শ্লোক ১৬০-১৬৪, আদি, দশম পঃ

মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নিত্যানন্দ শাখার বৃদ্ধি ও প্রাধান্যের বর্ণনা দিলেন কবি—

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্বভক্তবৃন্দ।।
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্ধ্ব স্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপাণ্ গণান্নুমঃ।।
শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর।।
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন।।
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন।। শ্লোক ৩-৭, আদি, একাদশ পঃ

নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের শাখা-উপশাখাও কবি বর্ণনা করলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দ মহিমা সকল জগতে প্রচার করেছিলেন নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা।।

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্মাতীত হঞা বেদধর্মে রত।।
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ।।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।।
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ।। শ্লোক ৮-১২, আদি, একাদশ পঃ

এই একাদশ অধ্যায়ে কবি 'দ্বাদশ গোপাল' নামে অভিহিত, নিত্যানন্দ-পরিকরবৃন্দের বর্ণনা দিয়েছেন। এই দ্বাদশ গোপালের তালিকায় আছেন সর্বশ্রী—ঠাকুর অভিরাম (গোপাল-১), সুন্দরানন্দ (গোপাল-২), কমলাকর পিপ্পলাই (গোপাল-৩), গৌরীদাস পণ্ডিত (গোপাল-৪), পরমেশ্বরীদাস (গোপাল-৫), ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গোপাল-৬), মহেশ পণ্ডিত (গোপাল-৭), পুরুষোত্তম পণ্ডিত (গোপাল-৮), কালাকৃষ্ণদাস (গোপাল-৯), পুরুষোত্তম নাগর (গোপাল-১০), উদ্ধারণ ঠাকুর (গোপাল-১১), শ্রীধর (গোপাল-১২)। এছাড়াও নিত্যানন্দের অন্যান্য পরিকরবৃন্দের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এই অধ্যায়ে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণনায় অগ্রজ বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসদেবের সমান মর্যাদা দান করেছেন—

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।। শ্লোক ৫৫, আদি, একাদশ পঃ

এরপর কবি অসংখ্য নিত্যানন্দগণের গুণকীর্তন করেছেন—

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু, লিখিলাঙ কত জন।।
এই সর্বশাখা পূর্ণ—পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে।।
অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল।।
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্র-বদন'।।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। শ্লোক ৫৭-৬১, আদি, একাদশ পঃ

রাঢ়দেশে নিত্যানন্দের জন্ম সংবাদ দিয়েছেন কবি—

'রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ'। শ্লোক ৬১, আদি, ত্রয়োদশ পঃ

বলরাম নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় আদিলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে—

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই'।

কৃষ্ণ, বলরাম দুই-চৈতন্য, নিতাই॥ শ্লোক ৭৮, আদি, ত্রয়োদশ পঃ

এই অধ্যায়ে ১৭শ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের মিলনদৃশ্যের প্রসঙ্গ —

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।

প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়ভুজ-দর্শন॥ শ্লোক ১২, আদি, সপ্তদশ পঃ

নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ ষড়ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভূজ রূপ প্রদর্শন করালেন, গৌরাঙ্গই আবার নিত্যানন্দরূপে হলধারী বলরাম হলেন—

প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ বেণুধর॥

তবে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।

দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুয়ে শঙ্খ-চক্র॥

তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।

শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন।

নিত্যানন্দবেশে কৈল মুষল ধারণ॥ শ্লোক ১২-১৬, আদি, সপ্তদশ পঃ

শচী স্বপ্ন দর্শন করলেন রাম-কৃষ্ণ দুই ভাইকে—

'তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ-দুই ভাই'। শ্লোক ১৭, আদি, সপ্তদশ পঃ

গৌরাঙ্গ বলরামবেশে যমুনাকর্ষণ লীলা করলেন। নিত্যানন্দ গঙ্গাজল এনে মহাপ্রভুকে এই লীলায় সাহায্য করলেন। প্রভুর সন্ন্যাসকালে চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দর সঙ্গে নিত্যানন্দও গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণে সহায়তা করলেন—

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য।

মুকুন্দদত্ত, এই তিন কৈল সর্ব কার্য॥

এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন।

বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।

চতুর্বিধ ভক্ত-ভাব করে আস্বাদন॥

স্বমাধুর্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।

রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥

গোপী-ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।

ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন॥
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥

শ্লোক ২৭৩-২৮০, আদি, সপ্তদশ পঃ

'মধু আন', 'মধু আন', বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল॥
জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল॥ শ্লোক ১১৫-১১৭, আদি, সপ্তদশ পঃ

মধুররস ব্যতীত অন্য লীলায় নিত্যানন্দ-বলরাম কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের সেবা করলেন। প্রেমভক্তিরূপ এই নিত্যানন্দ স্বরূপ সাধারণ লোকের অধিগম্য নয়। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে রোহিণীতনয় বলরামরূপী নিত্যানন্দের ব্যাখ্যা করেছেন এবং বৃন্দাবনদাস যে নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলেই চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছেন আদিলীলার সমাপ্তিতে কবি কৃষ্ণদাস আবার তার উল্লেখ করেছেন—

একাদশে 'নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ'।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ'।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম॥
চতুর্দশে 'বাল্যলীলার' কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে 'পৌগণ্ডলীলার' সংক্ষেপে কথন॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে 'কৈশোরলীলার' উদ্দেশ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিনুঁ বিশেষ॥
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ॥
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চরসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিলুঁ অতি,—না কৈলুঁ বিস্তৃত॥
বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে॥ শ্লোক ৩২৪-৩৩০, আদি, সপ্তদশ পঃ

মধ্যলীলা ঃ গৌড়মণ্ডলে প্রেরিত হয়ে নিত্যানন্দ সমগ্র দেশকে প্রেমরসে প্লাবিত করলেন—

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে।। শ্লোক ২৪, মধ্য, ১ম পঃ

কৃষ্ণপ্রেমে উদ্দাম নিত্যানন্দ জগতে প্রেম বিতরণ করলেন। তাই কবি নিত্যানন্দ বন্দনা ও তার গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। স্বয়ং গৌরাঙ্গের গৌরবের ভাই ও প্রভুর তত্ত্বস্বরূপ হলেও নিতাইয়ের প্রধান অভিমান তিনি গৌরাঙ্গের ভক্ত। চৈতন্য যাকে বড় ভাই বলেন, সেই নিত্যানন্দ তাঁকে প্রভু বলে জানেন। এইভাবে আপনি প্রভু বলরাম হয়েও চৈতন্যের দাস হন তিনি। অতএব নিত্য-চিৎ-স্বরূপের সেবাতেই জীবের নিত্যানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। তাই নিত্যানন্দ সারা জগতকে চৈতন্য নাম নিতে বললেন—

সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাঁহা প্রেমদান।।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার।।
চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই'।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি।।
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান।।
'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম।
'চৈতন্য' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ।।
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল।। শ্লোক ২৫-৩০, মধ্য, ১ম পঃ

নিত্যানন্দের উপস্থিত বুদ্ধি আমাদের আকৃষ্ট করে। এ ধরনের বাস্তবাশ্রিত বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে দেখা যায়। নিত্যানন্দের চাতুর্যে গৌরাঙ্গ প্রভু নবদ্বীপে এলে গঙ্গাতীরকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গা প্রদর্শন করালেন নিত্যানন্দ। তারপর শান্তিপুরে এসে ভক্ত সম্প্রদায় ও মায়ের সঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন হল। নিত্যানন্দ সাক্ষীগোপালের বৃত্তান্ত বললেন এবং প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করলেন। এখানে আমরা নিত্যানন্দের উপস্থিত বুদ্ধি দেখতে পাই। মহাপ্রভু যখন জানতে চাইলেন দণ্ডটি কীভাবে ভেঙেছে, নিতাই জানালেন, যে কীর্তন-সময়ে দণ্ডের উপরে পড়ে যাওয়ার সময় দণ্ডটি ভেঙে গেছে। তারপর প্রভু জগন্নাথ দর্শন করে মূর্ছিত হলে সার্বভৌমের ঘরে আশ্রয় নেন ও মূর্ছা অন্তে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন—

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া।।
শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ, রাত্রে সংকীর্তন।।
মাতা ভক্তগণের তাহাঁ করিল মিলন।
সর্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন।।
পথে নানা লীলারস, দেব-দরশন।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন।।
ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষি-গোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন।।
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে।।
সার্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন।।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল' আনন্দ।। শ্লোক ৯৩-১০০, মধ্য, ১ম পঃ

নিত্যানন্দ ও সার্বভৌম দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ অন্তে প্রভুকে নীলাচলে ফিরিয়ে আনলেন—

নিত্যানন্দ-সার্বভৌম আগ্রহ করিঞা।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা।। শ্লোক ১২৪, মধ্য, ১ম পঃ

রূপ সনাতন প্রভুর সঙ্গে মিলনের পূর্বে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—

অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে।। শ্লোক ১৮৩, মধ্য, ১ম পঃ

প্রতিবছর প্রভু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও শ্রীবাসের সঙ্গে চারমাস কাল একসঙ্গে কাটাতেন। নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেমপ্রচার জন্য পাঠালেন গৌরাঙ্গ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস।।
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস।।
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব।

আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥
তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু-শক্তি সঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্য-দণ্ড॥
তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥ শ্লোক ২৫৪-২৬২, মধ্য, ১ম পঃ

পানিহাটীতে শ্রীরঘুনাথ নিত্যানন্দের সেবা করে চিঁড়ামহোৎসবের আয়োজন করলেন। পরে নিত্যানন্দ কৃপায় রঘুনাথের গৃহত্যাগ ও পুরীতে প্রভুর কাছে এসে দামোদর স্বরূপের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন—

রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা।
চিঁড়া-দধি-মহোৎসব তাহাঁই করিলা॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমার্পিলা স্বরূপের স্থানে॥ শ্লোক ২৮৩-২৮৪, মধ্য, ২য় পঃ

বৃন্দাবন যাত্রাকালে নিত্যানন্দ, আচার্য রত্ন ও মুকুন্দ গৌরাঙ্গের সহচর হন।—

নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিন জন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন॥ শ্লোক ১১, মধ্য, ৩য় পঃ

নিত্যানন্দ চাতুর্যের সঙ্গে বালকদের শিখিয়ে দিলেন যে গৌরাঙ্গ যদি তাঁদের বৃন্দাবন-পথ জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা যেন গঙ্গার পথ দেখিয়ে দেয়। এখানেও আমরা নিত্যানন্দের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাই। এইভাবে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গকে শান্তিপুরে নিয়ে এলেন। চন্দ্রশেখরকে অদ্বৈত গোঁসাইয়ের কাছে শান্তিপুরে সংবাদ দিতে পাঠালেন নিত্যানন্দ। তিনি যেন নৌকা নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসেন আর শচীমাতাকে যেন পুত্রের আগমন সংবাদ দেওয়া হয়। নিত্যানন্দকে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাবে? ছলনাময় নিত্যানন্দ বললেন যে তিনিও তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবেন। যমুনাভ্রমে তিনি গৌরাঙ্গকে গঙ্গা প্রদর্শন করান। নৌকাযোগে অদ্বৈতকে দেখে মহাপ্রভুর সন্দেহ হল এতো তবে বৃন্দাবন নয়। অদ্বৈত জানালেন যে মহপ্রভু যেখানে থাকেন তাই বৃন্দাবন। প্রভু তখন বললেন—

প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥ শ্লোক ৩৪, মধ্য, ৩য় পঃ

অদ্বৈত নিতাইকে সমর্থন করেছেন--

আচার্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্বে গঙ্গাধার॥ শ্লোক ৩৫-৩৬, মধ্য, ৩য় পঃ

অদ্বৈতগৃহে বাসকালে গৌরাঙ্গের আহার্য গ্রহণের সময় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রেম ও কৌতুক বিতণ্ডা শুরু হল। এই বিতর্কের বিবরণ যদিও চৈতন্যভাগবতে আরো সুবিস্তৃত তথাপি কৃষ্ণদাসের বর্ণনাও কম রমণীয় নয়।

নিত্যানন্দ কহে—কৈলুঁ তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য-নিমন্ত্রণে।
অর্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে॥
আচার্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ—ঘরে যে পাইলা মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন॥
নিত্যানন্দ বলে—যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত॥
"ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥ শ্লোক ৭৯-৮৫, মধ্য, ৩য় পঃ

নিতাই উদরপূর্তি না হওয়ায় ভাণ করে একগ্রাস ভাত ছড়িয়ে ফেললেন, নিত্যানন্দের সেই উচ্ছিষ্ট নিয়ে অদ্বৈত আনন্দে নৃত্য করলেন—

নিত্যানন্দ কহে—আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি' একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই-চারি লাগে আচার্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য নাচে বহু রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে।

পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে॥ শ্লোক ৯৩-৯৮, মধ্য, ৩য় পঃ

অদ্বৈত এই প্রমাদকে ঝুঠা বললে নিত্যানন্দ তাঁকে ভয় প্রদর্শন করেন ও শতেক সন্ন্যাসী ভোজন করানো প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলেন----

নিত্যানন্দ বলে,—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে, তুমি কৈলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥ শ্লোক ৯৯-১০০, মধ্য, ৩য় পঃ

শ্রীচৈতন্যের আগমন সংবাদে সারা শান্তিপুরে সাড়া পড়ে গেল। শান্তিপুরবাসীগণ দলে দলে অদ্বৈতগৃহে সমবেত হয়ে 'অরুণবজ্রকান্তি' শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করে ধন্য হলেন—

শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য দেখিঞা॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বজ্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক হর্ষে, নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান॥
সন্ধ্যাতে আচার্য আরম্ভিল সংকীর্তন।
আচার্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন॥ শ্লোক ১০৮-১১২, মধ্য, ৩য় পঃ

এরপর অদ্বৈত নিত্যানন্দ একত্রিত হয়ে অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে নৃত্য গীত রঙ্গ-লীলা শুরু করলেন। গৌরাঙ্গ নৃত্যশ্রমে ক্লান্ত হলে নিত্যানন্দ তাঁকে ধরে রাখলেন—

নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

....

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা।
আচার্য, হরিদাস বুলে পাছে ত, নাচিঞা॥

এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্য, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে।।
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম।।
তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা।। শ্লোক ১১৩-১৩৪, মধ্য, ৩য় পঃ

পুরীর পথে আবার প্রভুর সঙ্গী হলেন নিত্যানন্দ। মাধবেন্দ্র পুরী ক্ষীরচোরা গোপীনাথও পুরীর অন্যান্য মাহাত্ম্যকথা নিত্যানন্দের কাছে ব্যক্ত করলেন গৌরাঙ্গ—

প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর।। শ্লোক ১৭১, মধ্য, ৪র্থ পঃ

নিত্যানন্দের মুখে প্রভু সাক্ষীগোপাল বৃত্তান্ত শুনলেন, কেননা পূর্বে তীর্থ-পর্যটন উপলক্ষ্যে সাক্ষীগোপাল মাহাত্ম্য শুনেছেন নিতাই—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটক আইলা।।
সাক্ষীগোপালের কথা শুনি, লোকমুখে।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে।। শ্লোক ৮-৯, মধ্য, ৫ম পঃ

এর পরের বর্ণনায় নিত্যানন্দের মুখে প্রভু সাক্ষীগোপাল বৃত্তান্ত শুনে গৌরাঙ্গ আনন্দিত হলেন—

নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত।। শ্লোক ১৩৪, মধ্য, ৫ম পঃ

প্রভু ও গোপালের অভেদ দর্শনে নিত্যানন্দ হাসলেন। পরে গৌরাঙ্গ কপোতেশ্বর দর্শনে গেলে নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডভঙ্গ করলেন—

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে।।
এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা।।
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।।
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল।।
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।

এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড-ভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা॥ শ্লোক ১৩৮-১৪৩, মধ্য, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দ নিজে দণ্ড ভেঙে গৌরাঙ্গকে বললেন যে সংকীর্তন সময়ে প্রেমাবেশে গৌরাঙ্গকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় তাঁরা দুজনেই দণ্ডের উপরে পড়ে যান, ফলে দণ্ডটি ভেঙে যায়। তবু এই দণ্ডভঙ্গের জন্য নিতাই ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এখানে আমরা নিত্যানন্দের উপস্থিত বুদ্ধি লক্ষ্য করতে পারি। এতে গৌরাঙ্গের রাগ ও দুঃখ দুইই হয়—

নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে, দণ্ড হৈল তিন খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে পড়িনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোর কর তার দণ্ড॥
শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা॥ শ্লোক ১৪৮-১৫২, মধ্য, ৩য় পঃ

এই গ্রন্থের টীকাকার তাঁর অনুভাষ্যে এই বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শাঙ্কর ভারতী-সম্প্রদায়ে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই সন্ন্যাসদণ্ড তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ভার্গী (বর্তমান 'দণ্ডভাঙা')-নদীতে ফেলে দেন। সন্ন্যাসাশ্রমে 'কুটীচক' ও 'বহূদক' অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু 'হংস' ও 'পরমহংস' অবস্থায় দণ্ডত্যাগ করাই বিধেয়। চতুর্দশ ভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহা ভাঙিয়া ফেলিয়া দেন।

নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈধ সন্ন্যাস-যোগ্য একদণ্ডের অকর্মণ্যতা জানিয়া বৈধ সন্ন্যাস দণ্ড-বহন হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন, তাহাতে মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ড-ত্যাগকার্যে বিবিৎসা-সন্ন্যাসপর অযোগ্যদণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্বে বৈদিক-বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি কথিত ভক্তানুকূল বৈধমার্গের অবহেলন পূর্বক উহার তাৎপর্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খল-মার্গকে অনুরাগ-পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাদৃশ ভ্রান্তচিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া এই ক্রোধ-প্রদর্শন-লীলা।" (পৃ. ৩৯৫)

গৌরাঙ্গ একাই নীলাচলে যাওয়ার সঙ্কল্প নিলেন। কেন যে নিতাই দণ্ড ভাঙলেন,

গৌরাঙ্গই তাঁকে দিয়ে ভাঙিয়ে আবার তাঁরই প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন, এর তত্ত্ব প্রকাশে কবি বললেন যে উভয়ের অভেদ দর্শনকারী ভক্তই একমাত্র এই লীলা বুঝতে সক্ষম। অলৌকিক সাক্ষীগোপাল লীলা যার বক্তা নিত্যানন্দ, যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য, তার বর্ণনা দিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ-বক্তা যার, শ্রোতা-শ্রীচৈতন্য।। শ্লোক ১৫৯, মধ্য, ৫ম পঃ

নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ আঠারো নালা থেকে পুরীতে এলেন এবং লোকমুখে প্রভুর সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে অবস্থানবার্তা শ্রবণ করলেন---

এত চিন্তি' ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া।।
তাঁহা শুনে লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্।
এক সন্নাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ।।
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে।
সাবভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে।। শ্লোক ১৪ ১৬, মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ

সার্বভৌম ভগ্নীপতি গোপীনাথের সঙ্গে এসে নিত্যানন্দকে নমস্কার করলেন। জগন্নাথ দর্শন করে নিতাইয়ের প্রেমাবেশ হল—শুনি' সবে জানিলা' এই মহাপ্রভুর কার্য।

সার্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে।।
জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ।। শ্লোক ৩২-৩৪, মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ

নিত্যানন্দের ভাবাবেশ দেখে সকলে অনুভব করলেন, এ সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঘটেছে—'শুনি সবে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য'। সবাই তাঁকে সুস্থ করে তুলল প্রসাদী মালা চন্দন দিয়ে—

সবে' মেলি' ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল।।
প্রসাদ পাঞা সবে হৈল আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে।। শ্লোক ৩৫-৩৬, মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যেতে চাইলে নিত্যানন্দ সঙ্গে যেতে চাইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদরের কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে গুণগান করলেন। কিন্তু কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একাই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সঙ্কল্প করলেন।

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালনেও সমর্থ হলেন কিন্তু কৌপীন বহির্বাস ও জলপাত্র নেবার জন্য একজন লোক সঙ্গে নিতে তিনি গৌরাঙ্গের কাছে প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণদাস বিপ্রকে তিনি সঙ্গে নিতে বললেন।

নিত্যানন্দ সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিলেন। প্রভুর যাত্রাকালে বহু লোকের আগমনে প্রভুর যাত্রা বিঘ্নিত হবে জেনে নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করলেন—

অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিলা উপায়।। শ্লোক ৮৩, মধ্য, ৭ম পঃ

দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে কৃষ্ণদাসকে প্রভু পরিত্যাগ করলেন। তখন নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তরা কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপ পাঠাতে চাইলেন—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর।।
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
'আই'কে কহিবে যাই, প্রভুর আগমন।।
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন।। শ্লোক ৬৭-৬৯, মধ্য, দশম পঃ

অদ্বৈত আচার্যের গৃহে গিয়ে কৃষ্ণদাস প্রভুর দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সংবাদ জানাল। স্বরূপ দামোদর ও নিত্যানন্দের মিলনদৃশ্য আঁকলেন কবি কৃষ্ণদাস—

তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।। শ্লোক ১২৬, মধ্য, দশম পঃ

রামানন্দ রায়ও নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন—

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ।।
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন।। শ্লোক ৩৩-৩৪, মধ্য, একাদশ পঃ

নীলাচলে হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত হলেন নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ।। শ্লোক ১৯৬, মধ্য, একাদশ পঃ

স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ সহ ভিক্ষা গ্রহণ করতে বললেন—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।।
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ।
গোপীনাথাচার্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ।।
আচার্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া।।

নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি॥ শ্লোক ২০২-২০৫,মধ্য, একাদশ পঃ

গজপতি রাজা প্রভুর কৃপা না পেয়ে রাজ্যভাগের প্রতিজ্ঞা করলেন। নিত্যানন্দ সভয়ে প্রভুর কাছে এই সংবাদ পরিবশন করলেন—

নিত্যানন্দ কহে,—তোমায় চাহি নিবেদিত।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥ শ্লোক ১৮-১৯, মধ্য, দ্বাদশ পঃ

নিত্যানন্দ রাজ-অনুরাগকে সমর্থন করলেন—

কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি॥
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া॥ শ্লোক ২০-২১, মধ্য, দ্বাদশ পঃ

প্রভু নিত্যানন্দের উপরেই এই সমস্যা সমাধানের ভার দিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দের কাছে প্রভুর একটি বহির্বাস চেয়ে নিলেন। সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজার কাছে পাঠালেন। প্রভুর বস্ত্র ও প্রভু অভিন্ন জেনে রাজা খুশি হলেন। এইভাবে নিত্যানন্দের বুদ্ধিবলে রাজার সমস্যা সমাধান হল। এখানে আমরা নিতাইয়ের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাই। নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করে অদ্বৈতের নিন্দাচ্ছলে অদ্বয়জ্ঞান-মহিমা বর্ণনা করলেন—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে,—অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন গতি॥
প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয়।
অন্ন দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
"নান্নদোষেণ মস্করী"—এই শাস্ত্র প্রমাণ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান॥
জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য।
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য॥

'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে।।
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন।। শ্লোক ১৮৮-১৯৫, মধ্য, দ্বাদশ পঃ

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের স্তুতি করলেন—

এইমত দুইজনে করে বলাবলি।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি।। শ্লোক ১৯৬, মধ্য, দ্বাদশ পঃ

রথযাত্রার নর্তকদের মধ্যে নিত্যানন্দের অংশগ্রহণ সংবাদ বর্ণিত হল—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।।
প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান।।
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ।।
অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।।
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ।। শ্লোক ৩৫-৩৯, মধ্য, ত্রয়োদশ পঃ

প্রভুর উদ্দাম কীর্তনবিলাসের সময় নিতাই হাত বাড়িয়ে তাঁর পতনশীল দেহকে রক্ষা করতে চাইলেন—

নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা।।
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য করিয়া হুঙ্কার।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার।
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল।। শ্লোক ৮৬-৮৮, মধ্য, ত্রয়োদশ পঃ

গুণ্ডিচা বাড়িতে নিতাই-অদ্বৈতের নর্তনলীলা বর্ণনা করলেন কবি—

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে।। শ্লোক ৭১, মধ্য, চতুর্দশ পঃ

রাধা প্রেমাবেশে আবিষ্ট হয়ে প্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি করলেন। নিতাইও দূরে থেকে প্রভুর স্তুতি করলেন। কিন্তু নিতাই কাছে না আসায় প্রভুর আবেশ ও কীর্তন থামছে

না, কেননা নিতাই ছাড়া প্রভুকে ধারণ করে রাখার মতো ক্ষমতা কারো নেই—

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি।।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, রহে কিছু দূরদেশ।।
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্তন।। শ্লোক ২৩৫-২৩৭, মধ্য, চতুর্দশ পঃ

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে সব ভক্তকে গৌড়দেশে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন—

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা দেখিলা সকলি।।
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া।।
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে।। শ্লোক ৩৬-৩৮ মধ্য, পঞ্চদশ পঃ

নিত্যানন্দকেও তিনি প্রেমভক্তি প্রকাশের আজ্ঞা দিলেন। রামদাস, গদাধরকে তাঁর সঙ্গী করতে নির্দেশ দিলেন। প্রভু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি মাঝে মাঝে অদৃশ্য থেকে নিত্যানন্দের নৃত্য দেখবেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে তিনিও নৃত্য করবেন বলে জানালেন কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া তাঁর নৃত্যরত রূপ কেউ দেখবে না। যদিও মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেমভক্তি প্রচারের নির্দেশ দিলেন, তবু নিতাই প্রভু দর্শনের জন্য পুরী যাত্রা করলেন। তাঁর এ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই, বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন, শিবানন্দ সেন প্রমুখ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নিত্যানন্দ গিয়ে শ্রীপুরী, গোপাল ও গোপীনাথের আগমনবার্তা ব্যক্ত করলেন।

চাতুর্মাস্যার অন্তে প্রভু আবার নিতাইয়ের সঙ্গে গোপনে যুক্তি করলেন। নিতাইকে প্রতি বছরেই পুরীতে না এসে গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচারের আদেশ করলেন প্রভু। তাঁর দুষ্কর কর্ম নিতাইয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে। মহাপ্রভুর ভক্ত নিত্যানন্দ যদি দেহ হন, মহাপ্রভুই তাঁর প্রাণ। তখন নিত্যানন্দকে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে প্রভু বিদায় জানালেন—

চাতুর্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া।।
আচার্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে।
আচার্য তর্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে।।

তাঁর মুখ দেখি' শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য করেন নর্তন॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—শুনহ, শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহাঁ সিদ্ধি করে-হেন অন্যে না দেখিয়ে।
আমার 'দুষ্কর' কর্ম, তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে,—আমি 'দেহ' তুমি 'প্রাণ'।
'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত প্রমাণ॥ শ্লোক ৫৯-৬৬, মধ্য, ষোড়শ পঃ

অন্ত্যলীলা : শ্রীরূপের সঙ্গে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মিলন বর্ণিত হল অন্ত্যলীলায়—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন॥ শ্লোক ২০৭, অন্ত্য, ১ম পঃ

শচীগৃহে নিত্য ভোজন করে মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে নিতাইয়ের নৃত্য দর্শন করেন—

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন-দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে॥ শ্লোক ৭৯-৮০, অন্ত্য, ২য় পঃ

গৌরসর্বস্ব শ্রীনিত্যানন্দ দুইভাবে গৌরাঙ্গের সেবা করেন। প্রেমপ্রচার ও পাষণ্ড দলন—এই দুই-ই ছিল নিতাইয়ের অভীষ্ট। পাষণ্ড-রামচন্দ্র খান নিত্যানন্দের কাছে অপরাধ করেন। রামচন্দ্র খান নিত্যানন্দকে গোয়ালে আশ্রয় নিতে বলে অপমান করেন। একথা শুনে নিতাই অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হন। রামচন্দ্রকে দণ্ড দিতে তিনি আরও কিছু দিন সেই গ্রামে রইলেন। রামচন্দ্র এই অপরাধের শাস্তি পেল ম্লেচ্ছ উজিরদের কাছে।

রঘুনাথ গোস্বামীর উপর অহৈতুকী কৃপা হল নিত্যানন্দের।

শুনি প্রভু কহে—'চোরা দিলি দরশন,
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন॥'

চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পঃ

স্বগণকে ভোজনে তৃপ্ত করার জন্য নিত্যানন্দ রঘুনাথকে আদর্শরূপ দণ্ড দিলেন।

অর্থাৎ দণ্ড মহোৎসব দ্বারা ভোগী বিষয়ীর হৃদয়ে অর্থের প্রতি অনীহা জাগালেন তিনি। পানিহাটী গ্রামে চিঁড়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল, নিত্যানন্দ এবং নিত্যানন্দগণ সেই অনুষ্ঠানে উপবেশন করলেন। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগদান করেছিলেন সেই তালিকায় আছেন সর্বশ্রী রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর, মুরারি, চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দগণ সুতরাং মুরারি গুপ্ত নহে), কমলাকর পিপ্পলাই, সদাশিব কবিরাজ, পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, হোড় কৃষ্ণদাস (বরগাছি নিবাসী) এবং উদ্ধারণ দত্ত।

সমস্ত বিপ্রগণ উপস্থিত হয়ে মান্য করে প্রভুকে সবার উপরে বসালেন। সর্বাগ্রে নিত্যানন্দকে প্রসাদ প্রদান করা হল। নিত্যানন্দ গোপের অভিমানে ব্রজলীলার উদ্দীপন ঘটালেন। সখাদের সঙ্গে যমুনা-তটে পুলিন ভোজনের আনন্দ উপভোগ করলেন। ধ্যানযোগে মহাপ্রভুকে এনে তাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ দর্শন ঘটল। মহাপ্রভু ও নিতাই একে অন্যকে চিঁড়া খাওয়ালেন—

সকল-লোকের চিঁড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিঁড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস॥
হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥ শ্লোক ৭৭-৮০, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ একত্রে চিঁড়া ভোজন করলেন। নিত্যানন্দের সেখানে নানা ভাবাবেশ ঘটল। রঘুনাথকে কৃপা করলেন উভয়েই। মহাপ্রভু নিজে নিত্যানন্দের প্রেমের বশ। সন্ধ্যায় রাঘব মন্দিরে কীর্তনের আসরে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করেন মহাপ্রভু—

তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিঁড়া রাখিলা ডাহিনে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবেহ চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিলা, 'হরি বলি' করহ ভোজন'।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
'হরি' 'হরি বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ॥

....

মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন।

সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন।। শ্লোক ৮৩-১০৩, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ

একমাত্র মহাপ্রভুর নৃত্যই নিত্যানন্দের নৃত্যের সঙ্গে তুলনীয়। এরপর নৃত্যান্তে বিশ্রামের জন্য নিতাইগণসহ প্রত্যেকেই রাঘবের গৃহে নৈশভোজ করলেন। নিতাই-এর দক্ষিণে রইল মহাপ্রভুর ভোজনাসন।

সকালবেলায় গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট নিত্যানন্দকে চৈতন্য চরণপ্রাপ্তির ইচ্ছার কথা জানালেন রঘুনাথ। নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া চৈতন্যপদ প্রাপ্তি অসম্ভব। তিনি যদি কৃপা করেন, তবে অযোগ্যজনও চৈতন্যচরণ লাভ করতে পারে। তাই নিত্যানন্দ গুরুর কাছে তিনি চৈতন্য পদলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিত্যানন্দ শুদ্ধ ভক্তদের অনুরোধ করলেন রঘুনাথকে আশীর্বাদ করার জন্য। নিত্যানন্দ রঘুনাথের শিরে পদস্থাপন করে তাঁর প্রভুকৃপা-প্রাপ্তির প্রার্থনা করলেন। সেখানে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। রঘুনাথের প্রতি কৃপাও করেছেন গৌরচন্দ্র। রঘুনাথ যে গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভৃত্য হবেন একথা বললেন নিত্যানন্দ—

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।

ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে।।

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।

'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে।।

নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন।

অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ।।" শ্লোক ১৪১-১৪৩ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ

রঘুনাথ নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন—

তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।

নিত্যান্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা।। শ্লোক ১৫৪, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ

মহাপ্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখতে পুরী যাত্রা করলেন—

নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।

তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি।। শ্লোক ১০, অন্ত্য, দ্বাদশ পঃ

নিত্যানন্দ অপ্রাকৃত ব্রজ-গোপবালকের বেশে ক্ষুধা নিবৃত্তি না হওয়ায় শিবানন্দের প্রতি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করলেন। নিত্যানন্দের দেওয়া অভিশাপ বাক্য শুনে শিবানন্দ কাঁদতে লাগলেন। শিবানন্দ পত্নীকে আশ্বাস দিলেন যদি নিত্যানন্দের প্রসাদে তাঁর পুত্ররা মারা যায় তবে তাঁর সৌভাগ্যের কারণ। নিতাইয়ের পদাঘাতেও শিবানন্দ আনন্দিত হলেন। তারপর গৃহে গিয়ে তাঁকে স্থাপন করলেন তিনি—

নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে ব্যাকুল হঞা।

শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা।।

'তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোখে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল'।।
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটী হৈতে আইলা।।
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
'পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা'।।
তেঁহো করে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা।।"
এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু নিত্যানন্দ।।
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া।।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা।। শ্লোক ১৯-২৬, অন্ত্য, দ্বাদশ পঃ

নিজেকে ভৃত্য জ্ঞানে নিত্যানন্দর ভর্ৎসনাকে করুণা বলে ধরে নিলেন তিনি। সর্বেশ্বর ঈশ্বরমূর্তি নিত্যানন্দের পদধূলি লাভেই ভক্তের গৌরাঙ্গ তথা কৃষ্ণভক্তি লাভ ঘটে। স্তুতি শুনে নিত্যানন্দ বিশেষ প্রীত হলেন। তিনি শিবানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। নিত্যানন্দের হাসি-ক্রোধও আসলে প্রচ্ছন্ন পরম কৃপা ও কল্যাণের সূচক। কেননা তাঁর চরিত্রই বিপরীত। তার পদাঘাত ও কৃপা সমার্থক —

শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন।।
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসাস্থান।।
নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত'।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত।।
শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান।।
"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
'ঠাকুরালী' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি"।।
এত বলি শ্রীকান্ত, বালক আগে চলি' যান।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান।। শ্লোক ৩১-৩৬, অন্ত্য, দ্বাদশ পঃ

নিত্যানন্দকে প্রভু বললেন যে তিনি যেন বার বার নীলাচলে না আসেন। ভক্ত ও ভগবান পরস্পরের প্রেমবদ্ধ বলেই উভয়ের বিচ্ছেদে উভয়ের বিষাদ হবে—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে?
আইলেন আচার্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি'।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি।।
মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা।।
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবার লাগিয়া।।
সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন?
দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ।
তাহাঁ বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন।।" শ্লোক ৬৯-৭৪, অন্ত্য, দ্বাদশ পঃ

নিত্যানন্দকে তিনি গৌড়ে থাকতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তবু যে কেন তিনি বার বার নীলাচলে আসেন। প্রভু তাঁর ভক্তদের এই পরিশ্রমে ব্যথার্ত হন—

নিত্যানন্দে কহিলা—"তুমি না আসিহ বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার"।।
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা।।
নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে?
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর।।[১০]

শ্লোক ৮১-৮৪, অন্ত্য, দ্বাদশ পঃ

শ্রীচৈতন্যের জীবনে সবচেয়ে বেশি লৌকিক ও অলৌকিক প্রেমাশ্রু প্রদর্শনে কৃষ্ণদাস অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কেমন করে যুগের সব মানুষকে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দ 'কোল' দিয়েছিলেন, তা কৃষ্ণদাস দেখিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ একাধারে চরিত এবং চরিতামৃত হয়ে উঠেছে। এই কাব্যই ইতিহাস ও দর্শন, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়ে উঠেছে। চৈতন্যজীবনের আদর্শ দৈন্য বিনয়, তা তিনি দেখিয়েছেন। তাই জীবনী বা চরিতসাহিত্যের আর এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছেন কবিরাজ গোস্বামী। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। এঁরা বৈষ্ণব মহাজন,—"রাজেন্দ্র, আর আমি দীন-

হীন—মহাজনের পথই আমার পথ''। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যেন আমরা সেই সুর ধ্বনিত হতে শুনি। 'পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষা লব্ধ ধনে'।[১১]

'গৌরাঙ্গবিজয়' ঃ চূড়ামণি দাস— ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি আদ্যন্ত খণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি হতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কোনো গ্রন্থেও এর উল্লেখ নেই। কাজেই অনেকেরই এই গ্রন্থ এবং কবির নাম জানা নেই। তবে পদকল্পতরুতেও চূড়ামণিদাসের ব্রজবুলিতে রচিত একটি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। এছাড়া রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি পদসঙ্কলন গ্রন্থে চূড়ামণি ভণিতাযুক্ত মোট ৯টি পদ পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থটিকে কবি 'ভুবনমঙ্গল' নামেও অভিহিত করেছিলেন। গ্রন্থটির শেষে ১০৯ পৃষ্ঠায় আছে—

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব।
গৌরাঙ্গবিজয় তিন খণ্ড পূর্ণ হৈব।।

এখানে কবি স্পষ্টই 'গৌরাঙ্গবিজয়' নাম উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের যে দ্বাদশ জন ভক্ত দ্বাদশ গোপাল নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কবি তাঁর গুরু ধনঞ্জয়ের নিকট চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনের অনেক ঘটনা শুনেছিলেন। এছাড়া নিত্যানন্দ সেবক গদাধরদাস, রামদাসও তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। নিত্যানন্দ জীবিতকালে যখন তাঁর শিষ্য গদাধর ও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করতেন, তখন চূড়ামণিদাস সেইসব কথা কিছু কিছু শুনেছিলেন। এরপর নিত্যানন্দের তিরোধানের পর চূড়ামণিদাস গৌরাঙ্গবিজয় রচনা করেন। এই গ্রন্থের মাঝে মাঝেই তিনি লিখেছেন স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে নিত্যনন্দের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করেন—

সুস্বপ্ন-গোচর নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।
জন্মতিথি-পূজা চূড়ামণি দাস পাএ।।

নিত্যানন্দের তিরোধানের কিছু পরে অর্থাৎ মনে হয় সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয় রচিত হয়েছিল।

কবি এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের জন্মস্থান এবং পিতা-মাতার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

বলদেব জন্ম হইল শ্রীখলপপুরে।
জনক মুকুন্দ পদ্মাবতীর উদরে।।

পরে উল্লেখ করেছেন—

জন্মিয়াছে নিত্যানন্দ রাঢ়ে দেখো গিা।।

নিত্যানন্দের জন্ম হয়েছে শুনে সকল মানুষ ধেয়ে চলেছে পদ্মাবতীর গৃহে। মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর যত সহচর ছিল সকলকে নিয়ে শ্রীখলপপুরে পদ্মাবতীর

গর্ভবাসে উপস্থিত হল। মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দমুখদর্শন হল। নিত্যানন্দের পিতা-মাতাকে তিনি বললেন, আজ আমার সব জয় করা হল এবং নিত্যানন্দের মুখদর্শনে আমার জীবন ধন্য হল—

নিত্যানন্দ আসি পুরীমুখ দেখি হাসি।।
ভাল মোর মন্দিরে আসিয়া পুরীরাজ।
সর্ব্বজয় কইল সিদ্ধ হইল সর্ব্বকাজ।।
ইহা বলি জানাইল মা বাপের তরে।
মাধবেন্দ্র উল্লসিত কহে সভাকারে।।

কবি এখানে নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলে গ্রহণ করেছেন—

নিত্যানন্দ আর বলরাম অভেদ।
নিত্যানন্দ বলরাম নাঞিক অন্যথা।।

মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের পিতামাতার মিলনদৃশ্য অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন কবি—

মুকুন্দ পণ্ডিত আসি মাধবেন্দ্র তরে।
আরতি ভকতিভাবে দণ্ডবত করে।।
অন্তরে করএ ভক্তি বাহ্যে আশীর্ব্বাদ।
আয়াসের ছলে ভূমি পড়ি অভিবাদ।।
পদ্মাবতী আসিয়া করিল দণ্ডবত।
পুরী মনে করে দণ্ডবত শত শত।।
পদ্মাবতী কহে অহে ঠাকুর মহান।
মোর নিত্যানন্দে দেহ শ্রীকল্যাণ দান।।
পুরী কহে তন্ত্রে মন্ত্রে রক্ষ দিমু অঙ্গে।
কহি দিমু সামুদ্রিক জ্যোতিষের সঙ্গে।।

নিত্যানন্দের মাতা আনন্দিত হয়ে চলে গেলেন। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে স্নেহের আদর করলেন এবং পদ্মাবতীকে ভাগ্যবান বললেন—

মাধবেন্দ্র কহয়ে পণ্ডিত মহাশয়ে।
আনহ এথায়ে দেখি নিত্যানন্দ রায়ে।।
পদ্মাবতী কোলে করি আনে নিত্যানন্দে।
মাধবেন্দ্র কোলে লয়ে পরম আনন্দে।।
মস্তকে বসনে অঙ্গে বুলাইয়া কর।
আবেশে বিবশে কহে প্রেমের উত্তর।।

শুন ভাগ্যবতী পদ্মা পণ্ডিত মহান।
তোমা দুহুঁ সম নাহি কেহো ভাগ্যবান॥

কবি নিত্যানন্দের জন্মপত্রিকা দিয়েছেন এই গ্রন্থে নূতন ভাবে, নূতন রূপে যা আমরা বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিদের গ্রন্থে পাইনি। কিন্তু চূড়ামণি দাস তাঁর গ্রন্থে নিত্যানন্দের জন্মের মাস, তিথি, নক্ষত্র, রাশি এমনকি বারেরও উল্লেখ করেছেন—মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী, অনুরাধা নক্ষত্র, বৃশ্চিক রাশি ও বুধবার। জন্মপত্রিকাটি হল এইরূপ--

কহিলে জনম মাঘে শুক্লা ত্রয়োদশী।
অতি সুলক্ষণ অনুরাধা বিছারাশি॥

কবি এই গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—

জন্মতিথি ত্রয়োদশী আর বুধবারে।

নিত্যানন্দকে দর্শন করার পর মাধবেন্দ্রপুরী সর্বশুভলক্ষণ লক্ষ করলেন এই শিশুর মধ্যে। সেই সম্পর্কে মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন—

সর্ব্বগ্রহ তুঙ্গ পূর্ণ একাবলী যোগ।
সর্ব্ব শুভগ্রহ নিজ ঘরে করে ভোগ॥

এই সমস্ত কথা শুনে পদ্মা, মুকুন্দ আনন্দিত হলেন। মাধবেন্দ্রপুরী মুকুন্দের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করলে পদ্মাবতী অতি যত্ন সহকারে তাঁর আহারে ব্যবস্থা করলেন—

আদরে পায়স সিদ্ধ করে পদ্মাবতী।
পতিরে কহয়ে ডাকি আন মহামতী॥
নমস্করি কহে দ্বিজ মাধবেন্দ্র তরে।
সমর্প পায়েস কৃষ্ণে আসিয়া মন্দিরে॥
মূলমন্ত্রে গঙ্গাজল তুলসী প্রদান।
মানস আদরে কৃষ্ণে ভুঁজায়ে প্রমান্ন॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট পুরী করিয়া ভোজন।

নিত্যানন্দ সম্পর্কে সাবধান করে মাধবেন্দ্রপুরী জানালেন এই শিশু সামান্য সন্তান নহে—

পুরী কহে মহাশয়ে শুন সাবধানে।
পুত্রে না করিবে তোমি সামান্য গেয়ানে॥
জত জত সুলক্ষণ কহিয়াছো তোমারে।
তাহা সব মনে ধরি করিবে বিচারে॥

মাধবেন্দ্রপুরী আরও বললেন, যার ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিয়াছে তিনি অতি ভাগ্যবান—

অতি মহাভাগ্যবান পুত্র জার ঘরে।
মহাভাগ্যবান করি লোক ঘোষে তারে॥

সুশীতল সুলক্ষণ সুরূপ সুবুদ্ধি।
জার পুত্র তার ঘরে অষ্ট মহাসিদ্ধি॥

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দের রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। এই গ্রন্থেও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বললেন কবি—

আন এথা নিত্যানন্দ কহে পুরীবর।
আনিলেন নিত্যানন্দ রূপের সাগর॥
পণ্ডিত আনিল নিত্যানন্দ পুরীস্থানে।
কোলে করি কহে পুরী নিভৃত বচনে॥
পুরী কহে মহাপ্রভু নবে মোরে বাম।
কৃষ্ণ কহিছেন প্রভু তুমি বলরাম॥

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রপুরীকে বললেন, আমরা দুই ভাই কৃষ্ণের প্রেমের বশ--

নিত্যানন্দ কহে শুন মাধবেন্দ্রপুরী।
মোরা দুই ভাই প্রেমবেশ বটো তোরি॥

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রপুরীকে বললেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও আমি নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করব—

তুরিত করহ যাত্রা তুমি বৃন্দাবনে।
নিবৃত্তেই হব দেখা গৌরাঙ্গের সনে॥

গৌরাঙ্গের সাহচর্যে গৌড়দেশকে নিত্যানন্দ প্রেমবন্যায় ভাসাবেন কবি এই কথা উল্লেখ করলেন এবং নিত্যানন্দকে প্রেমানন্দসিন্ধু বললেন—

মহাভাবভক্তি-শক্তি দিব গৌড়ে দান।
প্রেমানন্দসিন্ধু নিত্যানন্দ বিদ্যমান॥

বিশ্বরূপ এবং বিশ্বম্ভরের শৈশবের কথা নিত্যানন্দ সেবক গদাধর দাস ও ধনঞ্জয়-এর নিকট এই কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ—

কহিছে নিতাই গদাধর-ধনঞ্জয়ে।
সংসর্গে শুনিঞা আছো কহিলুঁ নিশ্চয়ে॥

কবি বারে বারে উল্লেখ করেছেন, স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশ পেয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন—

স্বপ্নে মোরে নিত্যানন্দ কহিল আপনি।
এই ভাগ্যে কহে সত্য দাস চূড়ামণি॥

কবি এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের নবদ্বীপের আগমনের পূর্বের কাহিনী বর্ণনা করেছেন—

এখনে জে কহো কিছু কর অবধান॥

নিত্যানন্দ আসিবেন নদীয়া নগরে।
তাহা সনে কথা মোর হৈব বিস্তরে॥
জার জত জন্ম কর্ম্ম ভক্তিরসভাব।
জার যত প্রকাশব আপন ভাব॥
জারে জত দিমু ভক্তি প্রেমানন্দ রস।
জারে জারে দিমু রস-উন্মাদ যশ॥
যত যত অবতার পর পরাৎপর।
তার প্রিয় পরিষদ ভৃত্য সহচর॥
একে একে সভাকারে দিমুঁ ভক্তিরস।

....

জে কিছু কইল আমি দিগন্দরশিত।
নিত্যানন্দ আসি সব করিব বিদিত॥

চূড়ামণি দাস নিত্যানন্দের কৃপায় গৌরাঙ্গের বাল্য লীলারঙ্গ রচনা করেছেন। এই কথাও তিনি স্বীকার করেছেন—

নিত্যানন্দপ্রভু-শক্তি ধনঞ্জয় ধরে।
কটক-উজ্জ্বল বলি কহিতেন তাঁরে॥
তাঁর বলি কৃপা কৈল নিত্যানন্দ রাএ।
গৌর-বাল্যরঙ্গ চূড়ামণি দাস পাএ॥

নিম্নের এই অংশে কবি বর্ণনা করেছেন নিত্যানন্দের চিত্ত গৌরাঙ্গকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল—

গৌরমন ভাগ হৈল নিত্যানন্দ রায়।
অহে ঠাকুর ভাই হয় ত সহায়॥
তোমা না দেখিয়া মোর প্রাণ বুক ফাটে।
আসিয়া প্রসন্ন হয় প্রেমরস হাটে॥
এতশুনি নিত্যানন্দ চিত্ত উচাটন।
নবদ্বীপ নবদ্বীপ বলে ঘন ঘন॥
গৌর-অনুরাগে কান্দে নিত্যানন্দ রায়ে।
গৌর দেখিবারে চিন্তে পরম উপায়ে॥

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের জন্য ব্যাকুল, তিনি শ্রীবাস-মালিনীকে জানালেন যে তাঁকে নিত্যানন্দ দেখতে আসবেন—

'দেখিতে আসিব মোরে নিত্যানন্দ রায়ে।'

গৌর নিতাইয়ের সাক্ষাতের জন্য ব্যথিত চিত্তে হরি সঙ্কীর্তনের মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠেন। তখন কেউ কেউ ভাবেন গৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই তাঁর দাদা বিশ্বরূপের জন্য কাঁদেন। এই অংশে কবি নিতাইয়ের সাক্ষাৎ-এর জন্য গৌরাঙ্গ বিরহ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলনের অপেক্ষা—

নবদ্বীপ মুখ করি নিরবধি চাহে।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে শুভযাত্রার আয়োজন হল। পিতা-মাতার মনে শোকের ছায়া নেমে এল। স্নেহের বশবর্তী পিতা-মাতার নিত্যানন্দ বিরহের অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করেছেন কবি এই গ্রন্থে। কবি কল্পনা করেছেন যে যমুনার তীরে কৃষ্ণ-বলরাম লীলা প্রকাশ করছিলেন বলে, দীর্ঘকাল গঙ্গা এতে বিষাদ বোধ করেছেন। তারপরে গৌরাঙ্গ গঙ্গাতীবে তাঁর জীবনলীলা প্রকাশিত করলে গঙ্গার এই খেদ মিটে যায়। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গঙ্গায় স্নান করলে, গঙ্গা আরও হর্যান্বিতা হলেন কেননা যমুনা-প্লাবিত কৃষ্ণ-বলরাম লীলা এবার গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মধ্যে সম্পূর্ণতা পেল—

শুভঙ্কর যাত্রা করি জাএ গৌরস্থানে।
এথা নিত্যানন্দ রাএ করি গঙ্গাস্নানে।।
বহুবিধ দণ্ডবত অতৈলে করিয়া।
গঙ্গা প্রবেশয়ে বেদ বিধান করিয়া।।
গঙ্গাস্নান করে প্রভু অতি প্রেমময়ে।
আদরেত গঙ্গাদেবী বিদ্যমান হএ।।
যমুনাএ দুই ভাই করিলে বিহার।
সেই সব মনস্তাপ আছিল আমার।।
গাঢ় অনুরাগে স্তব করিল অপার।
সেই ভাগ্যে গৌর মোর তীরে অবতার।।
তোমা লাগি চিত্তে মোর অনুরাগ ছিল।
তোমার পরশ রস এতদিনে পাইল।।
এতদিনে হইলুঁ মুঞি ত্রৈলোক্যপাবনী।
এতদিনে হইলুঁ মুঞি বৈষ্ণব-জীবনী।।
শিবশির-বাসিনী এতদিনে আমি।
হরষ সরস প্রেম পরশিলে তুমি।।
এত বলি গঙ্গা দেবী পুলক মহান।
মাঘমাসে বাড়ে গঙ্গা অদ্ভুত বান।।
গঙ্গা এ ভাসএ নৌকা লোক পশুগণ।
সর্ব্বলোক করি হরি হরি স্ময়রণ।।

দুকূল ভাসিয়া গঙ্গাজল বহি জাএ।
দেখি নবদ্বীপ-লোক ত্রাস বড় পাএ॥
কৃষ্ণ পূজি শচীসুত করে দণ্ডবত।
হরি হরি বলি ডাকে লোক শত শত॥
কি কি বলি গৌরচান্দ আনন্দে বিহ্বল।
লোক কহে গঙ্গা বানে ভাসাএ সকল॥
এত শুনি গৌর-সিংহ আনন্দে বিহ্বল।
বুঝি প্রভু পরশিল শ্রীগঙ্গার জল॥
ত্বরায়ে দেখএ গৌর শ্রীগঙ্গার বান।
হেন বুঝি নিত্যানন্দ হৈলা অধিষ্ঠান॥
নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ঘণ হেন ভাবে।
শুনিএগ্রাত শ্রীনিবাস আনন্দ আবেশে॥
গৌর কহে শুন অহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
নিতাই-পরশে গঙ্গা এ তাপ খণ্ডিত॥

এরপব কবি বর্ণনা করেছেম নিত্যানন্দের কুলিয়া গ্রামে গমন বৃত্তান্ত। তিনি সেখানে সঙ্কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। এই সংবাদও তিনি দিয়েছেন—

কুলিয়া গ্রামেতে নিত্যানন্দের প্রয়াণ॥
আজি মোর শুভদিন শুভ তিথি বারে।

কবি নিত্যানন্দের রূপের বর্ণনা করেছেন এবং বলরামরূপী নিত্যানন্দ মধুপানে অভ্যস্ত সেকথাও তিনি বলেছেন—

চলিজাএ নিত্যানন্দ গৌর-অনুরাগে।
রূপ দেখি মনমথ রূপলেশ মাগে॥
ছত্রিশ শি [১২৩ ক] রবর ভাল পরিসর,
গোরোচনা চন্দন তিলক সুন্দর॥
শ্যামর চামর কেশ নিতম্ব-চুম্বিত।
সুবেশ লোটন-বন্ধ স্কন্ধ সুলম্বিত॥
উন্নত ভ্রুভঙ্গ যুগ কামের কামান।
দীঘল বিপুল আখি মনমথ-বাণ॥
শ্রীমুখ নাসিকা তুঙ্গ সুনির্মিত কান।
কনক মুকুর গণ্ড হনু অনুপাম॥
সুরঙ্গ অধর চঞ্চু চিবুক সুন্দর।
দ্বিজরাজ পাঁতি যেন পূর্ণ সুধাকর॥

খর্ব্ব গ্রীব কম্বু কণ্ঠ উন্নত স্কন্ধর।
তুঙ্গ সুপীন চারু বক্ষ পরিসর॥
কনকের স্তম্ভ যেন মহা-ভুঙ্গরাজ।
বিপুল নিতম্ব বিম্ব সিংহ-দন্ত মাঝ॥
বলিত কমল পদে মকরন্দ ঝরে॥
ভকত লুবধ ভৃঙ্গ করে মধুপান।

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের জন্য আকুল, দু-নয়নের জল ভিজে গেছে সারা অঙ্গ। ভাবে বিবশ চলেছেন শ্রীনিবাসের বাড়ি। গৌর-নিতাইয়ের সে মিলনদৃশ্য অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন কবি এই অংশে—

গৌর দেখি নিত্যানন্দ করে দণ্ডবত।
গৌর দণ্ডবত করে নিজ অভিমত॥
দুঁহাকার দুঁহু ভক্ত দণ্ডবত করে।
নিবারণ করিবারে কেবা শক্তি ধরে॥
দুঁহাকার পদ-ধূলি দুহে নিতে চাএ।
দুঁহু বড় শক্ত ধূর্ত দুঁহু নাঞি পাএ॥
হাথাহাথী ধরাধরী করি কোলাকোলি।
আবেশে আকুল দুঁহে ভাই ভাই বলি॥
আবেশে আকুল দুঁহু আখিজল বএ।

কবির এর পরের বর্ণনায় দেখা যায় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলছেন, আমাকে তোমার এত স্তব করা নিষ্প্রয়োজন কারণ আমি-তুমি পৃথক নই, একাত্ম—

ভেদে দুই দেহ মোরা এক পরাণ।
এ বেদ বেদায় কহে এসব আখ্যান॥

অতএব লোকচোখে আমাদের দুই দেহ কিন্তু প্রাণ এক—এ কথা গৌরাঙ্গ বললেন নিত্যানন্দকে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলদেব বড় ভাইকে দেখেন, সেইরূপ গৌর নিত্যানন্দকে দেখেন—

শ্রীকৃষ্ণ কহেন বলদেব ঠাকুর।
আজ্ঞা লঙ্ঘি ঠাকুরের বড় ভাইকে করিব দূর॥
তুমি ত বটহ মোর ঠাকুরের ঠাকুর।
এত শুনি নিত্যানন্দ না নিস্মরে রা॥
মনে ধ্যান করি রএ গৌর দুই পা।
প্রদক্ষিণ তবে আজ্ঞা মাগে নিত্যানন্দ॥

চূড়ামণিদাস গৌর-নিতাইয়ের নাটকীয় কথোপকথনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশবিশেষ এইরূপ—

নিত্যানন্দ কহে শুন প্রভু দয়াধর।
কি কাজ করিতে আইলা কোন কাজ কর।।
সর্ব্বলোকে গাওয়াইবে নিজ গুণ নাম।
কৃষ্ণপথী না দেখিয়ে সর্ব্বলোক বাম।।
কলিকাল রীত দেখি সবে কার্য্য করে।
শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ মুখে না নিশ্বরে।।
কৃপার সাগর তুমি কর কৃপা লেশে।
সর্ব্বলোক কর প্রভু অকিঞ্চন দাসে।।
এত শুনি কহে গৌর নিত্যানন্দ ভাই।
কথো দিবসেক আমি পড়িবারে চাই।।
ইহার ভিতর মোর সোপাদি হইব।
তার অন্তে কেবল বিদ্যার্থে রহিব।।
কি কাজ জাইবে প্রভু তুমি প্রদক্ষিণ।
কেনমতে আমার জাইব রাতিদিন।।
সোপাদি আনল মোর দহিব অন্তর।
তোমার বিচ্ছেদ তাপ পার্মু নিরন্তর।।
তিন তাপে প্রাণ মোর হব উচাটন।
কোনমতে হবে প্রভু মোর অধ্যয়ন।।
এত শুনি নিত্যানন্দ বিষাদ হরিষে।
পিরিতি আখ্যানে কহে অমিঞা বরিষে।।
তোমার অধীনে মুঞি নহোঁ সতন্তর।
জেবা নিবেদন করি শুন দয়াধর।।

....

এত শুনি নিত্যানন্দ বিনয়ের ভাবে।
অষ্টাঙ্গ দণ্ডবত করে বিশ্বম্ভরে।।

শ্রীবাস-মালিনী নিত্যানন্দকে প্রেমপ্রীতি ও বাৎসল্যে পরিপ্লাবিত হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন বলেই বিশ্বম্ভর তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। নিত্যানন্দ যে যে স্থানে বাস করেছিলেন, সেইসব অঞ্চলে পরিক্রমা করলেন গৌর-সুন্দর। শয়নমন্দিরে শুয়ে নিত্যানন্দ নিদ্রা যাচ্ছেন দেখে, গ্রামের সব লোক তাঁকে দেখতে এলো। শয়নমন্দিরে আনন্দিত হয়ে সবাই পরম আনন্দে নিত্যানন্দচরিত ব্যাখ্যা করতে বসলেন। নিত্যানন্দ প্রেমে সকলের মনকে মুগ্ধ করলেন। নিত্যানন্দ বস্ত্র-রত্ন দিয়ে প্রভুর বন্দনা করলেন।

নিত্যানন্দকে আনন্দস্বরূপ এক সন্ন্যাসী নারায়ণ রূপ নিতে বললেন। গৌরচন্দ্রের কৃপালাভ অনিবার্য জেনে নিত্যানন্দ পুলকিত হলেন এবং তিনি গুরুকে অন্তরের আকুলতা নিবেদন করলেন। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরকে জানালেন, তিনি কৃষ্ণনাম শেখাবার জন্যই সংসারে এসেছিলেন। কিন্তু কলিকালে কারুর মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরে না। তাই সেই দুরূহ কাজের ভার তিনিই গ্রহণ করবেন—

> সর্বলোকে গাওয়াইবে নিজ গুণনাম।
> কৃষ্ণপথী না দেখিয়ে সর্বলোক বাম।।
> কলিকাল রীত দেখি সবে কার্য্য করে।
> শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ মুখে না নিঃশ্বরে।।

গৌরসুন্দর তখন নিত্যানন্দকে জানালেন যে, তিনি দিনকতক পড়ালেখা করতে চান। নিত্যানন্দও বললেন যে তিনি সর্বভাবে তাঁরই অধীন। তাই জানতে চাইলেন গৌরসুন্দর যখন অধ্যয়ন করবেন, তখন তিনি কী কাজ করবেন। তিনি গৌরচন্দ্রের কাছে বিধাতার অদ্ভুত লীলার কারণ জানতে চাইলেন—

> "মোর জন্ম আগে কৈলে পাছে তোর জন্ম।
> কাহার শকতি বুঝি এ অগাধ কর্ম্ম।"

তখন গৌর নিত্যানন্দকে জানালেন যে গৌর-নিত্যানন্দ এই উভয় অবতারই যুগ্মভাবে কলি কলুষভার মোচন করবেন—

> "সর্বভাবে তোমার আমার অবতার।
> তোমি সখণ্ডিবে কলিকাল দুরাচার।।
> ক্ষত অবতারাবলি যত পরিবার।
> যত যত আছে এ তোমার আমার।।
> সেবক গুরু-কল্প অস্ত্র পারিষদ।
> জত জত সখা বৃন্দ প্রেয়সী যত।
> ভাব ভকতি মহা মহা ভাব অভিযত।।
> কলিকাল-সর্প দর্প নাশিমু সভার।
> কহিতে কহিতে গৌর ভাবেতে বিহ্বল।।[১২]

চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্য পাঠ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর পূর্বে রচিত চরিতকাব্যগুলির প্রসঙ্গ মনে উঁকি দেয়, ফলে পাঠকচিত্ত তৌল বিশ্লেষণের দ্বারস্থ হয়। আসলে একটি হীরকখণ্ডে সূর্যালোক পড়লে যেমন তা নানা রঙে নানা দিকে বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি একই গৌরাঙ্গজীবন নানা জীবনীকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে নবরূপে রূপায়িত হয়েছিল। গৌরাঙ্গের অন্যতম সহচর নিত্যানন্দ সম্পর্কে জীবনীকারদের দৃষ্টিভঙ্গীও নানা বৈচিত্র্যের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। স্বভাবতই নিত্যানন্দ-

কৃপাধন্য বৃন্দাবনদাস অত্যন্ত সবিস্তারে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ যেমনভাবে তুলে ধরেন, জয়ানন্দ ও লোচনদাস সেখানে ভিন্ন ভাবাশ্রয়ে চালিত হয়ে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত মিতবাক্ থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবার ঘটনার অথবা চরিত্রের বিবরণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গজীবন অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে নিত্যানন্দ দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেন। চূড়ামণি দাস তাঁর নিত্যানন্দ 'স্বপ্ন-সঞ্চারী' কাব্যে নিত্যানন্দ সম্পর্কে এমন কিছু অভিনব কথা বলেন, যা অন্যত্র পাওয়া যায়নি।

বৃন্দাবনদাস সম্পূর্ণতই নিজেকে নিত্যানন্দ অনুগৃহীত এবং তাঁর গৌরাঙ্গজীবনী কাব্যকে নিত্যানন্দের কৃপার ফসল বলে বর্ণনা করেছেন। তবে সমস্ত জীবনীকারই গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গের পার্শ্বে বলরামের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনদাসও একই কথা বলেন। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকেই সকল ভক্তের সহিত আদিদেব রূপে বর্ণিত হতে দেখি। গৌরচন্দ্রের সেবাবিগ্রহ এই নিত্যানন্দ সমগ্র জাতিকে শুধু কৃষ্ণনাম নয়, গৌর ভজনায় ভাবিত হতে বলেছেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মধ্যে লক্ষ করেছেন নিত্যশিশুর লীলা বিহার। তাঁর কৃপা ভিন্ন গৌরাঙ্গ কৃপাও সম্ভব নয়। নিত্যানন্দ শুধু বলরাম নন, তিনিই গৌরাঙ্গের মূর্তিমান সেবা বিগ্রহ। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ অপেক্ষাও করুণাঘন প্রেমাবতার। জগাই-মাধাই উদ্ধার পর্বেও তারই প্রকাশ। বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দ বিলাসী, সৌন্দর্যবাদী, জীবনরস রসিক তো বটেই, কিন্তু এতে তাঁর পদ্মপত্রের মতো নির্মল চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শিত হয় না। বরং নিত্যানন্দ যেন বিষমুখ নীলকণ্ঠ। সুতরাং বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের সম্পর্কে সমকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই নিত্যানন্দ নিন্দুকদের প্রতি তিনি অসহিষ্ণুও হয়েছেন। এক কথায় চৈতন্যভাগবতে আমরা যে নিত্যানন্দকে পাই, তিনি যত না দার্শনিক, তার চেয়ে অনেক বেশি জীবনরসবাদী। তাত্ত্বিকতা অপেক্ষাও এক বাস্তব, করুণাপ্লাবিত, দৃঢ় চরিত্রের মানুষকেই আমরা বৃন্দাবন-দাসের নিত্যানন্দের মধ্যে খুঁজে পাই।

লোচনদাসের দৃষ্টিভঙ্গীতেও নিত্যানন্দ বলরাম অবতার। জ্ঞানমার্গ থেকে তিনি ভক্তিমার্গে উপনীত হয়েছেন। যদি নিত্যানন্দ একবার কোনো ভক্তের দ্বারা পূজিত হন, তবে তিনি চিরকালের মতো গৌরাঙ্গের অনুগৃহীত হয়ে যান। এই মত প্রকাশের দ্বারা নিত্যানন্দ সম্পর্কে লোচনদাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন। লোচন-দাসের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দ শুধু বলরাম অবতার নন, গৌর ও নিতাই অভিন্ন শক্তি প্রকাশও বটে। নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গের ঘটনাটিকে লোচনদাস তাত্ত্বিকতা অপেক্ষাও মানবিক ব্যথা-বেদনার প্রতীকরূপেই দেখাতে চেয়েছেন।

জয়ানন্দও নিত্যানন্দকে একই ভাবে বলরাম অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের মতোই নিতাই-এর উদ্দাম জীবনোল্লাসকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার পর্বে নিত্যানন্দের করুণাবতার রূপটিকে তুলে ধরেছেন জয়ানন্দ।

পানিহাটি গ্রামে নিত্যানন্দ লীলার সবিস্তার বর্ণনা করতে গিয়ে জয়ানন্দ এই লীলাকে যথেষ্ট সংক্ষিপ্তই রেখেছেন। অন্তত বৃন্দাবনদাস এই পর্বে আরো বিশদ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অত্যন্ত সবিস্তারে নিত্যানন্দ দর্শনের আলোচনা করেছেন। নিত্যানন্দ সেখানে সঙ্কর্ষণ মূর্তি। শুধু বলরামই নন, নিত্যানন্দ রামরূপ গৌরাঙ্গের লক্ষ্মণ-সেবক। তবে কৃষ্ণদাসের নিত্যানন্দ শুধুই তত্ত্ব-শরীর নন, তিনি জীবনরসিক কৌতুক মূর্তিও বটে। যেভাবে সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে যমুনা ভ্রমে প্রলুব্ধ করিয়ে তিনি তাঁকে মাতৃদর্শনে পুনরায় গঙ্গাতীরে নিয়ে আসেন, তাতে তাঁর মধ্যে তাত্ত্বিকতা থাকলেও জীবনের রসরহস্যও কম নেই। আবার গজপতি রাজা গৌরাঙ্গের কৃপা বিহনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প নিলে নিত্যানন্দ যেভাবে তাঁকে গৌরাঙ্গের একখানি বস্ত্র দান করে সমস্যার সমাধান করলেন, তাতে নিত্যানন্দের বাস্তব বুদ্ধিও প্রশংসনীয়। একই দণ্ডভঙ্গের ঘটনা অন্য কবিরা যেখানে তাত্ত্বিক অর্থে প্রযুক্ত করেছেন, কৃষ্ণদাস সেখানে নিত্যানন্দের কৌতুকরসাশ্রিত বাস্তব বোধের উল্লেখ করেছেন। লোচনদাসের কাব্যে নিত্যানন্দ বলেছিলেন, যে দণ্ডে সর্ব দেবতাদের অধিষ্ঠান জেনেই তিনি তাকে ইচ্ছাপূর্বক ভেঙেছেন। আর কৃষ্ণদাসের নিত্যানন্দ স্মিত হাসিতে উচ্ছল হয়ে জানালেন যে নৃত্যরত অবস্থায় দণ্ডের উপর পড়ে যাওয়াতে তাঁর অগোচরেই দণ্ডটি ভেঙে গেছে। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের তুলনায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও কৃষ্ণদাসের নিত্যানন্দ মূল্যায়ন বেশ অভিনব।

চূড়ামণি দাস বিশেষভাবেই উল্লেখ করেন যে নিত্যানন্দ-স্বপ্ন থেকেই তাঁর এ কাব্যের প্রয়াস। এই কাব্যে নিত্যানন্দের জন্মপত্রিকার বিশদ আলোচনা করেছেন কবি। সেই সঙ্গে গঙ্গায় নিত্যানন্দের জলকেলি প্রসঙ্গে যমুনার প্রতি ঈর্ষান্বিত গঙ্গার হর্ষের প্রকাশ বর্ণনা করেন কবি। এই ঘটনাটিও সম্পূর্ণই অভিনব। এক কথায়, একই নিত্যানন্দ চরিত্র নানা কবির নানা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে চরিতগ্রন্থগুলিতে।

'নিত্যানন্দ চরিতামৃত' ঃ বৃন্দাবনদাস— এই গ্রন্থটি বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত। এটি জাল গ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থের মধ্যে অভিনব কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব আমরা জাল গ্রন্থ বলে কোনো বিতর্কে যাব না। শুধুমাত্র বলতে পারি, এই গ্রন্থটি সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করেছে। এখানে আমরা নিত্যানন্দের জন্মলীলা, শৈশবে সখাদের সঙ্গে বাল্যলীলা, গৃহত্যাগ করে সমস্ত তীর্থ পর্যটন এবং তৎপরে পশ্চিম ভারতে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। স্বয়ং মাধবেন্দ্রপুরী গৌরাঙ্গের শুদ্ধা ভক্তিধর্মের আদি সূত্রধার—

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হৈল দরশন।।
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।

কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার॥

মাধবেন্দ্রের দেহে কৃষ্ণের বিহার এই কথাও বললেন কবি। নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র উভয়ের মিলনে উভয়েই প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এরপর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দের মিলন। নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীবাসগৃহে অবস্থান। শ্রীবাস ও তাঁর পত্নীকে নিত্যানন্দের মাতা-পিতা জ্ঞান। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্তুতি করলেন মধ্যখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে—

স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব ভক্তগণ॥
নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ-রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"

কবির পরের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই নিত্যানন্দ গৌড় দেশে ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম এবং জীবপ্রেম প্রচার করেন। এরপরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জগাই-মাধাই উদ্ধারপর্বে দুই পতিতকে উদ্ধার করে তিনি হলেন 'করুণাবতার'। মাধাই নিত্যানন্দকে আঘাত করার পর অনুশোচনা করে নিতাইয়ের পদতলে পড়ে নিত্যানন্দকে স্তুতি করলেন—

দুইজনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ।
প্রভু বলে, 'তোরা আর না করিস পাপ।'
জগাই মাধাই বলে, আর নারে বাপ॥

এরপরে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ পরিকল্পনায় নিত্যানন্দের সঙ্গে যুক্তি, নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গ লীলা, সার্বভৌমসহ সপার্ষদ নিত্যানন্দের মিলন ও জগন্নাথ দর্শন, সপার্ষদ

নিত্যানন্দের গৌড়ে আগমন ও নিত্যানন্দের রাঘব গৃহে রাজোচিত বেশে অভিষেক, সপ্তগ্রাম সমাজের নিপীড়িত বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ধারের পালা, হিরণ্য পণ্ডিত গৃহে চোর-দস্যুর উদ্ধার, অবধূত নিত্যানন্দের চরিত্রে বিপ্রের সন্দেহ এবং নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে নালিশ ও গৌরাঙ্গের আদেশে নিত্যানন্দের বিবাহলীলা সম্পর্কেও বেশ কিছু অভিনব তথ্য জানা যায়। অন্ত্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায়ে গৌরাঙ্গ নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে বিবাহের জন্য গৌড়বঙ্গে পাঠালেন—

তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার॥
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে॥

গৌরাঙ্গের এই আদেশ পালন করে নিত্যানন্দ গৃহী জীবনযাপন করলেন—

মন হৈল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট॥
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম।
প্রকট করিল তাহা আত্মলীলা ধাম॥
গৃহাশ্রমীধর্ম প্রভু সকলি করিল।
'শ্যামসুন্দর বিগ্রহ' সেবা প্রকাশিল॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে॥
দুই প্রিয়া সঙ্গে নানারস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া॥
দুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমে ভোর॥

বসুধা গর্ভে বীরচন্দ্রের জন্ম—

ধন্য ধন্য বসু লক্ষ্মী বলে সর্বজন।
পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্র বদন॥

গৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর নিত্যানন্দের তিরোধান হয়—

চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদা বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদাচৈতন্য ধেয়ান।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া চৈতন্য গুণ গায়॥

নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে গৌর মূর্ত্তি।।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।।
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা।।
তথা হৈতে একচাকা করিলা গমন।
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা।।[১৩]

'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার' ঃ বৃন্দাবনদাস— বৃন্দাবনদাসের এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিশেষজ্ঞগণ এ গ্রন্থের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের চরিতকথা ও পত্নী জাহ্নবাদেবীর কথাই উপজীব্য (অ-কু-ব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩)। চৈতন্যভাগবতে যে যে অংশ স্থান পায়নি, সেই অংশই এই গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়। বৃন্দাবনদাস জাহ্নবাদেবীর ঐশ্বর্য প্রকাশ বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। জাহ্নবাদেবী দিব্য বসন পরিধান করে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে কৃষ্ণের ব্যঞ্জনের থালা হস্তে নিত্যানন্দকে পরিবেশন করছেন। তখন হঠাৎ তাঁর অবগুণ্ঠন বস্ত্র পড়ে যায়, জাহ্নবার দুই হস্ত আবদ্ধ, তিনি কীরূপে বস্ত্র সংযত করবেন—এই সংকটে নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবাদেবী একটি ঐশ্বর্যলীলা প্রকাশ করলেন। তিনি সর্বশক্তি সমন্বিতা এবং অলৌকিক লীলাকারিণী—

একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায়।।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বার বার শ্রীজাহ্নবা দিচ্ছেন ব্যঞ্জন।।
সূর্যাদাসের কন্যা হয়েন বসুর কনিষ্ঠা।
বাল্যাবস্থাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা।।
পারশিতে শ্রীমস্তকের বসন খসিল।
আর দুই ভুজে বাস সংভ্রম করিল।।
তাহা দেখি নিত্যানন্দ মনে বিচারিল।
এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল।।
আচমন করি প্রভু পালঙ্কে বসিলা।
এইকালে বসুলক্ষ্মী আসিয়া মিলিলা।।
আকর্যিয়া প্রভু বসাইল বাম পাশে।
প্রভু স্পর্শ পাই দেবী সুখরসে ভাসে।।

মৃদু মন্দ হাসি কর্পূর তাম্বুল লইয়া।
প্রভুর অধরে দেন হর্ষযুক্ত হইয়া॥
সেইকালে শ্রীজাহ্নবা তথাতে মিলিলা।
প্রভু দেখি অতিশয় লজ্জাযুক্ত হৈলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইলা জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া॥
এই মোর প্রাণপ্রিয়া হৃদয়ে জানিয়া।
তার পরদিনে প্রভু মনে বিচারিয়া॥

এরপরের বর্ণনায় নিত্যানন্দ কর্তৃক জাহ্নবাকে বিবাহ প্রসঙ্গ--

সূর্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
জৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা॥[১৪]

এই গ্রন্থটি যে বৃন্দাবনদাসের তা কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। অতএব গ্রন্থটি বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত এবং একটি 'জাল গ্রন্থ' বলে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং এ জাতীয় গ্রন্থ সম্পর্কে বিশদ বিতর্কে না যাওয়াই শ্রেয়।

সপ্তদশ শতক

'প্রেমবিলাস' ঃ নিত্যানন্দ দাস — এই গ্রন্থটির রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস। এঁর পূর্বনাম বলরাম দাস। জাহ্নবাদেবী তাঁর দীক্ষাগুরু। জাহ্নবাদেবীর আজ্ঞাতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদি আচার্যদের কাহিনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী এই গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়। এই গ্রন্থের মধ্যে নিত্যানন্দের জন্মবৃত্তান্ত কাহিনী এবং নিত্যানন্দ যে চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন নিত্যানন্দ দাস।

রাঢ়দেশে এক চাকা বলি এক গ্রাম।
তাহাতে আছয়ে বিপ্র অতিগুণবান্॥
হাড়াই পণ্ডিত তাঁর পত্নী পদ্মাবতী।
তাঁহার উদরে জন্ম হইল সম্প্রতি॥
রাম নবমীর দিনে গর্ভের সঞ্চার।
মাতা-পিতার চিত্তে সুখ বাঢ়িল অপার॥
দিনে দিনে গর্ভ বাঢ়ি দসমাস হৈল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনে আনন্দ বাঢ়িল॥
মাঘমাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
সর্ব্বসুলক্ষণে জন্মিলেন সেই ক্ষণে॥
নাম দিলেন নিত্যানন্দ আনন্দ সকল।

ক্ষণে স্তব্ধ হঞা থাকে হাসে খল খল॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা।
একদিন সন্ন্যাসী আসি গৃহে উত্তরিলা॥
ভিক্ষা করাইল তাঁরে আনন্দিত মনে।
সুখী হৈয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচনে॥
হাড়াই পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন।
এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ কৈল অঙ্গীকার।
মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার॥
বৃদ্ধকালে মোরে লঞা তীর্থ করাইবে।
সর্ব্বসুখ হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে॥
বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা।
সেইকালে নিত্যানন্দে সঙ্গে লঞা গেলা॥
তাঁরে শিষ্য কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ।
অবধূতবেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ॥
নন্দনন্দনের ভাবে গর গর মন।
কিবা করে কোথায় রহে বাহ্য নহে মন॥
আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয়।
একদিন নিত্যানন্দে হাসিয়া কহয়॥
ভ্রমণ করিল তীর্থ যতেক আছয়।
এ কার্য্য করহ বাপু সব সিদ্ধ হয়॥
অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন।
তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন॥

অতঃপর ঈশ্বরপুরীর আদেশে বহুতীর্থ পর্যটন শেষে তিনি নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-অবতার দর্শনে যাত্রা করেন—

১৯ বিলাসে কবি লিখেছেন, জাহ্নবার আটজন পুত্রের মধ্যে সাতজন অভিরাম গোস্বামীর প্রণামে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু অষ্টম পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গা জীবিত থাকেন। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে—জাহ্নবা নিঃসন্তান। বসুধারই সন্তান পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গা—

বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল॥
আমার শ্রীঠাকুরাণী অষ্ট পুত্র হয়।
অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ অজয়॥

শেষপুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম।
বীরচন্দ্র চরিতে লিখিল তাহার আখ্যান।।

এরপর কবি গঙ্গার বিবাহের বর্ণনা দিলেন। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে তাঁর শিষ্য মাধব আচার্যের বিবাহ হয় সেই সংবাদ প্রেমবিলাসকার দিয়েছেন---

মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ।
নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত পরমকুলীন।।
নিত্যানন্দ শিষ্য নিতাই বিনা নাহি জানে।
সদাই করহে তিঁহ নিতাইপদ ধ্যানে।।
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যা দান।।
বিবাহ করিল মাধব গুরুর আজ্ঞাতে।
গুরু-আজ্ঞাবলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে।।
ঈশ্বরীর মহিমা কিছু বোঝা নাহি যায়।
অঘটন-ঘটন হয় ঈশ্বরী ইচ্ছায়।।
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।।
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদে এই পরতেক।।
মাধব-আচার্যকে শান্তনু বলি কয়।
দ্রবময়ী গঙ্গা এই গঙ্গাদেবী হয়।।
মাধব আচার্য্যস্থানে বাদ্যশিক্ষা কৈল।
কৃপা করি তিঁহ মোরে বাদ্য শিক্ষা দিল।।

এছাড়াও বীরভদ্র জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁর অনেক শিষ্যের মধ্যে রামভদ্র একজন—এই কথাও কবি জানালেন। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যে সংবাদ বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, জয়ানন্দ মিশ্র দিতে পারেননি কিন্তু নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস থেকে আমরা নূতন সংবাদ পাই[১৫]।

অষ্টাদশ শতক

'ভক্তিরত্নাকর' ঃ নরহরি চক্রবর্তী বা শ্রীল ঘনশ্যাম দাস— এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত বিশেষ আলোচনা আছে। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ-সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। দুই যুগের ভক্তবৃন্দের জীবনী এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও সমসাময়িক ভক্তদের জীবনী এবং পরবর্তী ভক্ত পরিকরদের

জীবনী এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের জীবনী বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থানুসারী হলেও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিবাহ, স্ত্রী-পুত্রাদির সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের কবি ঘনশ্যাম বিস্তৃতভাবে নিত্যানন্দের বিবাহ, স্ত্রী-পুত্রাদির বর্ণনা করেছেন। কবি এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের চরিত্র বর্ণনা করতেও কম পটু নন। ঘনশ্যাম অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। তিনি বলেছেন আমার গ্রন্থের কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে, একচক্রা-নিবাসী অজ্ঞাতকুলশীল এক বৃদ্ধ বিপ্রের কাছ থেকে। ঐসব কাহিনী শুনেই একাদশ তরঙ্গে নিত্যানন্দের জন্মাদি লীলার বিবরণ লিখেছেন—

শ্রী পদ্মাবতীর গর্ভ-সঞ্চার হইতে।
হৈল মহানন্দলাভ হাড়াই পণ্ডিতে।।
ধন্য ধন্য হাড়াই পণ্ডিত বিপ্রবর।
ধন্য পদ্মাবতী, ধন্য তাঁহার উদর।।
মহাশুভক্ষণে পদ্মাবতীগর্ভ হৈতে।।
জন্মিল বালক—তাঁর তুলনা কি দিতে?
পুণ্যবতীগণ সে বালক নিরখিয়া।
করে আশীর্ব্বাদ অতি বিহ্বল হইয়া।।
কেহ কহে—'এ যেন বালক কভু নয়।
হেম-নবনীতের পুতলী বুঝি হয়'।।
কেহ কহে—'এমন বালক নাই দেখি।
দেখিতে ঘুচিল তাপ, জুড়াইল আঁখি'।।
এইরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে।

নিত্যানন্দের জন্ম হয়েছে শুনে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে বহু লোকের সমাগম হল। পুত্রের কল্যাণের জন্য হাড়াই পণ্ডিত আনন্দিত মনে অর্থ দান করলেন। নিত্যানন্দ হাড়াই এবং পদ্মাবতীর প্রাণ। নিত্যানন্দের অন্নপ্রাশনকালে মহা আনন্দ হল এবং অনেকে নিত্যানন্দের নানা নাম রাখলেন। কেউ রাম, কেউ আবার নিত্যানন্দ। এই নিত্যানন্দ পিতা-মাতার যেমন নয়নের নিধি, তেমনি পাড়াপড়শীদের প্রাণ।

বাল্যক্রীড়াচ্ছলে নিত্যানন্দ ব্রজলীলার খেলা প্রদর্শন করেছেন। সেই প্রসঙ্গে কবি এখানে বর্ণনা করেছেন—

করিলেন খেলার আরম্ভ নিত্যানন্দ।
পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাহি গন্ধ।।
কৌমার বয়সে হৈল পৌগণ্ড প্রবেশ।
দিনে দিনে বাড়ে খেলা অশেষ বিশেষ।।
শতাধিক বর্ষ হৈল বয়স আমার।

না দেখি না শুনি ঐছে খেলা চমৎকার॥
যে যে অবতারে শ্রীকৃষ্ণের যে যে লীলা।
তাহা বিনু নিতাইচান্দের নাই খেলা॥
যে খেলা খেলিব তার পূর্ব্বে শিশুগণে।
তদনুকরণ শিখায়েন জনে জনে॥
এই নদীতীরে দেখ স্থান মনোহর।
এখানে খেলেন পদ্মাবতীর কুঙর॥
যৈছে দেবতার আরাধনার সত্বরে।
জন্মিলেন বাসুদেব-বসুদেবের ঘরে॥
বাসুদেব লৈয়া বসুদেব কংসভয়ে।
নন্দালয়ে গেলা যৈছে---এ-খেলা খেলয়ে॥
কৃষ্ণজন্ম-উৎসব যেরূপ নন্দঘরে।
যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাসরে॥
যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধপানে পূতনা বধিলা।

কবি এই গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা এবং রামলীলা অনুকরণে নিত্যানন্দ যে সকল শৈশবোচিত খেলা করতেন, তাঁর বর্ণনা দিলেন ঘনশ্যাম দাস একাদশ তরঙ্গে অপূর্বভাবে।

এরপর নিত্যানন্দ শিক্ষা আরম্ভ হল। অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যালাভ করলেন---

অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ॥
নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশ বৎসর।
ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর॥

নিত্যানন্দের বিবাহ দেওয়ার জন্য তাঁর বন্ধুরা হাড়াই পণ্ডিতকে উৎসাহিত করলেন। পুত্রের বিয়ের জন্য হাড়াই উৎকণ্ঠিত, একচক্রাবাসীর মনেও আনন্দ। বিবাহের কন্যাও স্থির করা হল, কিন্তু এই বিবাহ আর হল না। কারণ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করলেন—

কোথা হৈতে আইলা এক সন্ন্যাসী গোসাঞি।
সর্ব্বাংশে সুন্দর, তাঁর দয়ামাত্র নাই॥
হাড়াই পণ্ডিত তাঁরে ভিক্ষা করাইলা।
কৃষ্ণকথা-রসে তেঁহ রাত্রি গোঙাইলা॥
গন্তুকালে নিত্যানন্দে নিলেন মাগিয়া।
দিলেন হাড়াই পুত্রে পূর্ব্ব বিচারিয়া॥

নিত্যানন্দে লৈয়া ন্যাসী চলিলা তুরিতে।
হাড়াই মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে।।
প্রাণহীন-প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি।।
কি নারী, পুরুষ যত এ' একচক্রায়।
এ কথা শ্রবণ-মাত্রে হৈল মৃত্যুপ্রায়।।

কবি নিত্যানন্দের পিতা-মাতা, তাঁর সঙ্গীসাথীগণ, পাড়াপড়শীদের এবং তাঁর এক ভ্রাতার বিলাপের কাহিনী অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন—

নিতাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহেন কাঁদিয়া।
'মোরে কেনে সন্ন্যাসী না গেলেন লইয়া'।।

কবি ঘনশ্যাম দ্বাদশ তরঙ্গে নিত্যানন্দ পত্নী বসুধা ও জাহ্নবাকে স্তুতি করেছেন—

জয়-বসু-জাহ্নবার জীবন নিত্যানন্দ।।

দ্বাদশ তরঙ্গে নিত্যানন্দের পিতা-মাতার পুনঃপরিচয়। নিত্যানন্দের জন্মের সময় তিথি ছিল সর্ববিধ শুভ —

হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার।।
সর্ব্বপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত, পদ্মাবতী।
রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে বসতি।।
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
অপার মহিমা গুণ কহিতে না জানি।।
প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্ব্বজনে।
তাঁর ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে।।
নিত্যানন্দ-প্রভু-জন্মতিথি বিলক্ষণ।
কে বা না আরাধে কে না করয়ে বন্দন।।

এখানে কবি পুনরায় লিখেছেন দ্বাদশ বৎসরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন, কিন্তু আমরা একাদশ তরঙ্গে দেখতে পাই একই বর্ণনা—

গৃহে বাস কৈলা দ্বাদশ বৎসর।।
সন্ন্যাসীর ছলে গৃহ হইতে চলিলা।

নিত্যানন্দ বাল্যলীলা সমাপন করে মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দের দীক্ষাগুরুর ব্যাপারে আমরা নানা গ্রন্থে নানা মতভেদ দেখতে পাই। এখানে কবি নিত্যানন্দের গুরু লক্ষ্মীপতিকে বললেন,—গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতির প্রিয় শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়ের আনন্দবর্ধনকারী, ভক্তবৎসল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করি—

দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের নীর॥
বলদেবমূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে।
তাহা দেখি' লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে॥
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারবার।
'মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার অবতার॥
ব্রহ্মাদি না জানে, আনে নারে জানিবারে।
আপনি জানাও যারে সে জানিতে পারে॥
মো ছাড় মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন।
অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ॥'
শ্রীলক্ষ্মীপতির ঐছে বচন শ্রবণে।
হইলেন নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি সেইক্ষণে॥
বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি' রূপের মাধুরী।
লক্ষ্মীপতি অধৈর্য্য হইলা শোভা হেরি'॥
নিত্যানন্দরাম করে করুণা-প্রকাশ।
শ্রীলক্ষ্মীপতির পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥

কবি মাধবেন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের যে সম্পর্ক সেই বর্ণনাও করলেন—

নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্র গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥

নিত্যানন্দ সমস্ত তীর্থ শেষ করে বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর প্রকাশের অপেক্ষায় থাকলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, বৃন্দাবনের কৃষ্ণই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই সংবাদ শুনে তিনি মহা প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে নবদ্বীপে এলেন—

মহা-প্রেমানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
আইলেন নবদ্বীপে দেব হলধর॥

এরপর নন্দন আচার্যের ঘরে এসে নিত্যানন্দ উপস্থিত হলেন। নন্দন আচার্যের গৃহে অতি যত্নে থাকলেন তিনি—

মহাযত্নে নিত্যানন্দচন্দ্রে রাখি' ঘরে।
করাইল ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে॥

নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন এবং শ্রীবাসগৃহে অবস্থান এই সমস্ত তথ্য আমরা চৈতন্যভাগবতে পেয়েছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নিত্যানন্দের পানিহাটীতে আগমনলীলা আমরা এই অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করেছি।

দাসগদাধর গৃহে নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন। দ্বাদশ তরঙ্গে খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করে নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতকে সঙ্কীর্তনসুখের সায়রে ডুবালেন —

খড়দহে আইসেন প্রভু নিত্যানন্দ।
চারিধারে শোভা করে পারিষদবৃন্দ॥
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে কন্দর্পমোহন।
সে প্রেম-আবেশ বেশ বন্দে সর্ব্বজন॥

....

খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্ল্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া॥

ঘনশ্যামের পরের বর্ণনায় নিত্যানন্দের পরিকল্পনা সপ্তগ্রামের সমাজের নিষ্পেষিত নিপীড়িত বণিকদের উদ্ধার করা—

সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস।
নিত্যানন্দপদে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
উদ্ধারণ সম্বন্ধে নিতাই দয়াময়।
বণিকে যে কৃপা কৈল কহিল না হয়॥

নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ তরঙ্গে আমরা নিত্যানন্দের বিবাহের বর্ণনা দেখতে পাই। 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাস প্রমুখ গ্রন্থকারদের গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ক কাহিনী নেই। কিন্তু চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্রের নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ে মাত্র ইঙ্গিত পাই। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর'-এর কবি নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ক কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক, এরপর কৃষ্ণদাসের গৃহে নিত্যানন্দের শুভ বিবাহের অধিবাস সম্পন্ন হল। এই অধিবাস বিষয়ক কাহিনী আমরা অন্য গ্রন্থে পাইনি, একমাত্র কবি ঘনশ্যামের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পাই—

ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ বৈসে চারিপাশে।
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে॥
নেত্র ভরি' দেখে নারী পুরুষ সকল।
হইল মঙ্গলময় বাদ্য-কোলাহল॥

এরপরের বর্ণনায় কবি বসুধা-জাহ্নবার শুভ অধিবাস প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন—

বড়গাছি হৈতে অধিবাস-দ্রব্য লৈয়া।
সূর্য্যদাসালয়ে বিপ্র গেল হর্ষ হৈয়া॥

কহিতে কে জানে—যে কৌতুক অধিবাসে।
দেব-স্ত্রীগণাদি দেখে সে শোভা উল্লাসে॥

কবি ঘনশ্যাম সালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দ রায়।
সূর্য্যদাসালয়ে চলে উল্লাস হিয়ায়॥
নিত্যানন্দপ্রভু পাদপদ্ম-স্পর্শমাত্র।
সালিগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে হইয়া অলক্ষিত।
প্রাণনাথে দেখি' হৈলা মহা উল্লসিত॥
পণ্ডিতের পত্নী নিজ সখীর সহিতে।
হইয়া মহাবিহ্বল দেখিলা অলক্ষিতে॥
সখীগণে লৈয়া কৈলা কন্যার সুবেশ।
দিতে কি উপমা—শোভা হইল অশেষ॥
সূর্য্যদাসালয়ে লোক-ভিড় অতিশয়।
ব্রাহ্মণ-সমাজে যৈছে কহিল না হয়॥
লোক শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
দেখি' পাত্র-কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে হইল জয় জয়॥
সালিগ্রাম নিকটস্থ গ্রামবাসী যত।
দেখিয়া বিবাহ প্রশংসয়ে কেবা কত॥
বিবাহের পরদিন হৈল মহানন্দ।
সর্ব্ব-মনোরথসিদ্ধি কৈল নিত্যানন্দ॥
বিদায়সময়ে সূর্য্যদাস দৈন্য করি'।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়গাছি—হৈল মহানন্দ॥
শ্রীবাসের ভার্য্যা-আদি প্রবীণা সকল।
কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল॥

শ্রীবসু-জাহ্নবা শোভা দেখি' চমৎকার।
হৈল সাধ পূর্ণ মনে যে ছিল সবার।।
শ্রীবসু-জাহ্নবা নিত্যানন্দের প্রেয়সী।

ঘনশ্যাম খড়দহে নিত্যানন্দের গৃহী জীবন-যাপনেরও উল্লেখ করেছেন—

ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া।
রাখিলেন অপূর্ব্ব আলয়ে নিজ প্রিয়া।।[১৬]

'বংশীশিক্ষা'—প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম মিশ্র-র এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।[১৭]

শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় চরিতসাহিত্যে নয়, আধুনিক যুগেও একাধিক গবেষকের রচনায় আমরা নিত্যানন্দ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই।

ঊনবিংশ শতক

'রামরসায়ন' ঃ রঘুনন্দন গোস্বামী— এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ বংশাবতংশ কবি রঘুনন্দন গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের পুষ্পিকায় আত্মপরিচয় প্রদান করতে গিয়ে নিত্যানন্দ থেকে নিজের জীবন পর্যন্ত বংশপরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ রঘুনন্দন গোস্বামী ও তাঁর 'রামরসায়ন' সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলেচনা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুকুমার সেন, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণের গ্রন্থে নিত্যানন্দ বংশাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উত্তরকাণ্ডের শেষ ভাগে গ্রন্থকার লিখেছেন—

দেখিয়া কলির রীতি শিখাইতে কৃষ্ণ রীতি
কৃপাময় প্রভু বলরাম
অবতার করি লোক, নিস্তারিলা সব লোকে,
ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম।
বীরভদ্র তাঁর সুত, তার পুত্র গুণযুত
গোপীজন বল্লভ বিদ্বান।
তাঁর পুত্র গুণধাম শ্রীরাম গোবিন্দনাম
তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান।
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাহার পুত
তার পুত্র বলদেব নাম
তিনপুত্র হন তাঁর সর্ব্বগুণ ভাণ্ডাগার,
জগৎ মাঝারে অনুপাম।।

শ্রীলালমোহন আর শ্রীবংশীমোহন তাঁর
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায় কৃপা করি মো সবায়।।
করয়াছেন মন্ত্র সমর্পণ।
কনিষ্ঠ সদাগুণধাম ভুবন বিখ্যাত নাম।।
বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমতে
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত
সেই প্রভু মোর পিতা ঊষা নাম মোর মাতা
মোর জ্যেষ্ঠ তিনজন বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ
শ্রীমধুসূদন মহামতি।
চারিভ্রাতা বৈমাত্রেয় শ্রীরামমোহন প্রিয়
নারায়ণ গোবিন্দ-আখ্যান
সকলের কনীয়ান বীরচন্দ্র অভিযান
তিন ভগ্নী সদ্‌গুণনিধান।
সহোদর ভগ্নীপতি দীপচন্দ্র মহামতি
চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য
শ্রীরামগোবিন্দ প্রাজ্ঞ শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ
বৈমাত্রেয় ধন্য
পিতা রাশি অনুসারে আর কে নাম মোরে
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা
কৃপা কণা প্রকাশিয়া নানা শাস্ত্র পড়াইয়া
বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম মাড় অভিধান
তাহাতেই আমার নিবাস
সন্তোষিত বন্ধুজন এই গ্রন্থ নিবেদন
করিলাম পাইয়া প্রয়াস।[১৮]

'অমিয় নিমাই চরিত'— শিশিরকুমার ঘোষ রচিত এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে নিত্যানন্দের জীবনীর আলোচনা পাওয়া যায়। এরপর আধুনিককালে উল্লেখ্য আলোচনার সন্ধান পাই ড. সুশীলকমার দে'র "Early History of Vaishnav Faith and Movement in Bengal" (১৯৬১) গ্রন্থে। অবশ্য তিনি প্রধানত চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণব

আন্দোলনের কথাই আলোচনা করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদার-এর **'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'** গ্রন্থে মাত্র প্রাসঙ্গিকভাবেই নিত্যানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'** গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। **'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'**, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধে ড. সুকুমার সেন নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। রমাকান্ত চক্রবর্তীর **'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'** (১৯৯৬) গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ করা যায়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী'র **'বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য'** এবং **'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ'** গ্রন্থ দু'টিতে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ মাইতি'র **'চৈতন্য-পরিকর'** গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। **'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ শক্তি মা-জাহ্নবা'** শীর্ষক নিমাইচাঁদ গোস্বামীর এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা আছে। **'নিত্যানন্দচরিত'** —যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, **'নিত্যানন্দ বংশবল্লী'**—ক্ষীরোদ গোস্বামী, **'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ'**—পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভৃতি গ্রন্থেও নিত্যানন্দ সম্পর্কিত আলোচনা আছে। **'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম'**—সুখময় মুখোপাধ্যায়, **'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য'**—কালকূট, **'বৈষ্ণব রসপ্রকাশ'**—ক্ষুদিরাম দাস, **'বৈষ্ণব জগতের মাধুকরী'**—রবীন রাহা প্রমুখের গ্রন্থেও নিত্যানন্দ সম্পর্কে অল্প-স্বল্প আলোচনা পাওয়া যায়।

এছাড়া আধুনিক কালে বিভিন্ন বৈষ্ণব আলোচনা গ্রন্থগুলিতেও চৈতন্য-নিত্যানন্দ সম্পর্কিত বিস্তারিত উল্লেখের মধ্যে ইতস্তত অল্প-স্বল্প নিত্যানন্দ সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন— **'তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য'**—ভূপতিরঞ্জন দাস (২য় খণ্ড), **'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত'** (২য় খণ্ড)—জানকীনাথ পাল, **'মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে আদর্শ বৈষ্ণব'**—রাধাবিনোদ সরকার, **'শ্রীচৈতন্য ঃ গোবিন্দ কর্মকারের দৃষ্টিতে'**—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, **'শ্রীচৈতন্য ধর্মের স্বরূপ, রূপান্তর ও সংস্কার'**—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজধারায় বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা অনেক গ্রন্থের সন্ধান মিলছে। তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম এখানে উল্লিখিত হল— **'বৈষ্ণব পদাবলী'**—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, **'অবতারী ও অবতার, গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর ও চৈতন্যদেব'**—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, **'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ'**—রাধাগোবিন্দ নাথ, **'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'**—হরিদাস দাস, **'শ্রীশ্রীগৌর পার্ষদ চরিতাবলী'**—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ, **'গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক'**—ভক্তিবিলাস তীর্থ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বাংলা চরিতসাহিত্যে ও অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থে চৈতন্য সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত আলোচনা আছে, নিত্যানন্দ সম্পর্কে তেমন সবিস্তার আলোচনা নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দের স্থান ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান ঃ

এবার আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দের স্থান ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেও বৈষ্ণব ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল, কিন্তু মহাপ্রভুই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মরূপে এবং তাঁর সমাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নামে পরিগণিত হয়। এই ধর্ম প্রচারের জন্য চৈতন্যদেব নিজেও যেমন সচেষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদেরও এই ধর্মপ্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট বলরামের অবতার নিত্যানন্দকে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য নীলাচল থেকে গৌড়দেশে পাঠিয়ে দেন। বাংলাদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে ও প্রচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন নিত্যানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা গৌর-নিতাই বা নিমাই-নিতাই এই যুগ্ম নাম ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, গৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচারের যে ভূমিকা তার সঙ্গে নিত্যানন্দের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিমাই-নিতাই আজও বাংলার বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়া সমাজে কৃষ্ণ-বলরামের অবতাররূপে পূজিত।

নিত্যানন্দ যে কতখানি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রচারে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, চৈতন্যদেবের জীবনে সহচররূপে তাঁর কী ভূমিকা ছিল ইত্যাদি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তাঁর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা সেসব বিষয়ের আর পুনরাবৃত্তি করব না। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তাঁর স্থান সম্পর্কে আমরা নিরীক্ষা করব।

চৈতন্যলীলার পরিকরদের প্রধান নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রধান দায়িত্ব দিয়েছিলেন নিত্যানন্দকে—

আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।।
শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।[১৯]

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আদেশ শিরোধার্য করেন। জাতি-ধর্ম বাছবিচাব না করে সারা বাংলায় আদ্বিজচণ্ডালে হরিভক্তি প্রচার করেছিলেন তিনি। কুল-শীল-জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে অবস্থান করে সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবপ্রেমিক নিত্যানন্দ বাংলার ঘরে ঘরে চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম বিতরণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সর্ব-

সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাবই তাঁকে মানুষের অতি নিকটে নিয়ে এসেছিল। শুধু চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম প্রচারেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, একথা ভাবলে বোধ করি তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি যে মানুষকে কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন এবং পতিত অবহেলিত মানুষ তাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল এতেই তিনি সাধারণের মনে অনেকখানি স্থান দখল করে নিতে পেরেছিলেন। যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্ণহিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য ছিল, নিত্যানন্দ সেই সম্প্রদায়ের সপ্তগ্রাম নিবাসী উদ্ধারণ দত্তকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করে সমস্ত বণিক সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই বণিক সমাজে নিত্যানন্দের স্থান আলোচনার অপেক্ষা রাখে না—

বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার।।[২০]

কথিত আছে খড়দহে তিনি ষাট হাজার নেড়ানেড়ীকে দীক্ষিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শ্রীপাট খড়দহে এই শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা এ কথা সগৌরবে উল্লেখ করে গেছেন।[২১] এঁদের নিকটেও নিত্যানন্দের স্থান ছিল শ্রদ্ধার।

তিনি সমাজের অপাংক্তেয়দের কোল দিয়েছিলেন। তিনি ছত্রিশ জাতিকে এক পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করিয়েছিলেন। তাঁর এই কর্ম সমকালীন সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে একটি আশ্চর্য ঘটনা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পানিহাটী দণ্ডমহোৎসব তার অকাট্য প্রমাণ। তাঁর এই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মনোভাব এবং উদারতা তাঁকে মানুষের অত্যন্ত সন্নিকটে নিয়ে এসেছিল।

নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি প্রথমদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সমালোচিত হলেও পরবর্তীকালে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তরাও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বলেই মনে হয়। অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দকে স্তুতি করেছিলেন—

করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষ করেন নিত্যানন্দ প্রতি-স্তুতি।।
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম।।
সর্ব-জীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম সেতু।।
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি।।[২২] ইত্যাদি

আবার মহাপ্রভুও নিত্যানন্দকে স্তুতি করেছিলেন—

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।।

"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত।।[২৩]

মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ বাংলাদেশে এসে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি অবধূতের বেশ ত্যাগ করে রাজোচিত অভিষেক স্বীকার করেন এবং রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করেন। তাঁর প্রধান সহচরেরাও অনেকে বলরামের অনুচর গোপবালকের বেশ ধারণ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সমকালীন বাংলাদেশে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার-রূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্মিত যুগল মূর্তির পূজা হয়েছে। এতে অদ্বৈতের সম্মতি ছিল। এ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল (পূর্বের নাম অম্বুয়া) অধুনা কালনা গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে।

নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচাকা গ্রামে আজও তাঁর যোদ্ধবেশ ও রাজোচিত বস্ত্র-অলঙ্কার পরিহিত বিগ্রহের পূজা হয়ে থাকে। সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত উদ্ধারণপুরে এবং সপ্তগ্রামে গৌর-নিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা প্রচার করেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলাদেশে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, পরে তার বিস্তার ঘটে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের উদ্ভব হয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্যরূপে স্বীকৃত। অর্থাৎ চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং পুষ্ট হয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের বাহক হিসাবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমভক্তি জীবের চরম পুরুষার্থ বলে গৃহীত হয়েছে। এই প্রেমভক্তি ধর্ম প্রসারের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি নৃত্য গীত এবং সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে জনসমাজকে মাতোয়ারা করে তুলেছিলেন।

সেই সময়ে গৌড়দেশে নৃত্য গীত ও নাটকের মাধ্যমে নিত্যানন্দ প্রচারিত ভক্তিধর্মের স্রোত প্রবাহিত হয়। গৌড়বাসীও সেই স্রোতের প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রেমভক্তিরূপ যে সহজ এবং সরল সাধনপথের সন্ধান দিয়েছিলেন তাতে তার লোভে শাস্ত্র নির্দেশিত কঠিন ও শুষ্ক আচার পদ্ধতি ও তার আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক আচার-আচরণেব শুষ্ক পথ ত্যাগ করে মানুষ শুধুমাত্র ভক্তি এবং ভালোবাসার মন্ত্রের প্রচারক নিত্যানন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শাস্ত্রের এবং লৌকিক তন্ত্রাচারের কঠিন যাগ-যজ্ঞ ও পূজাপদ্ধতি ও ধর্মের ব্যভিচার ত্যাগ করে শুধুমাত্র ভক্তি এবং প্রেম সম্বল করে সাধারণ মানুষ ঈশ্বর তথা মহতের সৎ-এর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাই নিত্যানন্দ হয়েছিলেন জগতের গুরু। দরিদ্রপতিত নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম লাভে সহায়তা করে, তিনি হলেন কাঙ্গালের ঠাকুর। নিরভিমানী সেই কাঙ্গালের ঠাকুর সকলেরই মিত্র এবং কল্যাণকারী। তাই নিত্যানন্দ রাম সর্ববৈষ্ণবের প্রিয়। পদকর্তা লোচনদাস লিখেছেন—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী।।
প্রেম বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাবে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকার যাচে।।
আবদ্ধ করণা নিতাই কাটিয়া-দোহা।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বাণ।।
লোচন বলে মোর নিতাই যে বা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল।।[২৪]

বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁদের পদাবলীতে নিত্যানন্দকে প্রেমভক্তিদাতা পতিতের ত্রাণকর্তা ও জগতের গুরুরূপে বন্দনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ভণিতায় শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং প্রেমরূপ দেবতরু আর নিত্যানন্দকে তার অন্যতম স্কন্দ বলে উল্লেখ করেছেন—

বৃক্ষের উপরে শাখা হইল দুই স্কন্দ।
এক 'অদ্বৈত' নাম আর নিত্যানন্দ।।[২৫]

শ্রীচৈতন্য ছিলেন মূল বৃক্ষ এবং মালাকার। তিনিই তাঁর শাখা-প্রশাখাদের বলেছিলেন বৃক্ষের প্রেমফল জগতে বিতরণ করতে। তাঁর শাখা নিত্যানন্দ ভক্তিজল সিঞ্চন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তা বিতরণ করেছিলেন। এই উপমার সাহায্যে কৃষ্ণদাস অপূর্ব কৌশলে চৈতন্য এবং তার পার্ষদগণের সঙ্গে নিত্যানন্দের ভূমিকার অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন। কানুরামের ভণিতায় নিত্যানন্দের স্তুতি আছে—

দয়া করে মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে।।
জয় প্রেমভক্তিদাতা পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কর বিচার।।
প্রেমদানে জগজনের মন কৈলা সুখী।
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি।।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি।।[২৬]

নিত্যানন্দকে স্তুতি করে সঙ্কর্ষণ পদ রচনা করেছেন—

নিত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে।
প্রেম বিতরয়ে প্রভু পতিত জনারে।।
অধম পাতকী অন্যে ঘৃণা করে যারে।

নিতাই যাচিঞা নিজে তাড়য়ে তাহারে।।
প্রেম জগ মগ পদ নাচে বারে বারে।
জাতি কুল নাহি মানি তারে যারে তারে।।
আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে।
কভু দণ্ড ভাঙ্গে কভু অদ্বৈতেরে মারে।।
দয়াল নিতাই বলি ঘোষে ত্রিসংসারে।
সঙ্কর্ষণ তবে বলে যদি তাড়ে তারে।।[২৭]

নরোত্তমদাস একটি পদের ভণিতায় বলেছেন, নিত্যানন্দ প্রেমের হাটের রাজা এবং চৈতন্য ভাণ্ডারী। এই প্রসঙ্গে নরোত্তমের হাট পত্তনের এক বৈচিত্র্যময় রূপ পরিস্ফুট হয়েছে—

প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন।
নদীনালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই।।
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্যগোসাঁঞি।
পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃত ধারা।।
....
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন।।
....
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল।।
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে।।
এই মত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
....
চৈতন্যের হাটে নিত্যানন্দ ঝাড়ুগিরি করি।।
করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ।।[২৮]

চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের ভক্তিধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা এবং ধর্মপ্রচার পদ্ধতি নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তসমাজে যে ভক্তি ও বিনয় শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল বাংলা পদাবলী সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। দৃষ্টান্ত দিই। নিমাই পণ্ডিত যখন সন্ন্যাস নেন, নিত্যানন্দ সে কথা শিক্ষক গঙ্গাদাসকে জানালে তিনি নিত্যানন্দকে বেত তুলে মারতে

লাগলেন। কারণ, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসধর্মকে বোধহয় গঙ্গাদাস পণ্ডিত মেনে নিতে পারেননি। যাই হোক, নিত্যানন্দ কিন্তু বেত্রাঘাতে বিন্দুমাত্র কাতর বা উত্তেজিত না হয়ে সেই আঘাতকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিত্যানন্দের সেই প্রেমভক্তির সহিষ্ণুতা দেখে গঙ্গাদাস পণ্ডিতও বিনয়ে বিগলিত হয়েছিলেন। এই ঘটনা অনুসরণ করে জ্ঞানদাস একটি ধামালি রচনা করেন--

এইসব অবধূত আসিল যখনে।
নদীয়া আঁধার হবে জানি মনে মনে।।[২৯]

উড়িষ্যা যাত্রাকালে চৈতন্য-সহচররূপে নিত্যানন্দ যখন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তখন চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের প্রতীক দণ্ডটি ভেঙে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী অভিমান দূর করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে চৈতন্য একটু অভিমান প্রকাশ করলেও পরে নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। সেই বিষয় নিয়েও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তগণ পদ রচনা করেছেন। এই রূপ প্রেমদাসের একটি পদের কিছু অংশ তুলে ধরা হল--

চলিলা নীলাচলে গৌরহরি।
দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি।।
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি।
প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী।।
অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়।
প্রেমভরে তনু দোলাঞা যায়।।
দণ্ড কর দেখি নিতাই চাঁদ।
পাতয়ে অমিয়া পিরীতি ফাঁদ।।
আপন করে লইয়া প্রভুর দণ্ড।
ফেলিয়া ছলে জলে করিয়া খণ্ড।।
আসিয়া যবে প্রভু চাহিলা দণ্ড।
নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড।।
দণ্ডভঞ্জন শুনিয়া কথা।
কোপ করি পহু না তোলে মাথা।।
কে বুঝে দুহুজন মরম বাণী।
প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি।।[৩০]

সাহিত্যে নিত্যানন্দের তত্ত্বের প্রভাব ঃ সাহিত্য জীবন ও জগতের প্রতিচ্ছবি, কবির সচেতনতায় হোক, আর অবচেতনায়ই হোক সমকালীন ছবি সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হবেই। বৈষ্ণব পদাবলী অবশ্যই বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য কিন্তু তাতেও সমকালীন জগৎ

এবং মানুষের চিন্তা, ভাবধারা, জীবনাচরণ অলক্ষিত থাকেনি। পদাবলী কাব্য বুঝতে হলে আগে বুঝতে হয় সমষ্টিগতভাবে বৈষ্ণবকে। আমাদের পারিবারিক তথা সমাজ জীবনে যে মানস বৃত্তিগুলি অবিরাম অনুশীলিত হচ্ছে তাদের উদ্‌ভাবনে পদাবলী কাব্য আজও পাঠকের হৃদয় সহজেই আলোড়িত করে।

চৈতন্যদেবের সমকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে যে কূলপ্লাবী মহাধারা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সেগুলি রাধাকৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা। ভক্তের চোখে গৌরাঙ্গ 'রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত' কৃষ্ণ স্বরূপ হলেও পদকর্তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন রাধাভাবকান্তি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। এই গৌরাঙ্গকে সর্ব বিষয়ে সহায়তা করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্যদ নিত্যানন্দ। তাই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সম্মিলিত প্রভাব চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে সুমুদ্রিত হয়ে আছে।

গঙ্গা প্রত্যাগত ভাবাবেশে বিহুল নিমাইয়ের অলৌকিক আচরণে অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রমুখ আচার্যগণ মুগ্ধ হয়ে আত্মনিবেদন করেছিলেন। শীঘ্রই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন অবধূত নিত্যানন্দ। হরিনামে তখন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'। জনমানসে অপূর্ব উন্মাদনা। নামের সঙ্গে সদাই ফিরেন মানব কিশোর কৃষ্ণ। তিনি বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নন। মানুষের তিনি সখা, মানুষের সন্তান, মানুষের প্রেমিক। নিরভিমান মহাপণ্ডিত সর্বত্যাগী মানব সন্তান তাঁর অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে পরম প্রেমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আপন বক্ষে টেনে নিয়েছেন। আরেকদিকে অশ্রুসজল নয়নে রোমাঞ্চিত দেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছেন। যা মানুষের অন্তরে আলোড়ন তুলেছে প্রবলভাবে। এই ছবিই বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হয়েছে পদাবলী সাহিত্যে।

ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্য-সাহিত্যে রসের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আটটি স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন সেগুলি বিভাব-অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সহযোগে রস পরিণতি লাভ করে 'রস' নামে চিহ্নিত হয়—

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধেৎসাহৌভয়ম্ তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

অতএব আটপ্রকার স্থায়ীভাব তথা রস যথাক্রমে—১) রতি ২) হাস ৩) শোক ৪) ক্রোধ ৫) উৎসাহ ৬) ভয় ৭) জুগুপ্সা ৮) বিস্ময়। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকরা রতির অর্থ প্রসারিত করে তার পরিণতি অন্যভাবে দেখিয়েছেন। তাদের মতে, প্রিয় বস্তুর সঙ্গে মানবমনের সহজ অনুরাগই রতি। বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাদের রতিই কৃষ্ণরতি। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হলেও স্বরূপ রস একটিমাত্র —ভক্তিরস।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের অনুরাগ পাঁচভাবে হতে পারে। এই পাঁচ প্রকার রতির পরিণতি পাঁচপ্রকার রস — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এর মধ্যে আমরা

বিশেষভাবে আলোচনা করব দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। কারণ আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্যে নিত্যানন্দের প্রভাব এই পরিসরের মধ্যে। এই সীমায় সমতা এবং মধুরের শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের প্রভাব কম।

দাস্যরস ঃ— এক্ষেত্রে ভগবান প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য। এতে স্থায়ীভাব 'সেবা' নামে রতি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ভক্তগণকে আকর্ষণ করে এবং তাঁর সেবা করেই ভক্ত কৃতার্থ হন। নরোত্তম দাসের একটি পদে আছে—'সেবা দিয়া কর অনুচর'।

যদিও দাস্যভাবের সেবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে স্বীকৃত হয়নি, তবুও নিত্যানন্দ প্রভাবে সাধারণ ভক্তমানসে সেবার ভাব প্রকটিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ, তাঁরই প্রবর্তনায় বহু শিষ্য বিগ্রহ সেবা এবং শ্রীপাট স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেবাধর্মের প্রচার করেছিলেন।

সখ্যরস ঃ—নিত্যানন্দ সখারূপেই চৈতন্যদেবের সহচর হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারে ছিল ভক্তদের সঙ্গে সমপ্রাণতার সম্পর্ক। ভক্তমনে নিত্যানন্দ ছিলেন বলরাম অবতার। কৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের যেমন সখ্যভাব ছিল, তেমনি চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সেইরূপ সখ্য প্রেম বিদ্যমান। নিত্যানন্দ নিজেও গৌরাঙ্গের সঙ্গে সখ্যভাবে লীলা করেছেন। নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে লাভ করতে চেয়েছেন। তাঁদের আচরণেও ব্রজবালকদের মতোই চঞ্চলতা প্রকাশ পেয়েছে। চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের অভিষেক ক্রিয়াকালে তাঁর ভক্তদের ভজনপদ্ধতির যে বর্ণনা আছে তাতে অপূর্বভাবে সখ্যরস প্রকাশিত হয়েছে—

কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে॥
কেহ কেহ প্রেম সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল 'ধরি'।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' হরি হরি॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় বড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ-সাতগুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জন, সিংহসার॥
শ্রীঅনন্দমূর্ছা-আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥

সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল॥
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তি-বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন, সে-ই প্রেমে মূর্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে, ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে' নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥[৩১]

চৈতনোত্তর পদাবলী সাহিত্যে যেখানে নিত্যানন্দের প্রভাব অলক্ষিতভাবে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে, সেখানে বহু কবির রচনায় সখ্যরস অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, ব্রজবাসীর ভাব নিয়ে কৃষ্ণোপাসনা শ্রেয়। এই ভাবের মধ্যে বাৎসল্য ও সখ্যরস থাকে।

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জানি চড়ে তাঁর কান্ধে॥[৩২]

কৃষ্ণের বাল্যলীলায় ও কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণসখাদের বিরাট ভূমিকা আছে। রামানন্দ বসু'র একটি কবিতায় সখ্যরস সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে—

উজালি ভাণ্ডীরতল বসিয়াছে কানু।
শ্রীদাম করে পদসেবা সুবল রাখে ধেনু॥
পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম।
বসনে বীজন করে প্রিয় বসুদাম॥
কেহো নাচে কেহ গায় কানাই বলি ডাকে।
অনিমেষ হঞা কেহ চান্দমুখ দেখে॥[৩৩]

জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ সখাকে অবলম্বন করে দ্বাদশ গোপাল বর্ণনা করেছেন। তাঁর বহুপদে সখ্যরসের নিদর্শন মেলে—

চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রামকানু।
কাঁচনি পাঁচনি কারু হাতে শিঙা বেণু॥
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥[৩৪]

সখ্যরস সৃষ্টিতে বলরামের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য—

"রাম কানু দুভাই দুদিকে দাঁড়াইল।
দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।।
সুবল কানায়ের দিকে নাচিতে লাগিল।
শ্রীদাম সুদাম বলাই-এর দিকে হৈল।।
দুভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল।।[৩৫]

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, চৈতন্যোত্তর কালে পদসাহিত্যেও সখ্যরস প্রভাবিত কবিতার অভাব নেই। বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দকে ভক্তরা বলরামের অবতার বলে জেনেছেন। এই হিসাবে নিত্যানন্দ সখ্যরসের প্রবর্তক একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না।

বাৎসল্যরস ঃ— বাৎসল্যরসে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্ভ্রমশূন্যরতি, ভগবান সন্তান, ভক্তমাতা পিতা। শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা, দাস্যর সেবা, সখ্যর বিস্রম্ভতা বা সমবোধ বর্তমান। এর সঙ্গে মমতা ও তাড়ন-ভর্ৎসনা লালনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্থান পায়। নিত্যানন্দের প্রতি হাড়াই ও পদ্মাবতী, শ্রীবাস এবং শ্রীবাসপত্নী মালিনী, শচীদেবী এঁদের অপূর্ব বাৎসল্যভাব প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও পাড়াপড়শী বা প্রতিবেশী পিতৃ-মাতৃস্থানীয়া গুরুজনদেরও নিত্যানন্দের প্রতি বাৎসল্য ভাব অলক্ষিত থাকেনি।

এখানে আমরা নিত্যানন্দের জীবনী সাহিত্যগুলি অবলম্বনে নিত্যানন্দের প্রতি বাৎসল্য ভাবের প্রকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হব।

নিত্যানন্দের জন্মকালে হাড়াই এবং পদ্মাবতীর সংসারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পাড়াপড়শীরাও তাঁর প্রতি স্নেহে বাৎসল্যে বলে—

কেহ কহে—'এ যেন বালক কভু নয়।
হেম নবনীতের পুতলী বুঝি হয়।।
কেহ কহে 'এমন বালক নাই দেখি।
দেখিতে ঘুচিল তাপ, জুড়াইল আঁখি'।।
এইরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে।
লোক-গতায়াত বহু পণ্ডিতের 'ঘরে'।।[৩৬]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিতাইর প্রতি স্নেহবশ হয়েই তাঁকে কেউ বলেছে ননীর পুতুল, আবার কেউ বলেছে আঁখি জুড়াল। এ সকল স্থানে পাড়াপড়শীর বাৎসল্য ভাব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবার—

পুত্রের কল্যাণে বিজ্ঞ হাড়াই পণ্ডিত।
কৈল অর্থদান বহু হইয়া উল্লসিত।।
পদ্মাবতী-হাড়াইর পুত্রগত প্রাণ।

দিনে দিনে বাঢ়ে পুত্র চন্দ্রের সমান॥
মাতার অত্যন্ত স্নেহ, প্রশংসে সকলে।
ক্রোড় হৈতে পুত্রে না নামায় ভূমিতলে॥[৩৭]

পদ্মাবতী এবং হাড়াইয়ের একচক্রার 'আনন্দভবন' নিত্যানন্দের আবির্ভাবে আরও বেশি আনন্দপূর্ণ হল। হাড়াই পুত্রের মুখ দেখে আত্মহারা হন—

পিতার যে স্নেহ তা' কহিতে সাধ্য নাই॥
যদি কোন কার্য্যে যান যাইতে না পারে।
উলটিয়া পুত্রমুখ দেখে বারে বারে॥
কভু যজমানগৃহ গিয়া আসি' ঘরে।
'কোথা নিত্যানন্দ'—বলি' চৌদিকে নেহারে॥
ধাইয়া পিতার কোলে চঢ়য়ে নিতাই।
হারা-হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই॥[৩৮]

পদ্মামায়ের স্নেহ আরো অপরূপ। তিনি—

পুত্রের সৌন্দর্য্য লাগি' হরিদ্রা মাখায়।
হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গছটায়॥
মাখায়েন স্নিগ্ধ হেতু হৈল সুগন্ধিত।
সহজে সুগন্ধ স্নিগ্ধ দেহ সুললিত॥
করাইতে স্নান স্নেহে হয়েন বিহ্বলা।
লঘু লঘু পোঁছে অঙ্গ লৈয়া পানি তোলা॥
রক্তপ্রান্ত নীল পট্টধড়া পরাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে খেল গৃহেতে বসিয়া॥
হাসিয়া মায়ের প্রতি কহেন নিতাই।
খেলিবার সঙ্গী বিনা কিরূপে খেলাই॥[৩৯]

মাতার এবং পিতার এই স্নেহের অভিব্যক্তি চরিতসাহিত্যগুলির বহু স্থানেই নির্মল আলো ফেলে হীরকদ্যুতি-বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যমালা সৃষ্টি করেছে। নিত্যানন্দের প্রতি স্নেহবশত প্রতিবেশী সম্পর্কিত মাতৃপিতৃস্থানীয় গুরুজনেরাও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর নামকরণের সময়ে—

নামকরণাদি-কালে হৈল মহানন্দ।
কেহ কহে—"রাম", কেহ কহে—"নিত্যানন্দ"॥
কেহ কুন নাম কহে উল্লাস অন্তরে।
অন্নপ্রাশনের সুখ কে কহিতে পারে?

হামাগুড়ি অঙ্গনে বেড়ান যেই কালে।
"আইস নিতাই!" বলি সবে করে কোলে ॥
কোলে চঢ়ি হাসে মুখ শোভা মনোহর।
দুগ্ধ বিন্দু প্রায় দুই দশন সুন্দর ॥
কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে কুন জন।
নিত্যানন্দ হৈলা যেন সবার জীবন ॥[৪০]

এই বর্ণনায় একটি অবোধ শিশুর অপূর্ব ছবি মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরেও স্নেহরসের ধারা উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতে চায়। শুধুমাত্র বর্ণনার নৈপুণ্যেই কবি আমাদের মানসপটে ছবি এঁকে যান। ভক্তিরত্নাকরের আরেক জায়গায় আছে—

পণ্ডিতের বাড়ী গেলু দেখিতে নিতাই ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোভা সুমধুর।
বারেক দেখিতে সব দুঃখ গেল দূর ॥
'আইস বাপু!' — বলিতেই কোলে সামাইলা।
না জানি কি আনন্দ—সমুদ্রে ডুবাইলা ॥[৪১]

শৈশবে নিত্যানন্দ যখন বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করেন, তাঁর সেই রূপও চরিত-সাহিত্যগুলিতে অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্যবিনা আর নাহি স্ফুরে ॥
....
দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্ধ্বরায় ॥
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্ধ্ব করি বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে" ॥
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া ॥
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥
....
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥

আবার তিনি কংস বধের অভিনয়ও করেছেন—

কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশুসঙ্গে।
সর্বলোক দেখি, হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
....

রামলীলার অভিনব নাটকচ্ছলে অপূর্বভাবে পরিবেষণ করেছেন নিত্যানন্দ—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি' জয় রঘুনাথ' বোলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি' কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয়॥
মাল্যবান পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ?
কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাহ সত্বরে"॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥
কে তোরা বানরা সব, বুল বনে বনে।
আমি-রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল মোর স্থানে॥
....
ইন্দ্রজিৎ-বধলীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ ভাবে হারে॥
....
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায়॥[৪২]

এই বর্ণনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি নিত্যানন্দ বাল্যলীলায় নাটকচ্ছলে অভিনয়ের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে---

শিশুসহ খেলারসে বিহ্বল নিতাই।
যে অদ্ভুত খেলা তা' কহিতে অন্ত নাই।।[৪৩]

নিত্যানন্দকে পেয়ে মাতা-পিতার বাৎসল্যভাব যেন বাঁধ মানে না---

ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে।।
এইমত পুত্র সঙ্গে বুলি সর্ব্বঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই।।[৪৪]

বাল্যলীলায় নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের মধুর বাল্যলীলা অভিনয়ের মাধ্যমে সখাদের সঙ্গে খেলা করতেন—

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদন।।[৪৫]

এই খেলার মধ্য দিয়ে নিত্যানন্দ এক অপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আজকের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও খেলা এবং নৃত্যগীতছলে শিশু-শিক্ষার প্রচলনের কথা স্বীকৃত হয়েছে। এই রীতির দ্বারা লোকশিক্ষা এবং লোকসংস্কৃতির প্রসারও সম্ভব। ধীরে ধীরে নিত্যানন্দ বড় হয়ে উঠলেন—

পৌগণ্ড বয়সে কিবা কৈশোর প্রবেশ।
দেখি' সে শোভা না কারু ধৈর্য্যলেশ।।[৪৬]

কিন্তু বিধি নির্মম। তাই পিতা-মাতার পরম স্নেহের ধন, পাড়া প্রতিবেশীর চোখের মণি নিতাই একদিন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করলেন। এরপর বহু ঘটনা পরম্পরায় নিত্যানন্দ এসে পৌঁছলেন শচীমাতার গৃহে। নিতাইকে দেখে শচীমাতার বিশ্বরূপের স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হয়ে নিত্যানন্দের শ্রীমুখ দর্শন করতে লাগলেন--

পিরিতি-পাগল হঞা নেহারে বয়ান।।
প্রভু বোলে---নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।।[৪৭]

তিনিও বললেন--

'তব পুত্র বটি মুঞি—জানিবে সর্ব্বথা।[৪৮]

নিত্যানন্দকে পুত্ররূপে পেয়ে শচীমাতার স্নেহরসধারা বাঁধ মানে না—

নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল—গদ্‌গদ্ বাণী।।[৪৯]

শচীমাতা নিত্যানন্দকে কাছে পেলেই বিশ্বরূপের শোক ভুলে যেতেন। তিনি নিত্যানন্দের মধ্যে বিশ্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন—

বড় দুঃখ পান মা বিশ্বরূপ শোকে।
তুমি বিশ্বরূপ ইহা বলে সর্ব্বলোকে।।
আকৃতে প্রকৃতে নিত্যানন্দ বিশ্বরূপে।
ভেদ করিতে কেহো নারে নবদ্বীপে।।
গৌরচন্দ্র গৃহবাসে গেলা নিত্যানন্দ।
শচীর স্তনে দুগ্ধ স্রবে দেখে গৌরচন্দ্র।।[৫০]

সেই সময়ে নিত্যানন্দের প্রতি বাৎসল্যানুরাগে শচীমাতা বলেছিলেন-

কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে।।
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছো দুঃখিতা তারিতে।।[৫১]

মাতৃকণ্ঠের স্নেহোচ্ছল নির্দেশের উত্তরে---

নিত্যানন্দ বলে,—"শুন আই, সর্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ হেথা।।
মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়।।[৫২]

আবার লোচনদাসের গ্রন্থে শচীমাতা নিত্যানন্দের প্রতি বাৎসল্যরসের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়---

আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে।।
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রুনেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দে কোলে করে।।
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বোলে মধুর বচনে।।
যে কহিলে মাতা তুমি—সব সত্য হয়।
তব পুত্র হই আমি--জানিহ নিশ্চয়।।[৫৩]

এইভাবে চরিতসাহিত্যগুলির বহুস্থানে নিত্যানন্দকে ঘিরে বাৎসল্য এবং প্রতি-বাৎসল্যের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিত্যানন্দকে সন্তান স্নেহে লালন পালন করেন

শ্রীবাস এবং তাঁর পত্নী মালিনী দেবী। এঁদের সংস্পর্শে এলে নিত্যানন্দের মধ্যে বালকসুলভ চপলতা দেখা দিত। মালিনী দেবী নিত্যানন্দকে বসে না খাওয়ালে—

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।।
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্রমাতা।।[৫৪]

নিত্যানন্দের সংস্পর্শে এলেই মালিনীর 'অচিন্ত্য শক্তিজাত স্বতঃস্ফূর্ত স্তন্যরস' উৎসারিত হত। নিত্যানন্দ সেই স্তন্যরস পানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না—

নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে।।[৫৫]

শ্রীবাস এবং মালিনীর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে তিনি অনেক শিশুসুলভ ভুলও করে ফেলতেন। মালিনী দেবী কিন্তু কখনোই তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হতেন না। পুত্রস্নেহে তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে ভুল সংশোধন করে দিতেন। নিত্যানন্দের প্রতি মালিনীর এইরূপ ব্যবহারে বাৎসল্যরসের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

আলঙ্কারিকরা সাহিত্যে প্রকাশিত কিছু প্রধান ও অপ্রধান রসের কথাও বলেছেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান রস করুণরস এবং অপ্রধান বা গৌণ বীরভক্তিরস ও অদ্ভুতরস।

করুণরস ঃ— নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করলে হাড়াই-পদ্মাবতীর সংসারে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। তাদের সংসারে সুখ বলে আর কিছুই থাকল না। পুত্র-শোকাতুর পিতা-মাতা নিজেদের স্থির রাখতে না পেরে পাগলপ্রায় হলেন। নিত্যানন্দের জন্মের পর হাড়াই এবং পদ্মাবতী যে কীরূপ পুত্রস্নেহে বিহ্বল হয়েছিলেন তার চিত্র আমরা বাৎসল্যরসের আলোচনার প্রথমাংশে দেখেছি। নিত্যানন্দের জন্মে হাড়াই এবং পদ্মাবতীর গৃহে আনন্দের বান ডেকে যায়—

তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেনবাসে ততোধিক পিতা।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া।।
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে।।
পাছে যদি নিত্যানন্দ চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।।[৫৬]

কিন্তু বারো বৎসর বয়সে ঘরকে পর করে নিতাই নামলেন পথে। পিতা-মাতা পরিজনদের শূন্যপ্রাণ করে কাঁদিয়ে জগতের মঙ্গলে নিজেকে উৎসর্গ করতে তিনি গৃহত্যাগী হলেন—

দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর।।
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হঞা।।
সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণ কথা কথন প্রসঙ্গে।।
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে।।
ন্যাসী বলে, "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার"।
*** *** ***
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার।।[৫৭]

পিতা হাড়াই পণ্ডিত এ ভিক্ষার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যে পুত্রকে তিনি তিলার্ধে শতেকবার ফিরে ফিরে দেখেন, যে পুত্র তাঁর ননীর পুতলী, যে নিতাই তাঁর প্রাণ, সেই আত্মাসম পুত্রকে ভিক্ষা দিতে হবে সন্ন্যাসীকে। একথা ভেবে—

শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর।।
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্বনাশ হয় হেন বাসি।।[৫৮]

একদিকে অগাধ পুত্রস্নেহ, অন্যদিকে সন্ন্যাসীকে সন্তুষ্ট করা এই দুই মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে পিতৃহৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। যদিও নিত্যানন্দের গৃহত্যাগের বর্ণনায় চরিত-সাহিত্যকাররা খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেননি, তবু পুত্রভিক্ষা দিয়ে মাতা-পিতা যে কতখানি বিরহকাতর হয়েছিলেন, তা আমাদের কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হয় না। কত ব্যথা তাঁরা বক্ষে বহন করে প্রাণধারণ করেছেন, সে ছবি আঁকলে আমরা চরিত-সাহিত্যগুলিতে যে করুণরসের আস্বাদ পেতাম, তাঁদের অনাগ্রহের ফলেই আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বীরভক্তিরস ঃ— যুদ্ধ, দান, দয়া এবং ধর্ম এই চারটি ক্ষেত্রেই বীরত্ব প্রযুক্ত হতে পারে। চরিত-সাহিত্যগুলির বহুস্থানেই বর্ণনাগুণে এই রসের প্রকাশ ঘটেছে। আমরা নিত্যানন্দের জীবনে যে যে ক্ষেত্রে এই রসের প্রকাশ ঘটেছে, সেই অংশগুলিতে নজর বুলিয়ে যাব।

নিত্যানন্দের জীবনের প্রধান কর্মই সর্বজীবে দয়া, ক্ষমা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে তিনি পাপী-তাপী এবং অস্পৃশ্য উদ্ধারে মনোনিবেশ করেছিলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার করে তিনি বীরভক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচার পদ্ধতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কোনো কোনো স্থানে তাঁকে নিয়ে নানা আলোড়ন উঠলে তিনি বলেছিলেন—

'কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে'।[৫৯]

তাঁর এই প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিচালনা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের মধ্য দিয়ে বীরভক্তি রসের প্রকাশ অলক্ষিত থাকেনি।

অদ্ভুতরস ঃ—আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরেক প্রকার রসের সন্ধান দিয়েছেন যা বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিস্ময় এর স্থায়ীভাব, এটি অদ্ভুত ভক্তিরস। অলৌকিকতাই হল এর বিষয়।

আমরা জানি মধ্যযুগে রচিত চরিত-সাহিত্যগুলি দেবতা বা দেবকল্প মানুষের জীবন নিয়ে রচিত। তাই এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বহু অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করা আমাদের কর্তব্য নয়। শুধুমাত্র অদ্ভুতরসের আলোচনা প্রসঙ্গে ঘটনাগুলি উল্লেখ করছি—চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে মালিনীর ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেলে, মালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। সে দুঃখ দেখে নিত্যানন্দ বলেন—

নিত্যানন্দ বলে, —"মাতা, চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর।।"[৬০]

এই কথা বলে নিত্যানন্দ কাককে বাটি আনতে আদেশ করলে মালিনী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—

ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেখানে আইল।।
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।[৬১]

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও এই অলৌকিক ঘটনার সমর্থন মিলছে—

পিত্তলের ঘৃতপাত্র কাক লৈয়া গেল।
শ্রীমালিনীদেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল।।
হাসি নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল কাকে পক্ষে।
বাটী আনি দিল কাক মালিনী সম্মুখে।।[৬২]

অভিরাম গোস্বামী ছিলেন নিত্যানন্দ শিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। বৃন্দাবনে নিত্যানন্দের সঙ্গে অভিরামের সাক্ষাৎ হয়। কথিত আছে, অভিরাম সাড়ে সাত হাত উচ্চ ছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁর এই অতিকায় কলেবর অনুগ্রহ করে সাড়ে চার হাত করে তাঁকে প্রমাণ উচ্চতা দান করেন। এক্ষেত্রেও অদ্ভুতরসের প্রকাশ ঘটেছে।[৬৩]

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ যখন বাল্যভাবে লীলা করছেন সেই সময়ে শচীমাতা একদিন নিত্যানন্দকে ক্ষীর সন্দেশ খেতে দেন। নিতাই কিছু খান কিছু ছড়িয়ে ফেলেন। শচীমাতা বলেন—

কেনে ফেলাইলা?

নিত্যানন্দ বলেন—

"কেনে এক ঠাঞি দিলা"?

শচীমাতা বলেন আর নাই। নিতাই বলেন—

'চাহ অবশ্য পাইবা'।

একথা শুনে শচীমাতা ঘরের ভিতর গিয়ে দেখেন সেই চারটি সন্দেশ পড়ে আছে। ধুলো-বালি মাখা সেই সন্দেশ নিয়ে আই নিতাই-এর নিকটে এসে দেখেন—

আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে,—"বাপ ইহা পাইলা কোথায়?
নিত্যানন্দ বলে,—যাহা ছড়াঞা ফেলিলু"
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিলুঁ।।[৬৪]

নিত্যানন্দের এই কার্য দেখে শচীমাতা বিস্মিত হন এবং তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন। নিত্যানন্দের অভিষেককালে তিনি রাঘব পণ্ডিতকে কদম্বের মালা আনতে আদেশ করেন—

কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে।[৬৫]

নিত্যানন্দ বললেন বাড়ি গিয়ে তুমি দেখে এসো—

বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব।।
জাম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল।।[৬৬]

লেবু গাছে কদম্বের ফুল প্রকৃতিতে অসম্ভব। কিন্তু ভক্তের কাছে বা প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত লীলায় এ অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে।

নিত্যানন্দ বিবাহের পর একদিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সপ্তগ্রাম বণিকদের নেতা উদ্ধারণ দত্তের বাড়িতে যান। সেখানে নিত্যানন্দের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"কভু উদ্ধারণ রাঁধে নিত্যানন্দ খায়।
কভু নিত্যানন্দ রাঁধে উদ্ধারণ খায়"।।

আবার—

প্রভু কহে, 'কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি।।
এইমত পরিবর্তনরূপে পাক হয়'
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়।।[৬৭]

পাকে উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দকে সহায়তা করেন শুনে ব্রাহ্মণগণ অতিশয় বিস্মিত হন। তখন নিতাইচাঁদ উদ্ধারণ দত্তের মহিমা জ্ঞাপনার্থে একটি অড়হর কাঠি সর্বসমক্ষে দত্ত ঠাকুরকে ভূমিতে প্রোথিত করতে বললেন। তৎক্ষণাৎ প্রোথনমাত্র দেখতে দেখতে উক্ত অড়হর কাঠি একটি মাধবী তরুরূপে পরিণত হয়ে বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে হল বৃক্ষের উন্নতি, পুষ্পিত হল মাধবীবৃক্ষ।

কথিত আছে, যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর একদা এই মাধবী মণ্ডপে আবির্ভূত হয়ে নিতাইচাঁদের এই অলৌকিকতা দর্শনে অতিশয় প্রীত হয়ে তাঁর জীবের প্রতি অহেতুক করুণার নিদর্শন বলে প্রকাশ করলেন। ঐ মাধবীলতা ছত্রাকার ধারণ করে আজও বর্তমান, আদি সপ্তগ্রাম উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে।[৬৮]

চিঁড়া মহোৎসব নিত্যানন্দের জীবনের একটি মহৎ কর্ম। এই মহোৎসবে তিনি এক অলৌকিক কাজ করেন। তিনি ধ্যানে মহাপ্রভুকে নীলাচল হতে পানিহাটীতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে পানিহাটী চিঁড়া মহোৎসবে এনেছিলেন বলে ভক্তসমাজের বিশ্বাস—

ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিলা।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।।
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুণ্ডীর হোল্‌নার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস।।[৬৯]

এ ঘটনা অদ্ভুত অলৌকিক রস সৃষ্টি করেছে। আশ্বিন মাসের যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে সঙ্কীর্তনরত অবস্থায় নিত্যানন্দের তিরোধান ঘটে।[৭০]

আবার এ প্রসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ বংশমালা গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস বলেছেন—মহাপ্রভুর অপ্রকটে ব্যথাহত নিত্যানন্দ তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে নিজের জন্মভূমি একচাকায় গমন করেন এবং বঙ্কিমদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহে লীন হয়ে যান।[৭১]

অন্যত্র—

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।।
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা।।

তথা হৈতে একচক্রা করিল গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন॥
কতদিন বঙ্কিমদেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥[৭২]

এই সমস্ত ঘটনাই অলৌকিক। বেশিরভাগ প্রমাণই কালের নিয়মে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আর যাঁরা এ সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন তাঁরাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। শুধুমাত্র বিশ্বাস এই সমস্ত ঘটনার ভিত্তিভূমি। আর আমরাও জানি মধ্যযুগের চরিত-সাহিত্যগুলি Biography নয়, সেগুলি Hagiography.তাই কোনো যুক্তি-তর্ক বিচারে না গিয়েও আমরা শুধু বলতে পারি গ্রন্থগুলির অনেক স্থানে অদ্ভুতরসের প্রকাশ ঘটেছে অপূর্বভাবে। যা সাহিত্যরসের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যের স্বর্ণযুগের এক অনবদ্য সৃষ্টি চরিতসাহিত্য। এই চরিত-সাহিত্যগুলি তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলির কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। শুধু চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেই নয়, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দের জীবনকে অবলম্বন করেও অনেক জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছে। যদিও অনেকগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে বিতর্ক আছে। আমরা সে বিতর্কে যাব না, কিন্তু, একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সেইসব প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সমস্ত গ্রন্থগুলি তৎকালীন সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছিল। চৈতন্যভাগবতকার তো নিত্যানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির সামাজিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে তার কাব্যমূল্য পণ্ডিত-মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সখ্যরস, বাৎসল্যরস ইত্যাদির আলোচনায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। চৈতন্যচরিতামৃত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দচরিতামৃত এবং নিত্যানন্দ বংশবিস্তার প্রভৃতি গ্রন্থেরও সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। চৈতন্যচরিতামৃতে তত্ত্বদর্শনের দুরূহ জিনিসকে কবি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে তাকে কাব্যসৌন্দর্যে উন্নীত করেছেন। এই গ্রন্থ কবির দার্শনিক মনীষা, ভাষাশিল্পের অপূর্ব দক্ষতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও রসবোধের গভীরতার নিদর্শন।

জয়ানন্দের এবং লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে ষোড়শ শতকের বাঙালি সমাজের বিবরণ আছে। তবে গ্রন্থ দু'টিতে কবিরা ভাবাবেগকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন। লোচন-দাস গৌরনাগরবাদের প্রচারক ছিলেন। গ্রন্থগুলিতে ছন্দ-অলঙ্কার চিত্রকল্পের সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রন্থদুটি পাঁচালীর ঢঙে লেখা। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সুর-তাল-লয় সহযোগে গীতোপযোগী। তাঁর গ্রন্থটি চৈতন্যদেবের সময়কালের সামাজিক পরিবেশ বর্ণনায় মূল্যবান। জনসাধারণের উপযোগী নানা পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনী

তিনি কাব্যে সংযুক্ত করেছেন। জয়ানন্দের গ্রন্থে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের কথা আছে। গ্রন্থটিতে দৈনন্দিন জীবনের যে বিবরণ আছে, তাতে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র আছে। আছে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়। তার আতিথেয়তা, শিষ্টাচার এবং রন্ধনশিল্প ও তার পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনার মাধ্যমে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, মুরলীবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। 'নিত্যানন্দ চরিতামৃত' ও 'নিত্যানন্দের বংশবিস্তার' গ্রন্থ দুটির প্রামাণিকতা বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে কিছু সন্দেহ থাকলেও গ্রন্থ দু'টিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা ভক্তবৈষ্ণব সমাজের নিকট মূল্যবান। তাছাড়া চরিতসাহিত্য, চৈতন্য সাহিত্য তথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শাখায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান। সেই সাহিত্য শাখাকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছিল পরিকর চরিতসাহিত্যগুলি। এদিক থেকেও গ্রন্থ দু'টির মূল্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তিরতির অপূর্ব রমণীয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাকেই অভিলষিত বস্তু বলে গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এঁরা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের এই ভক্তির প্রকাশমূর্তি। চৈতন্য অনুচর নিত্যানন্দ ছিলেন এর বিলাসমূর্তি।[৭৩]

ভক্তি যে রসরূপে আস্বাদিত হতে পারে এবং তার যে বহু বৈচিত্র্য আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা তা দেখালেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অভিজাত অধ্যায় তারাই সংযোজন করেছেন। লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নয়টি ভাব এবং রস ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার মধ্যে ভক্তির স্থান ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ভক্তি 'রস' রূপে স্বীকৃত হওয়ার ফলে লৌকিকতা এবং ধর্মের সীমা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা যা মূলত অলৌকিক অপ্রাকৃত হলেও রস সৃষ্টিতে তাতে মানবিক প্রেমের উৎসার ঘটেছে। ফলে তা অপরিসীম কাব্যরসের আধার হয়েছে। এই বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করে বিংশ শতাব্দীর কবি জিজ্ঞাসা করেছেন—

হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি?

আবার—

'হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
এত প্রেম কথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে?

যে ধর্ম সর্বদেশের সর্ব সম্প্রদায়ের পাঠক সাধারণকে আকৃষ্ট করেছে, মানব-রসবাহী গীতিকবিতা হিসাবে যা নরনারীর রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে, প্রেমের বিচিত্র রসাভিব্যক্তির ও রোমান্টিক কল্পনায় যা প্রোজ্জ্বল তা অবশ্যই অপার্থিব হয়েও পার্থিব। ভক্তিকাব্য হয়েও তা মানবপ্রেমের গীতিকাব্য। ধর্ম এখানে লৌকিক সম্পর্কের রমণীয়তা আশ্রয় করেছে। এই ধর্মের মূল স্বরূপে আছে কাব্য, হৃদয়ানুভবের সূক্ষ্মতায় সমুজ্জ্বল এক আশ্চর্য স্বপ্নময় জগৎ। আশা-নিরাশা, পাওয়া-না-পাওয়ার এক অদ্ভুত অপরূপ অনুভূতি। ধর্ম এখানে কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আসলে, সাধারণ কাব্য ও ধর্মানুভবের কাব্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের তত্ত্ব ফুটে উঠেছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শনে যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা, যে কথা চৈতন্য সহচর নিত্যানন্দও তাঁর নিজ জীবনাচরণ ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতক স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে এই শতাব্দীতে সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। শুধু সাহিত্য নয়, বাঙালির ভাবজীবন, মর্ত্যজীবন এবং অধিমানসের জীবন সর্বত্রই নবপ্রত্যয় ও আবেগের উল্লাস সঞ্চারিত হয়েছিল। এই যুগকে কেউ কেউ চৈতন্য রেনেসাঁসের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে বাঙালির যে সর্বাত্মক বিকাশের সূচনা হয়েছিল তা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের ষোড়শ শতাব্দীতে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসই নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি ও পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এর ফলে চৈতন্য-পূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে, বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্য-ধারায় পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ যুগের চণ্ডীমঙ্গল ও মঙ্গলকাব্যে অঙ্কিত দেব-দেবীরা অনেকাংশে তাঁদের ক্রূরতা হারিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ দেব-দেবী মঙ্গলকথা লিখলেও তিনি নিজের মানসিক ঔদার্যে মানব-মঙ্গলের কবি হয়ে উঠেছেন। এই মানসিক ঔদার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজমানসের দান, একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। এযুগে মঙ্গলকাব্যের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তা অনস্বীকার্য। সমাজে ও জীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কতটা গভীর হয়েছিল, তার প্রমাণ এ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি। কবিরা শাক্তমঙ্গল কাব্য লিখলেও বৈষ্ণব মতের প্রতিও বিশেষ অনুকূলতা দেখিয়েছেন এবং কেউ কেউ অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে চৈতন্যবন্দনাও করেছেন। চৈতন্যদেব এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর নিত্যানন্দ-প্রবর্তিত সর্বধর্ম সহিষ্ণুতা, মানবপ্রেম ও সাম্যবাদের বাণী বোধহয় এ যুগের সমগ্র সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল'-এও অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে চৈতন্যবন্দনা যুক্ত হয়েছে। এই সময়কার সাহিত্যে সমকালীন দেশ, কাল ও সমাজ মানসের যে জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে, তার মূল্য অসাধারণ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, তাতে কাব্যগৌরব বেশি না থাকলেও তাদের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। সমাজে বৈষ্ণব এবং পুরাণ প্রভাবের জন্য সেই সকল মঙ্গলকাব্যের ভাষা, বিষয়বস্তু এবং ভাবাদর্শে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ একদা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কবি শাক্তদেবীর বন্দনা করলেও ধর্মমতে বোধহয় বৈষ্ণব ছিলেন। এ যুগের সর্বপ্লাবী বৈষ্ণব ধর্মের বন্যাধারা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। আর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই বিপুল জনপ্রিয়তা ও উত্তরকালকে উজ্জীবিত করার প্রেরণামূলে যে মহাপুরুষের বাস্তব ও কার্যকরী উদ্যোগ ক্রিয়াশীল ছিল তিনি স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য জীবনদর্শনে সহচর নিত্যানন্দের প্রভাব

সমকালীনের চোখে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন অবতারকল্প মহাপুরুষ। অনেক যুগের প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার অপরিহার্য পরিণাম। সাধারণভাবে দেখা যায়, মহাপুরুষের আবির্ভাবের পশ্চাতে থাকে অগণিত নির্যাতিত মানুষের নিপীড়ন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই মহাপুরুষ যখন ধরণীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি একা আবির্ভূত হন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন সহচর বা পার্ষদগণকে। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যদেবের সেইরূপই এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি আজীবন চৈতন্যসেবায় তথা তাঁর জীবনদর্শনের রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করে গেছেন।

চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন কী ছিল? বলা বাহুল্য, তিনি কোনো ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। আসলে তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা ছিল—প্রেম-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সকল মানুষকে একই ধর্মের পতাকাতলে সন্নিবিষ্ট করা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সমাজে দেখা দিয়েছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছিল না কোন লক্ষ্যে তারা অগ্রসর হবে। একদিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রবল অত্যাচার, অন্যদিকে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিভ্রান্তকারী ধর্মপ্রচারে মানুষ দিশাহারা। হিন্দু ধর্ম প্রায় ভেঙে পড়তে চলেছে। সেই সময়ে এলেন যুগবিপ্লবকারী নেতা ও অবতারকল্প মহাপুরুষ চৈতন্যদেব। তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে ডাক দিলেন। সমস্ত পতিত অসহায় নিপীড়িত নিমজ্জমান মানুষ একটু আশার আলো দেখতে পেল।

চৈতন্যের ধর্ম প্রেমধর্ম---উদারনৈতিক মানবতাবাদী জীবনধর্ম। সমস্ত শাস্ত্রীয় যজ্ঞবিধি পূজাচারের ঊর্ধ্বে হরিনাম--'হরের্ণামৈব কেবলম্'—এই ছিল তাঁর মূল নির্দেশ। চৈতন্য ধর্মের মূল কথা ছিল মানবতাবাদ—

> "হরের্ণাম হরের্ণাম হবের্ণামৈব কেবলম্।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"॥

হরিনামেই মুক্তি—রাগানুগা ভক্তির এই সহজিয়া সুর সেকালের শাস্ত্রাচার সমন্বিত বৈধী ভক্তির আনুষ্ঠানিকতার যুগে মুক্তির হাওয়া এনে দিয়েছিল। আর চৈতন্যের এই প্রেমধর্ম প্রচারকে সহজ ও সুগম করেছিলেন নিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ধর্মমতকে কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। (ব্যতিক্রম তাঁর উপদেশাবলী 'শিক্ষাষ্টক'।) এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্য অনুগামী শ্রীরূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী ভ্রাতৃত্রয়।

চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের কোনো গ্রন্থ ভক্তদের কাছে দিয়ে যাননি। তবে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী এবং অন্যান্য ভক্তপণ্ডিতদের গ্রন্থে শিক্ষামূলক যে আটটি শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি চৈতন্যদেবের নিজের মুখনিঃসৃত বাণীরূপে সঙ্কলিত হয়েছে। এইগুলি শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত। এর মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষাষ্টক প্রকৃতপক্ষে মহৎ জীবনের আদর্শ, কিন্তু এই শিক্ষাষ্টক রচনার বহু পূর্বেই নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যোগাযোগ ঘটে। তাই শুধু চৈতন্যদেবের প্রাজ্ঞ বাণীর অনুসরণ করেই আমরা তাঁর সহচর নিত্যানন্দের অবদান খুঁজে পাই না। এর জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নিমাইয়ের চৈতন্যদেব হয়ে ওঠার প্রাক্-মুহূর্তটিতে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে সন্ধিযুগের সূচনা হয়েছে। তুর্কী বিজয়ের ঝঞ্ঝা অনেকটাই মন্দীভূত। বাঙালির চিন্তনে-মননে জেগেছে সংহতি সম্ভাবনা। কিন্তু অবক্ষয়িত সমাজমানসে আভিজাত্যের শূন্যগর্ভ আস্ফালন ও ভোগবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষা বাঙালি হিন্দুর জীবনধারাকে করে তুলেছে আচারভ্রষ্ট, পঙ্কলিপ্ত। স্খলিত সংস্কার বাঙালি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কতকগুলো রক্ষণশীল কু-সংস্কারকে ধর্ম বলে আঁকড়ে ধরছে। এমন ব্রাত্য ছিন্নমূল জাতিকে নতুন জীবনায়নের পথ প্রদর্শন করবার জন্য বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সূর্যপ্রভাস্বর জননেতা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজবিপ্লবের সূচনা করলেন শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ। হিংসা-দ্বেষ-নিপীড়ন-সংঘাত ও ভেদাভেদের অবসান করে প্রীতি-প্রেমের বাঁধনে মানবজাতিকে এক অভিনব আদর্শে উজ্জীবিত করলেন তাঁরা। এই মিলনযজ্ঞের পুরোধা ছিলেন নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গকে সামনে রেখে তিনি অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বৈচিত্র্য ঘটিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে বাংলার ঘরে ঘরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ধন্য করলেন নাম সঙ্কীর্তন প্রচারের মাধ্যমে। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরব। অধ্যাত্ম জগতেও এক অভিনব রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ভাষায়—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।[১]

গৌরাঙ্গের বৈচিত্র্যময় জীবন অশেষ ব্যক্তিত্ব নিত্যানন্দের দ্বারা সমাজে প্রতিভাত হয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে আচণ্ডালে যাঁর প্রেমধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তাদের ভাসিয়ে মাতিয়ে একাকার করেছিল। হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতিকে একান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। যিনি অলৌকিক আত্মশক্তির মাধুর্যের দ্বারা জাতিকে আত্মহননের হাত থেকে চরম ত্যাগ ও প্রেমের মধ্য দিয়ে শ্রেয় লাভের পথ দেখিয়েছিলেন, তিনিই নিত্যানন্দ। তাই বলা যায়—

১) অস্পৃশ্যতার আঘাতে বিভ্রান্ত জনসমাজে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যেন দুই নবযুগের আলোকস্তম্ভ।

২) শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে মহাভাবে আমগ্ন, তখন নিত্যানন্দই গৌড়মণ্ডলে ঘরে ঘরে হরিনাম তথা প্রেমধর্ম বিতরণে রত।

৩) নিত্যানন্দই চৈতন্যধর্মের প্রথম প্রচারক।

৪) নিত্যানন্দের তুলনায় চৈতন্যদেবকে মনে হয় প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু যৌবনোচিত দার্ঢ্যবোধ ও কাঠিন্যবশত কখনো কখনো 'তরোরিব সহিষ্ণুনা' মনোভাব ছেড়ে তিনি বজ্রকঠোর হয়ে যেতেন। যে ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন সেখানে উত্তেজক মুহূর্তে নিত্যানন্দ শান্তভাবে চৈতন্যদেবকে জগাই-মাধাই সংহারে নিবৃত্ত করেছেন। অথচ নিত্যানন্দ নিজেই ঐ দুই পাষণ্ডী প্রহারে হয়েছিলেন রক্তাক্ত-জর্জরিত।

নিত্যানন্দের মধ্যে প্রেম ও করুণার ফল্গুধারা সদা প্রবাহিত হত। গৌরাঙ্গের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিত্যানন্দ। জগাই-মাধাই-এর উদ্ধার, চোর দস্যু এবং সমাজের পতিত অপাংক্তেয়দের উদ্ধার করে নিত্যানন্দ মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের প্রেম-ভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল নিত্যানন্দ প্রভুতে। তাঁর চরিত্রে গৌরশক্তির পূর্ণতম প্রদীপ্ত উন্মেষ। চৈতন্যদেব যখন যে ভাবে ভাবিত হয়েছেন নিত্যানন্দ তখনই সেই ভাবধারা গ্রহণ করে তাকে আরও পুষ্ট করে তুলেছেন। নিত্যানন্দের করুণা সকলকে কৃতার্থ করেছে। পাপ পুণ্য বা যোগ্য ও অযোগ্যতার বিচার না করে তিনি নির্বিচারে সকলের আত্ম-উজ্জীবনের পথকে মসৃণ করেছেন। নিত্যানন্দের প্রেম ও করুণাধারা দেশের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে সমগ্র জাতি ও সমাজকে একতার উজানে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গসংস্কৃতিকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল। গৌরাঙ্গের পতিত উদ্ধার ব্রতকে রূপদান করে নিত্যানন্দ তাঁর আগমনের সফলতা প্রতিপাদিত করেন।

গৌরাঙ্গের জীবনদর্শনের সঙ্গে নিত্যানন্দের পার্থক্য ঃ

ক) গৌরাঙ্গ যেখানে কখনো কখনো কোপান্বিত-রুষ্ট, নিত্যানন্দ সেখানে সম্পূর্ণ করুণাবতার।

খ) গৌরাঙ্গ যেখানে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ সেখানে গৃহস্থ ধর্মপ্রচারক।

গ) গৌরাঙ্গ যেখানে যাবতীয় ভোগবিলাস বিবিক্ত সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ সেখানে তীব্র ভোগবাদে আসক্ত জীবনরসে বিশ্বাসী।

আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনধারা যেন গঙ্গা-যমুনার দুই বিপরীত স্রোত। কিন্তু জীবনসাগর সঙ্গমে তাঁরা একত্রিত বেণী বন্ধন রচনা করে মিলে গেছেন।

গৌরাঙ্গ মাতা ও পত্নীসহ গৃহী অধ্যাপক, কিন্তু কৃষ্ণনামামৃত সুধা পানে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। আর নিত্যানন্দ প্রথম জীবনে গৌরাঙ্গের নিত্যপার্শ্বচর, তখন তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষাও প্রেমাবতার। কিন্তু একজন যেখানে সাংসারিক ভোগবিলাসকে বর্জন করেন, অন্যজন সেখানে সন্ন্যাসের প্রতীক দণ্ড ভঙ্গ করে পত্নী-পুত্র সহ গৃহধর্ম পালন করেন। গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নীলাচলে ভাবসমাধিতে আত্মস্থ হয়ে কাটিয়ে দেন জীবনের অর্ধেক কাল। আর নিত্যানন্দ গৌড়বঙ্গের মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের সাংগঠনিক বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু চৈতন্যদেব যেরকম প্রত্যক্ষভাবে জীবনীসাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্যের কেন্দ্রে আলোকবর্তিকারূপে উপস্থিত ছিলেন, নিত্যানন্দ সেইভাবে সরাসরি বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রবর্তী হয়ে উঠতে পারেননি। বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম প্রসারের কেন্দ্রে নিত্যানন্দের বিরাট ভূমিকা, কিন্তু কবিদের কাছে চৈতন্যদেবের ভূমিকার পাশাপাশি নিত্যানন্দের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবু চৈতন্য জীবনী সাহিত্য থেকে নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে ক'টি সত্য বেরিয়ে এসেছিল, তার নির্যাস হল— ১) শ্রীচৈতন্যের ঘনীভূত প্রেমধর্ম নিত্যানন্দের মধ্যে আকার ধারণ করেছিল এবং ২) নিত্যানন্দই ছিলেন চৈতন্যধর্ম বিস্তারের মূল স্তম্ভ। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গের আদি ভক্ত বলে বর্ণনা করেছেন—

> চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
> চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।
> অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
> তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়।।[২]

নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ শুনে উল্লসিত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

> 'নিত্যানন্দ আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
> অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর।।'[৩]

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মতো গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মিলন ঘটেছিল নবদ্বীপের মাটিতে— নিমাই যেমন কৃষ্ণ, নিতাই তেমনই হয়ে উঠেছিলেন বলরাম। দুটি নাম এক বৃন্তে বাঁধা পড়ে গেল। নিমাই-নিতাই-এর মিলনের মধ্য দিয়ে দার্শনিকভাবে কৃষ্ণ-বলরাম ধারণাটি পূর্ণতা পেল।

> মহাভক্তি যোগপ্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
> গণসহ বিশ্বম্ভর হইল নমস্কার।।
> সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
> কেহ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া।।[৪]

প্রথম মিলনে দু'জনেরই স্তম্ভিত ভাব। যেন বহু বর্ষণের পূর্বাকাশ। উভয়েই বুঝলেন উভয়ের প্রয়োজন। যে প্রবল বর্ষণ সমস্ত বাংলাসহ ভারতভূমির মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের প্রথম মিলনের স্তব্ধতা তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গৌরাঙ্গ আনন্দে বিহ্বল হয়ে সম্ভ্রমে মাথা নত করলেন—

গণসহ বিশ্বম্ভর হইল নমস্কার।

ভাবলেন এই সেই। নিত্যানন্দও চিনতে পারলেন আপন ঈশ্বরকে। তিনিও স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর শ্রীবাসের বাড়িতে গৌরাঙ্গের অভিষেক। সেখানে আমরা দেখি—

সর্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জয় জয় দেয় কুতূহলী।।[৫]

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে ভক্তেরা মহাপ্রভুর স্তব করলেন। ভক্তপণ্ডিতদের সম্মতিক্রমে মহাপ্রভু বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। গৌরাঙ্গের এই বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্বলাভে নিত্যানন্দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা দেখি, গৌরাঙ্গ সকলকে আশীর্বাদ দিলেন এমনকি অদ্বৈতকে বরও দিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ বরদানের অনেক ঊর্ধ্বে। তাই তাঁকে বর দিলেন না, বরং নিত্যানন্দের পাদোদক সকল ভক্তকে খাওয়ালেন। নিমাই কৃষ্ণ, নিতাই হলেন বলরাম।

নিমাই বললেন—

প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ।।
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন।।
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করায় গ্রহণ।।[৬]

নিত্যানন্দের জীবন-যাপন পদ্ধতি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিল। বৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের মুখে নিত্যানন্দ প্রশংসাতে বলেছেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে।।
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা।।[৭]

নিত্যানন্দ প্রীতির কারণে শ্রীবাস ও গৌরাঙ্গের কাছে প্রশংসিত হন ও বর লাভ করেন। নিত্যানন্দ যোগী তত্ত্বজ্ঞানী, কিন্তু তিনি বালকস্বভাব; হাসি পরিহাস আনন্দ উচ্ছলতায় সারা নবদ্বীপ মাতিয়ে রাখেন।

কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়।।
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত হাস।।[৮]

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন--

অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।[৯]

আচার্য অদ্বৈতের কাছে এ শুধু মহাপ্রভুর অঙ্গীকার ছিল না---এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন নিত্যানন্দ। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

এরপর মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারের সহায়ক হলেন নিত্যানন্দ। তাঁর ধর্মপ্রচারের মধ্যে সংস্কারবর্জিত এমন উদারতা ছিল যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি প্রেম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সূত্রে গাঁথলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ অস্বীকার করে নিত্যানন্দ যখন প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য পথে বের হলেন তখন হরিদাসও তাঁর সঙ্গী হন। চৈতন্যদেব যে প্রেমধর্মের জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন তার সাফল্যের সূচনা হয়েছিল সেদিনই যেদিন ব্রাহ্মণ ও মুসলমান এই দুই প্রচারক একসঙ্গে ধর্মপ্রচারে বহির্গত হল। নিত্যানন্দের নেতৃত্বে এটা ঘটেছিল বলে ড. সুশীলকুমার দে নিত্যানন্দ সম্পর্কে বলেছেন—He took also the revolutionary steps of admiting under the banner of Chaitanyaism all classes of men without any discrimation.

জগাই-মাধাই উদ্ধারপর্বে এই দুই নিষ্ঠুর পাষণ্ডীর ব্যবহারে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মহাপ্রভু আরও বললেন--

জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।।[১০]

নিত্যানন্দ কিন্তু নিমাই'র এই কাজ সমর্থন করলেন না, বরং তিনি বললেন—

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি।।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই।।[১১]

এদের জন্য নিত্যানন্দকে দুর্ভোগ পোহাতে হল। তাঁর দুর্ভোগ দেখে নিমাই স্থির থাকতে পারলেন না। নিমাই ডাকে—

'চক্র চক্র চক্র' প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে'[১২]

নিত্যানন্দ প্রভু নিমাইকে বললেন তুমি স্থির হও—

আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই॥
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর॥
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির।[১৩]

জগাই-মাধাই উদ্ধারপর্বে গৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে নিত্যানন্দই তাঁকে প্রশমিত করেন। তাই বৃন্দাবনদাসের ভাষায় নিত্যানন্দ 'অক্রোধ পরমানন্দরায়'। শরণাগতকে শুধু রক্ষা করা নয়, গোভক্ষণকারী চণ্ডালকেও নিত্যানন্দ আপন প্রেমধর্মে দীক্ষা দিতে পারেন। মাধাইকে বাৎসল্য স্নেহে তিনি বলেন—

'শিশুপুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়।
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥[১৪]

জগাই-মাধাই আমূল পরিবর্তিত হল। অর্থাৎ যে অঙ্গীকার মহাপ্রভু করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ ফল ফলল নিত্যানন্দের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। নিমাই যেন তাঁর কাছে এ ব্যাপারে শিক্ষা পেলেন। ধর্মপ্রচারের এই ক্ষমামূলক পদ্ধতি যেন নিরূপণ করলেন। জগাই-মাধাই-এর উদ্ধারে নিত্যানন্দের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হল। তিনি নিজে করলেন অন্যকে শেখালেন। ধৈর্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম নিত্যানন্দের প্রচার ও তার ফল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ।

নিত্যানন্দই প্রথম প্রচার করেন গৌড়মণ্ডলে মহাপ্রভুর মূর্তিপূজা, 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।' এটি নিত্যানন্দ কথিত মন্ত্র। তিনিই মহাপ্রভুর মূর্তি গড়ে ঘরে ঘরে পুজো করবার রীতি প্রচলন করেন। গৌরাঙ্গের জীবিতকালেই নিত্যানন্দ এই মূর্তিপূজার প্রচলন করেন—

তিনমাস রৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন পাতিলেক খেলা॥
নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্করদাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্তি দেহ গৌড়দেশে॥[১৫]

নিত্যানন্দই বাংলাদেশে চৈতন্যভজনার আদি গঙ্গোত্রী—

যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥

অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের প্রতি বিরূপ ছিলেন। নিত্যানন্দ জাতি-ধর্ম, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা বিষয়ে উদার ছিলেন। তাঁর প্রেমধর্মে কোনো বাছবিচার ছিল না। মদ্যাসক্তিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। অদ্বৈত তাই ক্রোধান্ধ হয়ে নিত্যানন্দকে বলেন—

ঘরে [illegible] পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥[১৬]

অবশ্য পরে মহাপ্রভুর কৃপায় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মিলন ঘটে।

বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনার একমাত্র প্রেরণা উৎস বলেছেন নিত্যানন্দকে। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রাণমন সঁপেছিলেন। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা চৈতন্য ভাগবতের গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চরিত-সাহিত্যটিকে কোমল স্নিগ্ধ ও সরস করে তুলেছে—

ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।[১৭]

নিত্যানন্দ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় কবি যাননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যানন্দের স্থান বিচার করতেও বসেননি বৃন্দাবনদাস। তিনি শুধুমাত্র নিত্যানন্দ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয় সাধন করেছেন তাঁর রচনায়—

কেহ বলে, 'নিত্যানন্দ বলরাম-সম'।
কেহ বলে,—চৈতন্যের বড় প্রিয়তম।।
কেহ বলে মহা-তেজীয়ান অধিকারী।
কেহ বলে 'কোনরূপ বুঝিতে না পারি'।।
কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেইমত ইচ্ছা না বোলায় কেনি।।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কখনো শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ কখনো কখনো কৃষ্ণ বলরাম।।[১৮]

সন্ন্যাসে কৃতসঙ্কল্প হয়েই মহাপ্রভু তাঁর সঙ্কল্পের কথা নিত্যানন্দকে জানালেন কিন্তু নিত্যানন্দ বললেন, তুমি জগৎ উদ্ধার করবে সে তো খুবই ভাল কথা। তখন নিত্যানন্দ বললেন—'তুমি যে করিবে, সেই হইবে নিশ্চিত'।

কিন্তু—

তথাপিহ্ কহ সর্ব্বসেবকের স্থানে।
কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে।।[১৯]

সে যুগের পক্ষে এই কথা অত্যন্ত বিস্ময়ের। অবিসংবাদী এক নেতাকে তিনি বললেন, শুধু আমাকে নয়—'কহ সর্ব্বসেবকের স্থানে'।

বাংলায় ধর্মীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বোধ করি এই সময় থেকে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রদর্শিত যুক্তি মেনে নিলেন—

এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।[২০]

এইভাবে আলোচনায় ক্রমাগত অগ্রসর হলে দেখা যায় গৌরাঙ্গের সারাটি জীবন চৈতন্যদেব হয়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তে নিত্যানন্দ সহচররূপে তাঁকে সহায়তা করেছেন,

তাঁকে পুষ্ট করেছেন, গড়ে তুলেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। মহাপ্রভুর জীবনে নিত্যানন্দের সাহচর্য অবিসংবাদীরূপে সত্য। বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাস জানতে ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দকেও সমান গুরুত্ব না দিলে বোধকরি তা অকৃতজ্ঞতার সামিল।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পরিকল্পনায় ভক্তগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলেন।

ভক্তগোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
নিত্যানন্দ আচার্যরত্ন মুকুন্দ তিনজন।।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।।[২১]

নিত্যানন্দ এই সময়ে তাঁর সঙ্গে সহচররূপে বিরাজ করছিলেন। চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আচ্ছাদনে যে বিরাট বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হয়েছিল সেই সমাজ গঠনে নিত্যানন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।[২২]

এই বৈষ্ণব সমাজে সেদিন কোনো জাতিভেদ ছিল না—

বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি যে করে।
কোটি কোটি জন্ম অধম যোনিতে ডুবে মরে।।[২৩]

যাই হোক, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসসঙ্গী হলেন জগদানন্দ আর নিত্যানন্দ। এই সময়ে একদা নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভেঙে ফেললেন। এই দণ্ডভঙ্গের ঘটনাটি বৈষ্ণব ইতিহাসে এবং গৌরাঙ্গের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনায় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হন—

শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা।
নীলাচলে আনি' মোর সবে হিত কৈলা।।[২৪]

নিত্যানন্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্যের দণ্ডভঙ্গ ঘটনাটি নিত্যানন্দের জীবনাদর্শে অত্যন্ত প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসধর্ম ও ভাবোন্মত্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতে নিত্যানন্দ পরবর্তীকালে গৃহীজীবনযাপন করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সাংগঠনিক প্রসারে ব্রতী হবেন এই ঘটনা তারই প্রতীক। নিত্যানন্দের এই দণ্ডভঙ্গের ঘটনাটিকে সন্ন্যাসধর্মের বিরোধিতার প্রতীকী তাৎপর্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমাদের মনে হয় এ যেন রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই বৈরাগ্য বিরোধী আদর্শের প্রচার—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।।' (নৈবেদ্য)

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ অন্তে প্রথমাবধি নিত্যানন্দ তাঁর সহচর হলেও শ্রীচৈতন্য পরে তাঁকে নির্দেশ দিলেন নবদ্বীপে ফিরে যেতে—

প্রভু বলে,—শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।

শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন।।[২৫]

চৈতন্যবিরহজীর্ণ বাংলার ভক্ত সমাজ নিত্যানন্দের কাছে যেন নূতন করে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করলেন। নিত্যানন্দই প্রথম প্রচাব করেন গৌড়মণ্ডলে মহাপ্রভুর মূর্তিপূজা। 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম'—এটি নিত্যানন্দ কথিত মন্ত্র।

নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি বিতর্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যুগোপযোগী প্রচার পদ্ধতিই নিত্যানন্দের অভিপ্রেত ছিল। তাই তিনি প্রচার পদ্ধতিতে যোদ্ধৃবেশ ধারণ করেছিলেন। এই অংশের বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর ও মনোরম –

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রাএ।
রুনু ঝুনু কনক নূপুর বাজে পাএ।।
স্বর্ণ বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্ত দাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ দেখি অনুপাম।।
হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙা চরণ যুগলে।।[২৬]

কিন্তু মহাপ্রভুরও এই ব্যাপারটি অনভিপ্রেত ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু নিত্যানন্দ বিচলিত না হয়ে বললেন—

শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।।[২৭]

অর্থাৎ তিনি মহাপ্রভুকে বোঝালেন স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী সহজ প্রচার পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন যা যুগোপযোগী। মহাপ্রভু মেনে নিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানবসমাজকে এক প্রেমসূত্রে বাঁধলেন নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গই হয়ে উঠলেন সেই নামপ্রেমের নূতন আলোকমন্ত্র। চৈতন্যদেব যে প্রেমধর্মের জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন তার সাফল্যের সূচনা হয়েছিল সেদিনই। অদ্বৈত, হরিদাস কাজীদলনের পথে নিত্যানন্দসহ কীর্তন ও স্বাধীনভাবে স্বধর্মচর্চার প্রতিষ্ঠায় বেরিয়েছিলেন।

চৈতন্যাশ্রিত প্রেমধর্মের আলোয় যে বিরাট বৈষ্ণব সমাজ গড়ে ওঠে সেই সমাজের অবিসংবাদী নায়ক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন নিত্যানন্দ। চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভারত পর্যটনের দ্বারা বাঙালির বদ্ধ গ্রাম্যজীবনে মনোজগতের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। চৈতন্য ধর্মই প্রথম বাঙালির মনের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য।

সমগ্র গৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল নিত্যানন্দের। তাঁর অরক্ষণীয় ভোগবিলাসী আচার-আচরণ অনেক সময় শঙ্কার কারণ হয়ে উঠলেও নিত্যানন্দের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রীচৈতন্য। নিত্যানন্দ প্রভুর লৌকিক জীবনকথাও নানা বৈচিত্র্য-পরিপূর্ণ হয়ে জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একথা

লক্ষণীয় যে গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই তরুণ নিতাই ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ঘুরে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন আচার-বিচার, দারিদ্র্য, জীবনযাপন সমস্যা প্রভৃতি বিবিধ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁর এই অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝতে ভুল করেননি। নানা রাজ্য পরিক্রমান্তে পশ্চিম ভারতে গিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্মেব প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজের শৈব-ধর্মাসক্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রেমধর্মে অভিসিঞ্চিত হন। নিত্যানন্দ শিশুস্বভাব। কারণবিলাসী, বয়সে ও আকারপ্রকারে নিমাই অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। সুতরাং ভক্তদের কাছে কৃষ্ণদেহ গৌর-জ্যেষ্ঠ বলরাম অবতার হয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ—

'ভক্তান্ত রূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ'।

নিমাই মাঝে মাঝে রৌদ্ররসে মগ্ন হয়ে কোমলতাকে ভুলে গেলেও নিত্যানন্দ আমগ্ন গঙ্গোত্রী, যথার্থ প্রেমের রূপকার এই নিত্যানন্দ।

চৈতন্য জীবনে নিত্যানন্দের প্রভাব এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলা যায় গৌরাঙ্গের 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা' চরিত্রধর্ম গড়ে ওঠে নিত্যানন্দেরই প্রভাবে। বাল্য, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক সামাজিক জীবনে গৌরাঙ্গ কোথাও কোথাও অসহিষ্ণু, জ্যেষ্ঠদের বিব্রত ও ব্যস্ত করেছেন নানাভাবে, জ্ঞান শিক্ষার অহঙ্কার থেকেও তিনি মুক্ত নন, জগাই মাধাইকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি সুদর্শনকে আহ্বান করেন। কাজীর ঘরে তিনি অগ্নি সংযোগ করতে চান। গৌরাঙ্গের তরুণ বয়সোচিত এই বজ্রকঠিন চরিত্রধর্মকে সম্পূর্ণ প্রেম ও করুণায় আপ্লুত করেছিলেন নিত্যানন্দ। তাই গৌরাঙ্গের করুণাবতার হয়ে ওঠার পশ্চাতে নিত্যানন্দের প্রভাবই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে চৈতন্যদেবের বাণীরূপে যে 'শিক্ষাষ্টকে'র কথা প্রচলিত আছে তার প্রতিটি সূত্রের অনুসারেই নিত্যানন্দ কর্মপদ্ধতি পরিচালনা করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরেও নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তখন বলেছিলেন—

জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিয়া সভায় নাচামু কীর্ত্তনে॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে॥[২৮]

শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর এই শপথবাক্য পালন করার চেষ্টা করেন এবং সাফল্যও অর্জন করেন নারীর অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

'শিক্ষাষ্টকে'র মর্মকথা তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সাম্যবাদ, রাগানুগাভক্তি ইত্যাদি সমস্তই ধর্ম প্রচারের কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন নিত্যানন্দ। চৈতন্যদেব বলেছিলেন—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান।।
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়।।
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি, তার প্রেম ভক্তি বাধ।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।[২৯]

মহাপ্রভুর এই উক্তি নিত্যানন্দের জীবনে ও কর্মে প্রতি পদে সত্য হয়ে উঠেছিল। চৈতন্য বিগ্রহপূজারও প্রথম প্রবর্তক নিত্যানন্দ। পানিহাটী-খড়দহ থেকে শুরু করে ফুলিয়া পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলি নিত্যানন্দের চৈতন্যধর্ম প্রচার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। পানিহাটীর চিঁড়া মহোৎসবে ছত্রিশ জাতিকে একত্রে ভোজন করিয়ে নিত্যানন্দ সর্ব জাতি মিলনের মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরিত্রের পবিত্রতা বোঝাতে গিয়ে যথার্থই বলেছিলেন—

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল।।[৩০]

গৌরাঙ্গ নিজের অপেক্ষাও ভক্ত পরিমণ্ডলে নিত্যানন্দকে বড় আসন দিয়েছিলেন—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।[৩১]

শ্রীচৈতন্য যে প্রকৃতার্থেই বৈষ্ণবোচিত গুণরাজির মহত্তম প্রকাশ, নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর নম্র আচরণ সেই সত্যই প্রমাণ করে—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রচারিত তত্ত্বের প্রভাব

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নিকট শুধু প্রেমধর্মের দীক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম ও প্রধান অলিখিত শর্ত মেনেছিলেন। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারেই তিনি তাঁর শেষ জীবন সম্পূর্ণ ও নিবিড়ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্যানন্দ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সর্বোপরি তিনি আজও সমাদৃত। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিত্যানন্দের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে একটি শ্লোক বলা হয়েছে।

আশ্চর্যং যস্যকন্দো যতিমুকুট মণিমাধবাখো মুণীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রি ভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এ বাবধুতঃ
শ্রীমদ্বক্রেরাদ্যা রসমবপুষঃ স্কন্দশাখা স্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবংযৎ[১]

এই শ্লোক অনুসারে চৈতন্য ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের স্থান সর্বোচ্চ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু লীলামাহাত্ম্যের এই নিগূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন—

প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাইল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোকে না পারে বুঝিতে।।[২]

প্রেম ও ভক্তি অর্থাৎ 'প্রেমভক্তি' হল হৃদয়ের গভীরে সমবস্থিত দুই বিশেষণের নিপুণ সংমিশ্রিত উপাদান সমূহ। এই বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কী এবং কেমন—তা শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস' ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক বিতরিত অসীম ও গভীর প্রেমভক্তির প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন---যত কিছু চৈতন্যের সর্ব্বশক্তি, শক্তি শক্তিমান হতে পৃথক নহে।

গৌরসুন্দর নিজেও অকৃত্রিম সম্পর্কে বলেছেন নিত্যানন্দ আমার দ্বিতীয় দেহ—

আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দচন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাহার পদ-দ্বন্দ্ব।।
পরম নিগুঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যা'রে জানাই সেই যে জানে তা'নে।।[৩]

গৌরাঙ্গদেব আরও গোপনীয় কথা বলেছেন এই যে, এঁরই আদেশ-নির্দেশ পালন করে আমার জীবনের সব কিছু—

রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই॥
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।[৪]

এরপর নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গৌরাঙ্গদেব নিজেই পানিহাটী থেকে নৌকা করে বরাহনগরে এলেন। সেদিন ছিল মধুকৃষ্ণা এয়োদশী। তারপর তাঁরা শ্রীল রঘুনাথ ভাগবত আচার্যের শ্রীপাটে পৌঁছালেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥[৫]

এই বরাহনগরে এসে গৌরাঙ্গদেব তাঁর দ্বিতীয় দেহস্বরূপ নিত্যানন্দকে নিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন। তাছাড়া অপরিচিতদের মাঝে আপনজন হওয়ার সদিচ্ছা ও প্রবল আন্তরিকতার মাধুর্যে ঐ গ্রামের মানুষের (ক) সামাজিক ও (খ) অর্থনৈতিক অবস্থা নিজে জানবার ও নিত্যানন্দকে জানানোর জন্য সমগ্র গ্রাম ভ্রমণ করলেন। কারণ বাস্তবের মধ্যেই নিহিত থাকে যে-কোনও সমস্যার সমাধান। যা কিনা মানুষের অন্তরের দর্পণে লুকিয়ে থাকে। দূরের ও কাছের দূরত্ব যখন এক বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় তখনই পারস্পরিক দর্পণে যে চিত্র প্রতিফলিত হয় কালক্রমে তাই হয়ে ওঠে সামাজিক দিক-নির্ণয় স্বরূপ। মহানুভব গৌরাঙ্গদেব জানতেন যে, এইসব মানুষদের নিয়েই তাঁর পার্ষদ নিত্যানন্দের ভবিষ্যৎ কর্মধারা প্রসারিত হবে। আর যুগোপযোগী অথচ চিরন্তন এবং বাস্তবিক অর্থে সহজ পথের রাস্তা যত দীর্ঘ হবে, মানব কল্যাণমূলক মঙ্গলদীপের অনির্বাণ শিখা ততই ঊর্ধ্বগতিতে ছুটে চলবে এবং আলোর নীচে পড়ে থাকা অন্ধকারও সহজে ঘুচে যাবে—

এইমত প্রতি গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণকাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল ধাম॥[৬]

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সান্নিধ্য পেয়ে বা সান্নিধ্যে থেকে অচিরেই একজন পরমভক্ত ও প্রকৃত প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ে নিত্যানন্দ সর্বদা গৌরাঙ্গের পাশাপাশি অবস্থান করতেন। গৌরাঙ্গের অসীম করুণা, মমত্ববোধ মানবপ্রেম এবং মানবকল্যাণের প্রতি নিষ্ঠা দেখে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গুণগাথা ও জীবনচর্যা কীর্তন শুরু করেন—

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক শ্রীনিত্যানন্দ মুখে অন্য।।
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই।।[৭]

কিন্তু নীলাচলে গিয়েও গৌরাঙ্গ পূর্বের ন্যায় অস্থির রইলেন। কোনোভাবেই তিনি স্থির হতে পারলেন না। শুধু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে পার্থিব সুখ মোহের জাল থেকে মুক্তি পাওয়া গেলেও মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণানন্দে নিবিষ্ট হয়ে থাকতে তাঁর মন কোনোভাবেই সায় দিল না। বরং ফেলে আসা বাংলার সমাজজীবনের যে রূপ (যা বিশৃঙ্খলামূলক এবং জনজাগরণের পক্ষে বিভ্রান্তিকর ও অবশ্যই ভ্রান্ত) তিনি দেখেছেন তার সংস্কার সাধনের জন্য তাঁর মন গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। তাছাড়া সমাজমানসে শান্তি স্থাপনের জন্য যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেই মণিকাঞ্চন স্বরূপ গুণ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা সযত্নে রক্ষা করার জন্য তিনি যে তাঁর নিতাই জীবনকেই আদর্শরূপে গড়ে তুলেছেন! তাঁকেও তো তাঁর আরব্ধ কাজে লাগাতে হবে।

জ্ঞান সঞ্চয় ও জ্ঞান বিতরণ এই দুয়ের মধ্যে ফারাক থাকলেও এই দ্বৈত ভূমিকায় এক অসাধারণ ব্যক্তি নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ নীলাচল থেকে গৌড়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসার আদেশ দিলেন। গৌরাঙ্গ এটাই বুঝেছিলেন তাদের জাগরণই মুক্তি তথা সমাজ সংস্কারের শেষ কথা। গৌরাঙ্গের আদেশে নিত্যানন্দ গৌড়ে ফিরে এলেন। নিত্যানন্দের কর্মজীবন শুরু হল সেখানে। যেখানে—

(১) গ্রামবাংলার মানুষ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে।
(২) তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের স্বার্থ কায়েম করবার জন্য বাংলার সাধারণ মানুষকে মূর্খ করে রেখেছে।
(৩) মানুষকে করে রেখেছে দরিদ্র।
(৪) তদুপরি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসাজস করে সাধারণ মানুষকে পায়ের নীচে রেখে দিয়েছে।

আমরা বিংশ শতাব্দীর কবিকণ্ঠে যেন নিতাই ও চৈতন্যের সেই বাণীই ধ্বনিত হয়ে উঠতে শুনি—

যারে তুমি নীচে ফেল।
সে তোমারে টানিবে যে নীচে।।

সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন অবহেলিত করার পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলার এত অধঃপতন। নিত্যানন্দ তাঁদের মধ্যে এবং তাঁদেরই একজন হয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনিই সর্বময় উদ্ধারকর্তা হিসেবেই গৌড়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

তারপর—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।।
প্রভু বলে—'শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।

....

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।।[৮]

নিত্যানন্দ যে গৌরাঙ্গের আদেশ তাঁর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, সেকথা আমরা জানি। তাঁর ধর্মপ্রচার এবং ধর্মপদ্ধতি আমরা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এক সময়ে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার।।
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে।।[৯]

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মুখ থেকে এইসব অমৃতকথা শুনে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রচারের মূল্য অনেকখানি। শুধু অনেকখানিই নয়, সংবেদনশীলতার বাণে বিদ্ধ 'প্রেম' নামক ছোট্ট কথাটির অতলান্ত গভীর একটা ছায়াস্পর্শ নিত্যানন্দের প্রচারিত বাণীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি। তাঁর চেষ্টায় নিশ্চিতভাবেই একটা গণসংযোগ তৈরি হয়েছিল। আর দয়াময় নিত্যানন্দও সমাজের নিম্নস্তরের উপেক্ষিত এক বিরাট অংশকে বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে মর্যাদা দান করেছিলেন। কেবল তাই নয়, মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে যে সততা এবং অবশ্যই সত্যের দ্বারা চালিত কোনো ধর্মকে অবলম্বন করে চলতে হয় এটাও দেখিয়েছিলেন। ১৫১৫ থেকে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই একশত বৎসর অর্থাৎ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা হওয়ার পূর্বে নিত্যানন্দের প্রচার গণসংযোগের এক ও অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই কাজ করেছিল। আর এই বৈপ্লবিক আবেদন সম্পৃক্ত ঘটনা বৈষ্ণব সাহিত্যের পরবর্তী ইতিহাসেও নেই।

মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম নিত্যানন্দের মাধ্যমে প্রচার লাভ করতে শুরু করে এবং তা মহাপ্রভুর জীবদ্দশায়, তাই নিত্যানন্দের প্রচার ও ফল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনে এক মহত্তর ঘটনা। তাছাড়া নিত্যানন্দের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় মহাপ্রভুর জীবিত কালেই গৌরাঙ্গ মূর্তির পূজার প্রচলন হয়েছিল—

নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্তি দেহ গৌড় দেশে।।[১০]

নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনে তাঁর তত্ত্বকথা আলোচনা করতে গেলে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সেটি হল, মহাপ্রভু শ্রীরূপ এবং সনাতনকে পাঠালেন মথুরা-বৃন্দাবনে। আর নিত্যানন্দকে পাঠালেন গৌড়দেশে। অথচ তাঁদের প্রচার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। শ্রীরূপ-সনাতন রসশাস্ত্র এবং দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন, আর নিত্যানন্দ শুরু করলেন গণসংযোগ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাপ্রভুর প্রবর্তিত একই বৈষ্ণব ধর্মের দুটি শাখা। চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই নিত্যানন্দের প্রবর্তিত ধারা গৌড়ে ও রাঢ়ে প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসতত্ত্বের ধারা অর্থাৎ যুগলরস নিত্যানন্দের প্রচারিত ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে প্রচারিত হয়েছে। তাই যুগলরসের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রচারিত অকিঞ্চন সমরস (পতিত উদ্ধার) না থাকলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অসম্পূর্ণ।

বিশেষত নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ কর্তৃক চোর-দস্যু উদ্ধারের উজ্জ্বল আখ্যানটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি কীভাবে চোর-দস্যু উদ্ধার করলেন তা বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেইমতে।।
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত।।
চতুর্দিক ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত মণি।।
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
এই বলি বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয়।।[১১]

এইভাবে নিত্যানন্দ চোর, দস্যু, চণ্ডাল তথাকথিত দুর্বল দুরাগ্রস্ত জাতিকে ঊর্ধ্বায়িত করে তুললেন। পাশাপাশি তিনি সমাজকে মুক্ত করলেন ঐ সমস্ত মানুষদের কলুষতা থেকে। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের মূল ভাবকে তিনিই পরিপুষ্ট করেছিলেন। মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন বিশ্বাস এবং 'অবশ্যই জীবনের মাধুর্য। মানবজীবনের পক্ষে এ বিশেষ জরুরি অন্যথায় জীবন 'মৃতস্বরূপ' এক বিশেষ বোঝা, বিভীষিকা-ও অভিশাপ

হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অধঃপতিত সমাজকে অনেকাংশে রক্ষা করেছিলেন। তারপর নিত্যানন্দ পবিত্র গঙ্গার উভয় তীরে গ্রামে গ্রামে তাঁর প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন—

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয় পরমানন্দ-সুখে॥
তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
খানাচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকীর্তি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥[১২]

বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ যে সমস্ত জায়গায় গিয়ে জীবপ্রেম এবং কৃষ্ণনাম প্রচার করেছেন সেই স্থানগুলি (মানচিত্র ২.....দ্রষ্টব্য) হল ---নবদ্বীপ, পানিহাটী, খড়দহ, নিমতা, এড়িয়াদহ, নিত্যানন্দতলা, একচক্রা, বক্রেশ্বর, কাটোয়া, কুলিয়া, অম্বুয়া, বড়গাছি, কাঞ্চনপল্লী, কুমারহট্ট, উদ্ধারণপুর, আটিসারা, ছত্রভোগ, হাতিয়াগড়, নিত্যানন্দপুর, পাথরঘাটা, তাম্বূলী, পিছলদা, দোগাছিয়া, খানাজোড়া, ত্রিবেণী, আকনামাহেশ, চাতরা, কোতরং, বেতড়, বুড়ন, মায়াপুর, ফুলিয়া, বাণীদিঘী, যশোড়া ও জলেশ্বর[১৩]। ক্রমেই সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচ ও ক্ষুব্ধ মানুষেরা নিত্যানন্দের প্রেমের স্পর্শে উদ্বেলিত ও জাগরিত হয়ে উঠল। নিত্যানন্দের জাদুস্পর্শে অর্থাৎ তাঁর বাচনভঙ্গী হিমবাহের প্রবাহেই সংসার সীমান্তের লোকেরাও সংসারের ইতিকথা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল। আর এঁদের মূলমন্ত্র ছিল শুধু মানবপ্রেম। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই শিরোধার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, এরকম অভূতপূর্ব গণজাগরণ বাংলার বুকে আর ঘটেনি। আর সহনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ নিত্যানন্দের নায়কোচিত ভাবমূর্তি সৃষ্টি এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে নায়কোচিত প্রশংসালাভ, মহানায়কে উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি ঘটনা বিরল। বিচিত্র ঘটনাজালে নিজেকে জড়িয়েও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর গভীর প্রেম শুধু তাঁকেই মহান করেনি, গৌরাঙ্গপ্রেম বা মানবপ্রেমকেই ত্বরান্বিত করেছে, তা পরিণত হয়েছে সর্বজনীন মানবপ্রেমে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যদি গ্রাম বাংলার সহজ-সরল মানুষদের পাশে এসে না দাঁড়াতেন এবং তাঁর ঐ অকিঞ্চন সমরস মানুষের হৃদয়ে সিঞ্চিত না করতেন, তবে হয়তো বাঙালি হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হত। এই সময়ে এই সম্প্রদায়ের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াও একেবারে আশ্চর্য ছিল না। এই ভয়াবহ পরিবেশের আশঙ্কা তিনি পূর্বানুমানের দ্বারা করেছিলেন। তদুপরি প্রচার মাহাত্ম্যের দ্বারা তিনি পতিত-নিপীড়িত বাংলার মানবসমাজকে রক্ষা করেছিলেন। নিত্যানন্দের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই।

নিত্যানন্দ যখন গৌড়ে প্রচার আরম্ভ করেন (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) তখন হুসেন শাহের রাজত্বের শেষ এবং নুসরৎ শাহের সম্পূর্ণ রাজত্বকাল। এটা সহজেই অনুমেয়, রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া বোধহয় নির্বিঘ্নে তাঁর প্রচার কাজ চলেনি। মহাপ্রভুর তিরোভাবের শেষ ১২ বৎসর অর্থাৎ মোট ৩০ বছর নিত্যানন্দ প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রচার করেছিলেন গৌরাঙ্গই উপাস্য। আমরা জানি তিনি গৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং এই মূর্তি প্রথম প্রতিস্থাপন করেন (অম্বুয়া) কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে। এরপরেই ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ মূর্তি পূজার প্রচলন হয়।

অদ্বৈত আচার্য বোধহয় নিত্যানন্দের প্রচারকর্ম পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি শান্তিপুর থেকে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে একটা তরজা পাঠিয়েছিলেন—

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা।।
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর সেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা।।[১৩]

নিত্যানন্দের প্রচারের প্রায় ১২ বৎসর পরে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর কাছে এই তরজা প্রেরণ করেন। এই তরজা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু বাদ-বিসংবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন এই তরজায় নিত্যানন্দের প্রচারের প্রতি কটাক্ষ আছে। আবার গিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে এ বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নয়। তিনি ধারণা করেছেন 'পতিত উদ্ধারের প্রতি এই তরজায় কোন কটাক্ষ না থাকলেও এই প্রচারের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়ার সহিত এই তরজা প্রহেলিকার একটা যোগাযোগ ছিল'।[১৪]

আমরা দেখি নিত্যানন্দের প্রচারের সময়ে দুটি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

'জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে'[১৫]

ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের একথা খুব সহজ কথা নয়। একদিকে স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ সমাজ অন্যদিকে বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রশক্তি। এই দুই প্রবল শক্তির মাঝখানে নিত্যানন্দ শুধু নির্ভীকভাবে অবস্থানই করেননি, চণ্ডাল ও যবনকে একত্রিত করে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে তিনি যে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করে গেলেন তার বৈপ্লবিক বিবর্তন আমাদের এই সংস্কারদীর্ণ সমাজে শুভফলপ্রদ হয়ে থাকবে চিরকাল।

নিতাই-গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও দার্শনিকতার মূল্যায়নে প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বরূপ দামোদর। গৌরাঙ্গের নীলাচল লীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় লিখেছেন—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।[১৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্ব মহিমা নিরূপণে বলেছিলেন—

ভক্তরূপচৈতন্য ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ।
ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তনামক শ্রীবাসাদি
ভক্তশক্তি শ্রীগদাধর[১৭].....

আবার—

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে।।
পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ।।[১৮]

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের এই অভিন্ন-অন্তরঙ্গ ভূমিকা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সংকীর্তন প্রচার-প্রসারে নিত্যানন্দের ভূমিকা কতখানি ছিল। তাঁর মহিমার নিগূঢ় কথা চৈতন্য ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে—

মোর দেহ হতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়।।[১৯]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব।।[২০]

নিতাই ভক্তস্বরূপ—

'ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই'[২১]

ভক্তস্বরূপে আরাধক ও আরাধ্য উভয়ের মধ্যে একের অভাবে অন্যের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় থেকে শুরু করে নিত্যানন্দ নিজের জীবিতকাল পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ৫ বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাতেই তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেন। শারীরিকভাবে দূরে থাকলেও কিন্তু তিনি ধ্যানেতেই মহাপ্রভুর অনুভব উপলব্ধি করতেন। শয়নে-স্বপনে বা জাগরণে মহাপ্রভুর চির উপস্থিতিই নিত্যানন্দকে অসীম সাহসী এবং নিষ্ঠাসম্পন্ন হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনতত্ত্বের আলোচনায় নিত্যানন্দের ভূমিকার তাৎপর্য অপরিসীম।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্প কিছু দিন পর নিত্যানন্দ বিবাহ্ করেন। জয়ানন্দ বলেছেন—

সূর্যদাস নন্দিনী বসু জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী।।[২২]

আবার ভক্তিরত্নাকরে—

লোকশাস্ত্রমতে সূর্যদাস ভাগ্যবান।
নিত্যানন্দে দুইকন্যা কৈল দান।।[২৩]

এখানে এসে আমরা একটু আশ্চর্য হই। চৈতন্যদেব যেখানে নিত্যানন্দকে তাঁর দ্বিতীয় দেহ বলে সম্বোধন করেছেন সেখানে নিত্যানন্দের জীবনাচরণে এক ভিন্ন পদ্ধতি—একদিকে মহাপ্রভু দু'বার বিবাহ্ করে সংসারত্যাগী হলেন, অন্যদিকে নিত্যানন্দ অবধূত হয়ে বংশবিস্তার করলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি—(ক) মহাপ্রভুই মানুষকে দিলেন সন্ন্যাসের আদর্শ ও তার ভাবতত্ত্ব যার কৌলীন্যে মানুষের মুক্তির পথের ঠিকানা মেলে। (খ) আবার তাঁরই দ্বিতীয় দেহস্বরূপ মানবকল্যাণে এক অবিচল সৈনিক নিত্যানন্দকে দিলেন গার্হস্থ্যের আদর্শ। হয়তো তাঁদের এই ভিন্ন কর্মধারার মধ্যেও কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাই নিত্যানন্দ বলেছেন—

তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি।
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা।।
তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম ছাড়ি।।
আচার্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ ভক্তি আচরণ।।
মুনিধর্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে সে সকল হাস্য করে।।[২৪]

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনে পণ্ডিত গদাধর বিরূপ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সন্ন্যাস বিষয়ক ব্যাপারটি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। গার্হস্থ্যই সমাজজীবনের সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থা এবং চিরহরিৎসম্পন্ন। মানুষের পারস্পরিক এই সম্পর্কের সুদৃঢ়তা এবং সুফল সম্পর্কে কোনো দ্বিমত না থাকাই সমীচীন। তদুপরি গৃহধর্মই সমাজকে সুস্থ রাখতে পারে একথা বোধহয় নিত্যানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন—

'কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।'

এভাবে ভাবলে আমরা নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ পেতে পারি। এছাড়া গৃহী ও সন্ন্যাসীর ব্যবহারিক জীবনেও থাকে দুস্তর ফারাক বা প্রভেদ। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ—এই স্বর্ণময় অক্ষরগুচ্ছকে বাস্তবায়িত করার অর্থ এর অন্তর্নিহিত অর্থকেই তুলে ধরা অর্থাৎ মানুষের অতি সন্নিকটে আসা বা অবস্থান করা আর প্রবাদপ্রতিম গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ উভয়েরই ছিল এই ভাবাদর্শ। যেখানে মানুষের সন্নিকটে থাকা জরুরি, সে ক্ষেত্রে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে তা অসম্ভব। কারণ একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সকলের সান্নিধ্যে গিয়ে অথবা গৃহীর সংসারে প্রবেশ করে মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। সাংসারিক মানুষ বনাম সন্ন্যাসীর পার্থক্যের রূপরেখা অত্যন্ত জটিল। অপরপক্ষে গৃহীর অবস্থান অনুসারে এই কঠিন কাজটি অতি সহজ। তাই আমরা নিত্যানন্দের গৃহীজীবনের আদর্শকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি তাহলে হয়তো খুব ভুল করা হবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর সমগ্র বাংলাদেশে প্রচারকার্যের ভার পড়েছিল (ক) অদ্বৈত (খ) নিত্যানন্দ (গ) নরহরি সরকার (ঘ) শ্রীবাস এবং অন্যান্য চৈতন্য পার্ষদদের উপর। আমরা পূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি, নিত্যানন্দের বিবাহের আদর্শের পিছনে তাঁর প্রচারকার্যের সুবিধার কোনো উদ্দেশ্য ছিল। তা ছাড়া ভারতবর্ষের বংশানুক্রমিক গুরুপরম্পরায় চলবার রীতিও প্রচলিত ছিল। সেই রীতি অনুযায়ী নিত্যানন্দের বিবাহ খুব অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। নিত্যানন্দ বলেছিলেন—

> ‘কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
> অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে।।’[২৫]

এই যে কূলবধূকে কীর্তনানন্দে সম্মিলিত করা এর জন্য তাঁকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের আদর্শ ছিল—

> ‘আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাইমু’।

এই আদর্শের রূপায়ণে নিজের জীবন ও সংসারকে তো উৎসর্গ করতে হবে। তাই আমরা পরবর্তীকালে দেখি ১) জাহ্নবাদেবী গুরুগোস্বামিনী রূপে বৈষ্ণব সমাজে তথা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। ২) নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র স্বনামধন্য শক্তিশালী পুরুষ। ৩) তাঁর কন্যা গঙ্গাদেবীও বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এইভাবে আমরা দেখি নিত্যানন্দ তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা বৈষ্ণব সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ রেখে নয়, বা গৃহের বাইরে এনে তাঁকে অপাঙক্তেয় করে নয়, সমস্ত নারীসমাজকে সমমানবতার আদর্শে উজ্জীবিত করে তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যকে উদ্‌ভাসিত করে পুরুষের সঙ্গে সমান আনন্দের অংশীদার করেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এ বড় কম কথা নয়। তাঁর অঙ্গীকার—‘কূলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে’ বোধকরি ষাট ভাগ ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল।

বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের খেলার সঙ্গী গোপ বালক-বালিকার ভক্তি বহু তপস্যার ফল, যা ব্রহ্মামহেশ্বরাদি দেবতাদেরও কাম্য, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী উদ্ধব পর্যন্ত যে ভক্তি তা তাঁর অতিপ্রিয় পাত্রই লাভে সক্ষম। এই ভক্তি নিত্যানন্দ প্রচার করেছিলেন—এই ভক্তিতে উত্তম অধম কোনো ভেদ ছিল না।

তাই আমরা চৈতন্য ভাগবতের ভাষায় বলতে পারি—

নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।

তোমা হৈতে হৈল এবে সবার মোচন॥[২৬]

নিত্যানন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর টীকাকার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় তাঁর ৪১নং শ্লোকের ব্যাখায় অতি সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বলেছেন যে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্মফলবাস, নীচযোনির কলঙ্ক বিদূরিত করেন, তার কৃপ পাণ্ডিত্য ও অধমত্ব হতে মুক্ত করেন এবং তাকে পতিত অধম ও নীচজাতি রেখে নিজে পবিত্র ও উত্তম শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে বসে থাকেন না। নিত্যানন্দ প্রভু জীবকুলকে জাতিগত উচ্চাবচত্ব ও পাপ-পুণ্য হতে আত্মজ্ঞান দানপূর্বক মুক্ত করেন।[২৭]

একথা নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অতীব সত্য যে, তিনি তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়কে গোকুলবাসীর মতোই গৌর তথা কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। গৌড়বাসী ভক্তজন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের বশ। এই প্রেমভক্তির বিবিধ রূপ—১) বাৎসল্য ২) দাস্য ৩) সখ্য ৪) মধুর। এদের মধ্যে সখ্য প্রেমের গুরুত্ব অতুলনীয়। এই প্রেমের আগুনে অসংখ্য হৃদয়কে পুড়িয়ে নিত্যানন্দ নিজের আত্মবুদ্ধির ন্যায় জনমানসের মনেও ন্যায়ের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁর শিষ্যদের প্রেম ও ভক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। বিবিধ প্রেমভক্তির মধ্যে সখ্য প্রেমই ছিল তাঁর আদর্শ। শ্রীভগবদ্গীতার-৪/১১ শ্লোকে আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥[২৮]

এই জন্য নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপেই লাভ করতে চান। তাই তাঁদের ভজনপদ্ধতিতে ব্রজবালকদের মতোই ১) চঞ্চলতা ২) উদ্দামতা-র পরিচয় মেলে। পানিহাটীতে নিত্যানন্দের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে ভক্তগণ আনন্দিত মনে—

কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।

পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥

কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।

বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥

কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় বড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু, কম্প স্তম্ভ ঘর্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বর-ভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জন সিংহসার॥
শ্রীআনন্দমূর্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-বল॥
যেদিকে দেখান নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেইদিকে মহা-প্রেমভক্তি বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন সে-ই প্রেমে মূর্ছাপ্রায়।
বস্ত্র না সম্বরে, ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥[২৯]

নিত্যানন্দ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন বিশিষ্ট মানবপ্রেমিক। তাঁর বিভিন্ন কর্মধারায় এই যুক্তি গভীর থেকে শুধু গভীরতর হয়েছিল তা নয়, তা এমন এক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যাতে তাঁকে সহজেই সেই সময়ের তথা ভাবীকালের ত্রাতা হিসাবে বর্ণনা করা যায়। এর আরও একটি কারণ ছিল শিশুদের প্রতিও তাঁর স্নেহ, প্রেম ও কৃপা ছিল অবাধ। বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু দুই কুতূহলী॥
এইমত নিত্যানন্দ বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥

পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
কবায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া॥
কারেও বা বান্দিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন তবু অট্ট অট্ট হাসে॥[৩০]

চৈতন্য ভাগবত ক্রমানুসারে নিত্যানন্দের সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্য়ত্রিশ জনের নাম আমরা পাই—

১) রামদাস ২) মুরারিপণ্ডিত ৩) রঘুনাথ উপাধ্যায় ৪) গদাধর দাস ৫) সুন্দরানন্দ ৬) পণ্ডিত কমলাকান্ত ৭) গৌরীদাস পণ্ডিত ৮) পুরন্দর পণ্ডিত ৯) পরমেশ্বর দাস ১০) ধনঞ্জয় পণ্ডিত ১১) বলরাম দাস ১২) যদুনাথ কবিচন্দ্র ১৩) জগদীশ পণ্ডিত ১৪) পণ্ডিত পুরুষোত্তম ১৫) দ্বিজ কৃষ্ণদাস ১৬) কালিয়া কৃষ্ণদাস ১৭) সদাশিব কবিরাজ ১৮) পুরুষোত্তমদাস ১৯) উদ্ধারণ দত্ত ২০) মহেশ পণ্ডিত ২১) পরমানন্দ উপাধ্যায় ২২) গঙ্গাদাস ২৩) আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ২৪) পরমানন্দ গুপ্ত ২৫) বড়গাছির কৃষ্ণদাস ২৬) কৃষ্ণদাস ২৭) দেবানন্দ ২৮) আচার্যচন্দ্র ২৯) মাধবানন্দ ঘোষ ৩০) শ্রীজীব পণ্ডিত ৩১) শ্রীমনোহর ৩২) নারায়ণ ৩৩) কৃষ্ণদাস ৩৪) দেবানন্দ ৩৫) বৃন্দাবনদাস।

যাই হোক, জয়ানন্দ নিত্যানন্দের ৪১জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন—পৃ. ২২৪-২২৬, বিজয়খণ্ড, শ্লোক ১৯-৫০।

আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে ৭৬জনের নাম উদ্ধৃত করেছেন— চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২২৬-২৪২।

নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ১২ (বারো) জন বিশিষ্ট হয়েছিলেন। এঁরা দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই বারোজন প্রিয় সখা—

১)	গোপাল	—	অভিরাম ঠাকুর	(শ্রীদাম)
২)	গোপাল	—	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	(সুদাম)
৩)	গোপাল	—	কমলাকর পিপ্পলাই	(মহাবল)
৪)	গোপাল	—	গৌরীদাস পণ্ডিত	(সুবল)
৫)	গোপাল	—	পরমেশ্বর দাস	(অর্জুন)
৬)	গোপাল	—	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	(বসুদাম)
৭)	গোপাল	—	মহেশ পণ্ডিত	(মহাবাহ্য)
৮)	গোপাল	—	পুরুষোত্তম পণ্ডিত	(স্তোককৃষ্ণ)
৯)	গোপাল	—	কালাকৃষ্ণ দাস	(লবঙ্গ)
১০)	গোপাল	—	পুরুষোত্তমনাগর	(দাম)
১১)	গোপাল	—	উদ্ধারণ ঠাকুর	(সুবাহু)
১২)	গোপাল	—	শ্রীধর পণ্ডিত	(সুদাম)

এই দ্বাদশ-গোপাল সম্প্রদায় বিভিন্ন গ্রাম-জনপদে শ্রীপাট স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যানন্দের ভজনাদর্শ ও প্রেমতত্ত্বের প্রচার করেন।

এবার আমরা এই দ্বাদশ গোপাল ও তাঁদের শিষ্য শাখা সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করবো। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে জানা যায়—দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একাদশ জন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। কেবল খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য প্রভুর শাখা।

এই পারিষদগণ সকলেই পরমানন্দময়। এঁদের কাজ ছিল সংকীর্তন এবং নিত্যানন্দের তত্ত্বের প্রচার ভিন্ন এঁদের আর কোনো কাজ ছিল না—

কারো কোন কর্ম্ম নাহি সংকীর্ত্তন বিনে।
সভার গোপাল ভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥[৩১]

নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সাজ-সজ্জা করে ভাবাবিষ্ট হতেন এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই—

শিঙা বেত্র বংশী ছাঁদ-দড়িগুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা॥[৩২]

অন্যত্র—

নিত্যানন্দের গুণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র—গোপবেশ, শিরে শিখি পাখা॥[৩৩]

নিত্যানন্দের পরিকরগণ যে সকলে অলঙ্কার ধারণ করেছিলেন এর প্রমাণ চৈতন্যভাগবতে সাক্ষ্য পাই—

পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয় মল্ল নূপুর সু-হার॥[৩৪]

পুরীধামে নিত্যানন্দর এই সকল পারিষদগণকে দেখে মহাপ্রভু বলেছিলেন—

যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥[৩৫]

শ্রীবৃন্দাবনদাস বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণ সকলেই—'নন্দগোষ্ঠী গোপগোপীর অবতার'।

পুরীধাম হতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পতিত উদ্ধারের জন্য সমুদয় পরিকর সঙ্গে গৌড়দেশে আগমন করেন। সর্বাগ্রে শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করে তথায় তিন মাস যাপন করেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ পাঞা নিতাই বিদায় হঞা
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণ ধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে।
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা।
সকল ভকত লৈয়া গৌর প্রেমে মত্ত হৈঞা
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আঁখি
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়।
হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈলা ধনী
পাপতাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে না ভজি নিতাই চাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল।[৩৬]

অভিরাম— ইনি নিত্যানন্দের বিশেষ স্নেহধন্য ও অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। ইনি ব্রজের শ্রীদামসখা। হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৪০০ শকাব্দে। সেখানেই ছিল তাঁর শ্রীপাট। বৈষ্ণব সমাজে অভিরামের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা জয়ানন্দের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

রামদাস অভিরাম সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।।[৩৭]

ঠাকুর অভিরাম বড়ই তেজস্বী ছিলেন। এঁর প্রণাম কেহই সহ্য করতে পারতো না। কথিত আছে ইনি নিত্যানন্দ পত্নী বসুধার সাত পুত্রকে প্রণাম দ্বারা নষ্ট করেন। পরে বীরভদ্র জন্মগ্রহণ করলে (অর্থাৎ অষ্টম গর্ভের পুত্র) এবং অভিরামের প্রণাম সহ্য করলে ইনি তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় মূর্তি বলে স্বীকার করেন। ইনি দুষ্টের দমন করতেন। এক কথায়, তিনি ছিলেন তথাকথিত দুষ্ট দমনে সিদ্ধহস্ত। পাষণ্ডগণ তাঁকে দেখে ভয়ে কম্পমান হত—

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।।[৩৮]

অভিরাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে যেটা একান্তই বলা উচিত সেটা হল— 'জয়মঙ্গল' নামে একখানি চাবুক সর্বদা ইনি হস্তে রাখতেন। যে ভাগ্যবানের উপর তা বর্ষিত হত তার অশেষ দুর্গতি বিনাশ হয়ে প্রেমধন লাভ হত। ইনি বহু নাস্তিক, দুরাচারী ও পাষণ্ড জীবকে উদ্ধার করেছিলেন।

ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল।
তাহা মারি করে লোকে প্রেমার বিহ্বল।।[৩৯]

নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে অভিরামের সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দপ্রভু মাঝে মাঝেই কৃষ্ণনগরে অভিরাম গৃহে যেতেন।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—

সুন্দরানন্দ-নিত্যানন্দের শাখাভৃত্য।
যার সঙ্গে নিত্যানন্দের করে ব্রজনর্ম মর্ম।।[৪০]

ইনি ছিলেন নিত্যানন্দের পার্ষদপ্রধান। মহেশপুরে তাঁর জন্ম। তার আবির্ভাব ১৪০০ শকাব্দের পূর্বে। যশোহর জেলার মহেশপুরে তিনি শ্রীপাট স্থাপন করেন। তিনি রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তা পরে সৈদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছে। মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে তিনি নিত্যানন্দের প্রচারিত সখ্যরসাশ্রিত সাধনধারার প্রচার করেন। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।।[৪১]

ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই তিনি তীর্থানুরাগী। ফলে বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। ইনি একজন মহাপ্রেমিক এবং শ্রীনিত্যানন্দের পরিকরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং নিজগুণে তিনি একটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সেটি হল প্রেমমত্ত অবস্থায় তিনি কুম্ভীর ধরে আনতেন।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানির ভিতরে।
কুম্ভীর ধরিআ আনে সভার গোচরে।।[৪২]

১৪৩৮ শকাব্দে চিঁড়ামহোৎসবে তিনি উপস্থিত থাকায় বোঝা যায় যে, তিনি তখন জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৫০৪ শকাব্দে খেতুরীতে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সেই কারণে মনে হয় সুন্দরানন্দের তিরোভাব ১৪০০ শকাব্দের শেষ দিকে।

কমলাকর পিপ্পলাই— কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিকরীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত।।[৪৩]

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট মাহেশের (হুগলি জেলা) অন্তর্গত মাহেশ নামক স্থানে তিনি শ্রীপাট স্থাপন করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল সুন্দরবনের নিকটবর্তী খান্দুলী বা খালিজুলি নামক গ্রামে। পরে মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা প্রকাশ করেন। পুরাতন মন্দির গঙ্গাগর্ভে। এই গ্রামের দক্ষিণ গায়ে আক্না গ্রাম। আক্না মাহেশ বলে যা পূর্বে খ্যাত ছিল। শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেবী বিরাজ করছেন।

আবার—

কমলাকর পিপলাই ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিল যারে পানিহাটি গ্রাম।।[৪৪]

ইনি ছিলেন নিত্যানন্দের শাখা এবং সহচর।

বৈষ্ণববন্দনায়—

কমলাকর পিপলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী।।[৪৫]

তাঁর জন্মস্থান এবং শ্রীপাট উভয় স্থানেই বহু বৈষ্ণব ভক্ত বসবাস করেন। ১৪৮৪ শকাব্দে তাঁর তিরোভাব হয়।

গৌরীদাস পণ্ডিত—

গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেমাদিতে নিতে, ধরে মহাশক্তি।।[৪৬]

নবদ্বীপের নিকট শালিগ্রামে গৌরীদাসের আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। অম্বিকা-কালনায় (বর্ধমান জেলা) তাঁর শ্রীপাট স্থাপন করেন। তিনি নিমবৃক্ষের তৈরি গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—

মহাশক্তিধর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত।
যাঁর দেহে নিত্যানন্দ হৈলা বিদিত।।[৪৭]

অন্যত্র—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত নহে সাধারণ।
ব্রজে যেই কৃষ্ণ-প্রিয় সখাতে গণন।।
মোর প্রভু কহে যারে সুবল গোপাল।
রাধা কৃষ্ণের গূঢ়লীলা জানয়ে সকল।।[৪৮]

কথিত আছে, একদা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত গৃহ হতে

নবদ্বীপে যাওয়ার সময় হরিনদী গ্রামে এসে নৌকায় ওঠেন। মহাপ্রভু নিজেই বৈঠা বেয়ে গঙ্গা পার হন। ঐ সময়ে প্রভু নবদ্বীপ না গিয়ে সেই বৈঠা হাতে নিয়ে অম্বিকায় গৌরীদাসের আলয়ে উপস্থিত হন এবং আবেশ ভাবে গৌরীদাসকে বললেন—

এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়।
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।।[৪৯]

মহাপ্রভু আর একটি অমূল্য জিনিস গৌরীদাসকে দিলেন এবং সেটি হল, মহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত একখানি গীতা গ্রন্থ। প্রভু প্রদত্ত সেই গীতা ও বৈঠা আজও বিদ্যমান। কবি ঘনশ্যাম যথার্থই বলেছেন—

প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি।।[৫০]

তিনি ১৪৩৮ শকাব্দে দণ্ড মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবনের ধীর সমীর কুঞ্জে গৌরীদাস পণ্ডিত শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানেই তাঁর সমাধি হয়। (১৪৮৯ শকাব্দে)[৫১]।

পরমেশ্বর দাস— কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁর যে করে স্মরণ।।[৫২]

পরমেশ্বর দাসের আবির্ভাব ১৪০০ শকাব্দের প্রথম দিকে।—

ইনিই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অর্জুন সখা। জাহ্নবা মাতা আয়োজিত খেতুরি মহোৎসব গমনকালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন—

ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরদাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস।।[৫৩]

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, খেতুরী পরিত্যাগ সময়ে রাজা সন্তোষ রায় জাহ্নবাদেবীকে উপঢৌকনস্বরূপ যে যে দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছিলেন তা পরমেশ্বর দাসের হস্তেই অর্পণ করেন—

শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে সমর্পিলা তাহা।।[৫৪]

ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া আঁটপুরে জাহ্নবা মাতার আদেশে শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে।।[৫৫]

এই বর্ণনায় আমাদের সমক্ষে একটা বিষয় পরিস্ফুট হয় পরমেশ্বর দাস ছিলেন পারমার্থিকশক্তিমান ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি অতি ধৈর্যশীল ছিলেন। কারণ আচার-ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাষণ্ডীদের

গালমন্দ করেননি। অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমাগুণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিপক্ষদের সামনে উপস্থিত বিরোধী পাষণ্ডীদের স্বপক্ষে আনয়ন করেছিলেন। আর বৈষ্ণব সমাজের পথিকৃতরা ক্ষমার মাধ্যমেই জনজাগরণের স্বার্থরক্ষার কথা প্রচার করেছিলেন। পরমেশ্বর দাস ছিলেন তাঁর যথার্থ বাহক ও ধারক। বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা'র—এই আদর্শ ব্যক্তিজীবনে সফল করে তুলেছিলেন। আঁটপুর শ্রীপাটে তাঁর শিষ্য ও বহু উপশিষ্য বর্তমান। ১৫০৪ শকাব্দে তাঁর তিরোভাব হয়।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণ প্রেমময়।।[৫৬]

১৪০৬ শকাব্দের চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে চট্টগ্রামের জাড় গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সংসার ত্যাগ করে তিনি বর্ধমানের শীতল গ্রামে বাস করেন। এই স্থানেই তিনি গোপীনাথ ও গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে ধনীর পুত্র সর্বস্ব দান করে, ভিক্ষাপাত্র মাত্র সম্বল করে ঈশ্বর ভজনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়—

বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্বস্ব প্রভুর দিয়ে ভাণ্ড হাতে নেয়।।[৫৭]

তাঁর এই ত্যাগ-তিতিক্ষা বৈষ্ণব সমাজের আদর্শস্বরূপ। পরবর্তীকালে বহু বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর এই আদর্শকে শিরোধার্য করেছেন। ১৪০০ শকাব্দের শেষের দিকে তিনি দেহত্যাগ করেন।—

মহেশ পণ্ডিত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

মহেশপণ্ডিত-ব্রজের-উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।।[৫৮]

১৪০০ শকাব্দে ইনি মসিপুর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। তখন তাঁর শ্রীপাট সেখান থেকে প্রথমে বেলেডাঙ্গা ও পরে পালপাড়ায় স্থানান্তরিত করেন। ইনিও নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচার করেন। ১৫০৪ শকাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত— ব্রজের স্তোক-কৃষ্ণ। নবদ্বীপে জন্ম। বৃন্দাবনদাস তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম।।
পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি।।[৫৯]

কালাকৃষ্ণদাস— ১৪০০ শকাব্দের প্রথম দিকে ইনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ভক্তমালে আছে—'লবঙ্গ নামেতে সখা কালাকৃষ্ণদাস'।

বর্ধমানের অন্তর্গত দাঁইহাটের এক মাইল পূর্ব দিকে আকাইহাট গ্রামে কালাকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট। কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গীরূপে বিখ্যাত। বৃন্দাবনদাস তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

'প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।'[৬০]

১৫০৪ শকাব্দের চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীতে তাঁর তিরোভাব হয়।

পুরুষোত্তমনাগর— ব্রজের দাম সখা। তিনি নাগর পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী। সুখসাগর হতে বোধখানা বা বর্তমানে চান্দুর গ্রামে ছিল তার শ্রীপাট। সুখসাগর গ্রামটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে বলেছেন—

বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাহার হৃদয়ে বিহরে।।[৬১]

উল্লেখ্য, ১৪০০ শকাব্দের প্রথমে তাঁর আবির্ভাব। ১৫০৪ শকাব্দে পৌষ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে তাঁর তিরোভাব হয়।

উদ্ধারণ দত্ত— সুবর্ণবণিক কুলোজ্জ্বলকারী। তাঁব শ্রীপাট সপ্তগ্রামে। তাঁর পূর্বনাম দিবাকর দত্ত। নিত্যানন্দ ১৪৩৮ শকে সপ্তগ্রামে যান। সেখানে মহাধনী সুবর্ণবণিক কুলের দিবাকর দত্তকে দীক্ষা দেন। তারপর তাঁর নাম রাখেন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। ইনি নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন। ইনি সপ্তগ্রামের ধনী সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে কাঙাল বেশে নিত্যানন্দের সেবক হন। তাই বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

কায়ামনোবাক্য নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁর।।
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর।।[৬২]

১৪২৯ শকাব্দে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেইকালে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলে অকাতরে দরিদ্রজনকে অন্ন বিতরণ করেছিলেন। সহস্র দীন দরিদ্রকে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিতাই চরণে সমর্পণ করে তাদের পরম বৈষ্ণব করেছিলেন। সরস্বতী তীরে 'ভদ্রবন' নামে একটি জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থান পরিষ্কার করিয়ে দরিদ্রের বাসভবন করে দিয়েছিলেন তিনি। ঐ ভদ্রবনকে 'ভেদোবন' বলা হয়।

পানিহাটী লীলার পরে নিত্যানন্দ প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গৌরাঙ্গ নামের ধ্বজা উড়িয়ে পতিত উদ্ধার, পাযণ্ড দলন করতে বের হলেন। নিত্যানন্দ নানা স্থানে প্রেম বিতরণ শেষে সপ্তগ্রামে তাঁর প্রিয় ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দেব-মন্দিরে এসেছিলেন।

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লয়ে ভক্তগণে।।
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাহা ত্রিবেণীর তীরে।।[৬৩]

বহু ঘটনাবহুল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভের এই ঘটনা। তখন সপ্তগ্রাম মহা ঐশ্বর্যময় জনকোলাহলপূর্ণ নগর। তৎসহ অবশ্যই বাণিজ্যপূর্ণ ও ধনীদের দেশ। অসংখ্য সুবর্ণ-বণিক তখন ঐ স্থানে বসবাস করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রামে বসবাসকারী ম্লেচ্ছ যবনকে কোলে স্থান দিয়ে নবজীবন দান করেছিলেন। কিন্তু রাজা বল্লালসেন সমস্ত ঘটনাটি ভালো চোখে দেখেননি। তিনি হিংসাবশে সপ্তগ্রাম থেকে সুবর্ণবণিকগণকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং সর্বসাধারণের নিকট বণিক সকলকে অপাঙক্তেয় পতিত ও হেয় করবার জন্য বিশেষভাবে রাজ আজ্ঞা প্রচার করেছিলেন। রাজ আজ্ঞা বলে ব্রাহ্মণগণ ঐ আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেলে রাজা বল্লালের অত্যাচারের কাহিনী লুপ্ত হল বটে[৬৪], কিন্তু সমাজ সাধারণ সুবর্ণবণিকগণকে আর পূর্ব সম্মান ফিরিয়ে দেয়নি বরং আরো হীনভাবে দেখে এসেছে।

কিন্তু ব্যথাহারী নিতাই সুন্দর—

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার।।[৬৫]

তাই স্বর্ণবণিক সম্প্রদায় এখনও স্ফীতবক্ষে গর্বভরে বলে থাকেন—

মোদের কুলের দেবা শ্রীনিত্যানন্দ।
মোরা গরব করে বলতে পারি।।[৬৬]

নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্তকে বলেছিলেন স্কন্দপুরাণ পাঠ করেছো—উদ্ধারণ দত্ত বললেন না প্রভু। তখন তিনি বললেন 'স্কন্দপুরাণে' আছে—

হরিনামাক্ষরং ভুক্ত ভালে গোপীমৃদাঙ্কিতম।
তুলসীতিলকোরস্কং ন স্পৃশের্যুমোদভটাঃ।।

নিত্যানন্দের এই ইঙ্গিতবাক্যে সেইদিন থেকে যাবতীয় সুবর্ণবণিকগণ মালা-তিলক ধারণ করতে লাগলেন। উদ্ধারণ দত্ত স্বজাতিবর্গের সঙ্গে মালা-তিলক ধারণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণবণিকগণের এইসব পবিত্র আচরণে হরিনামে গাঢ় অনুরাগ দেখে তৃপ্ত হন—

সপ্তগ্রামের সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে।।

বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে সেবিলেন লইয়া শরণ।।
বণিক-সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে।।[৬৭]

নিত্যানন্দ প্রভুর বণিকগণের প্রতি এইরূপ অশেষ করুণা দেখে গোলকনাথ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের স্তুতি করেন—

নীচ জাতি পতিত অধম যতজন।
তোমা হৈতে হৈল এবে সবার মোচন।।
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে।।[৬৮]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি মথুরা গিয়েছিলেন। উদ্ধারণের নাম অনুসারে নৈহাটির একটি গ্রামের নামকরণ হয়েছে উদ্ধারণপুর। সেই গ্রামে তিনি নিতাই-গৌরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তগ্রামেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিগ্রহ আছে।

নিত্যানন্দের বিবাহে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উদ্ধারণ। যখন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ।।[৬৯]

তখন—

প্রভু কহে, কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি।।
এইমত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল সংশয়।।[৭০]

অন্যত্র—

কভু উদ্ধারণ রাঁধে নিত্যানন্দ খায়।
কভু নিত্যানন্দ রাঁধে উদ্ধারণ খায়।।[৭১]

আমাদের ভক্তসমাজ সন্দেহ প্রকাশ করলেও কিন্তু নিত্যানন্দের এই বক্তব্য এবং আচরণ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তিনি ছিলেন সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে। উদার মনোভাব সম্পন্ন এবং মানবতা প্রতিষ্ঠাকামী এই মহৎ পুরুষ আসলে তাঁর কর্ম ও আচরণের মধ্যে দিয়ে চেতন ও অবচেতনে সকল সময়েই মানবতার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শুধুমাত্র মৌখিক বা বাইরের আচরণে নয়, আসলে অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন সর্ব সংস্কার মুক্ত।

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী ভ্রমণ সময়ে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে গমন

করে ভক্ত উদ্ধারণের জন্য বিলাপ করেছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত যাট বছর (১৪০৩-১৪৬৩ শকাব্দ) জীবিত ছিলেন।

শ্রীধর পণ্ডিত— ব্রজের মধুমঙ্গল বা কুসুমাসব সখা। ইনি সর্বসাধারণের কাছে 'খোলাবেচা শ্রীধর' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে মালঞ্চপাড়ায় ছিল তাঁর শ্রীপাট। জাতিতে ব্রাহ্মণ, কারও মতে গ্রহবিপ্র। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ আছে—

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।।[৭২]

নবদ্বীপবাসী শ্রীধর থোড়, মোচা, কলার পাতা ও খোলা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। শ্রীধর মহাসত্যবাদী ছিলেন। যে দ্রব্যের যে দাম, তা এক কথায় বিক্রি করতেন। গৌরসুন্দরের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি নিত্যানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন বৈষ্ণব সমাজের আদর্শস্বরূপ। সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যেই যে প্রকৃত শান্তি লুকিয়ে থাকে এবং শান্তির মধ্যেই নিহিত থাকে সুখের ছোট্ট বীজ এবং পারিপার্শ্বিক সহায়তায় তাই কালক্রমে সুখবৃক্ষ হয়ে ওঠে। এই আপাতনিরীহ নীতিবোধের স্রষ্টা হিসাবে এবং নিত্যানন্দের বিশেষ অনুগামী হিসাবেও শ্রীধর পণ্ডিতের নাম বৈষ্ণব ইতিহাসে স্মরণীয়। দণ্ড মহোৎসব বা খেতুরী উৎসবে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। আশ্চর্য হওয়ার কথা বই কি।

নিত্যানন্দের এই প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মতো অন্যান্য শিষ্যগণও বিভিন্ন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবাদর্শের প্রচার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দ্বাদশ গোপাল সম্প্রদায় বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে শ্রীপাট স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যানন্দের প্রেমতত্ত্বের প্রচার করেন। কাটোয়াতে নিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রভাবশালী বৈষ্ণব গদাধর দাসের শ্রীপাট ছিল। সপ্তগ্রাম বন্দরের কর সংগ্রাহক মজুমদার, হিরণ্য, গোবর্ধন, গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। বন্দর সপ্তগ্রামে জাতিবিচার বোধহয় প্রবল ছিল না। রঘুনাথ দাস সন্ন্যাস অবলম্বনের পূর্বেই নিত্যানন্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নিত্যানন্দের পানিহাটীতে চিঁড়ামহোৎসব রঘুনাথের অর্থে নিষ্পন্ন হয়। নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের অবহেলিত বণিকদের কোল দিয়েছিলেন। তারপর থেকে হুগলী জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ফলপ্রসূ হতে থাকে। দ্বাদশ গোপালের মধ্যে চারজন গোপাল হুগলী জেলায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। বল্লভপুর এবং গৌরাঙ্গপুর গ্রামে থাকতেন উপগোপাল কাশীশ্বর এবং গোপাল ঠাকুর। নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায় সর্বপ্রথম নিতাই-গৌর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত ভক্ত সম্প্রদায় নিত্যানন্দের প্রচারিত প্রেমভক্তির আদর্শকে শিরোধার্য করেই তাঁদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্বভক্তবৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ॥[৭৩]

নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে যেমন বলরাম দাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, বাসু ঘোষ, জ্ঞানদাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের পদও রচনা করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে মাধব ঘোষের নাম উল্লেখ এবং প্রশংসাও করেছেন। মাধব ঘোষ ও তাঁর ভ্রাতাগণ নিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন। অগ্রদ্বীপে তাঁদের সকলের জন্ম এবং শ্রীপাট। সর্বজন প্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ তাঁরই ভাই। তিন ভাই-ই ছিলেন সু-গায়ক ও পদকর্তা। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে মাধব ঘোষ শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তমোলোকে মাধব ঘোষের দেবালয়।
হরিবিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥[৭৪]

নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেম প্রচারের সময়ে মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভ্রাতাই নিত্যানন্দের সহচর ছিলেন। মাধব ঘোষ বৃন্দাবনের গায়ক বলে সর্বজনপ্রসিদ্ধ ছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে মাধব ঘোষের নাম উল্লেখ করেছেন—

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥
মাধব-গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।[৭৫]

আবার—

বন্দিব মাধব প্রভুর প্রীতি স্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভাঙ্গ স্বরদান॥[৭৬]

নিত্যানন্দের গৌড়দেশে ভ্রমণের সময়ে মাধব ঘোষ সঙ্গে ছিলেন। সেই সময়ে আড়িয়াদহে দাস গদাধরের ভবনে দানখণ্ড কীর্তন করে তিনি সকলকে বিমোহিত করেছিলেন। সেই কীর্তনের সময়ের নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্তি বক্ষে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনিয়া অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি॥[৭৭]

অন্যত্র—

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যার গানে।।[৭৮]

গণদেবতা নিত্যানন্দ নিজেও নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। গুরু-শিষ্যের সম্মিলিত নৃত্য এবং কীর্তনের আসরে এমন প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হত, যা উপস্থিত শ্রোতাদের অন্তরের খিড়কিতে বিরাট ধাক্কা দিত। মানবিকতার আলোতে সেই মুহূর্তে তারা অন্তরের মধ্যে সিংহদুয়ারের উপস্থিতিও অনুভব করতে পারত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীগণ উড়িষ্যায় চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পূজার প্রচার করেন। ফলে কালক্রমে উড়িষ্যাতে চৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব ভারতের পর উত্তর ভারতেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময় নিত্যানন্দের সঙ্গে গুরু নানকের কাশীধামে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর পাঞ্জাবের (পঞ্জাবের) গুরু নানক যখন বঙ্গ দেশে পরিভ্রমণ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে এ দেশে এক নতুন প্লাবন দেখা দিয়েছিল। বস্তুত কী ধর্মে, কী শিক্ষায় বঙ্গদেশে তখন এক স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়েছিল। বড় বড় কবি, স্মার্ত আর দার্শনিকদের ঔজ্জ্বল্যে দেশের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সারা ভারতের মানবকল্যাণের পীঠস্থানও হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নানক একজন তালবণ্ডী নগরবাসী মৌলবীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। একটু লক্ষ করলে বোঝা যায় সেই মৌলবীর প্রবর্তিত ধর্মমতে ছিল শ্রীচৈতন্যের প্রভাব। জাতিভেদ উচ্ছেদের যে উদারমত চৈতন্য প্রবর্তন করেছিলেন তা সুস্পষ্টভাবেই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। অন্যভাবে এও বলা যায়, ঐ সময় চৈতন্যের প্রভাব বহির্ভূত কোনোও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করাও ছিল অতিশয় দুঃসাধ্য,—অন্যদিকে গুরু নানকও তাঁর স্বীয়ধর্ম প্রচার করবার প্রারম্ভকালেই বঙ্গদেশে গমন করেছিলেন।

'গৌরাঙ্গলীলা' 'শ্রীবৃন্দাবন রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও 'সাবিত্রী' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক স্বর্গীয় ডাক্তার রামযাদব বাগচী মহাশয় একখানি পত্রে লিখেছিলেন— শ্রীপাদ শ্রীমন্নিত্যনন্দ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তা লিখছি, গুরুনানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, এ বিষয় শ্রীগুরুনানক লিখিত তাঁর স্বীয় জীবনীতেও আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, শ্রীকৃষ্ণদাস এবং গুরুনানক সমসাময়িক, গ্রন্থসাহেবের শেষখণ্ডে নামমাহাত্ম্য প্রস্তাবে শ্রীনানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নাম অনেক করেছেন এবং "আমার নামশিক্ষার গুরু শ্রীপাদ নিতাই" এই বার বার ইঙ্গিত করেছেন। আমি গ্রন্থসাহেব থেকে সেই Textটি দেবার চেষ্টা করব। (বরহনপুর নিবাসী প্রেমদাস নামক জনৈক কবীরপন্থী সাধু ও সুপণ্ডিত বাগচী মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করেছেন। বৃন্দাবন রহস্য-রামদাস ও সনাতন। শ্রীরাম যাদব বাগচী এম. ভি প্রণীত।) যে গুরু নানক শ্রীমন্নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। নানকের সময় পাঞ্জাবে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশলাভ করে।

সনাতন শিষ্য পাঞ্জাবী রামদাস কর্পূর বৃন্দাবনের মদনগোপালের অনুরূপ একটি মন্দির ও বিগ্রহ মূলতানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই প্রভাবে অনেক পাঞ্জাবী চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হন।[৭৯]

উনিশ শতকেই ভাগবতের ভাষানুবাদক খড়দহের দীনবন্ধু দাস সাক্ষীগোপাল মাহাত্ম্য-প্রণেতা দীনচৈতন্যপুরী জেপুরকোরাপুট এবং বোডোমেমাদির রাজপরিবার নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান শতকে পুরীর রাধারমণদাস, রামদাস বাবাজী, পণ্ডিত রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং ভক্তিগীতিকার মোহন গোস্বামী এঁরা সকলেই নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত[৭৯ক]।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য উভয়েই প্রভু আখ্যা লাভ করেছিলেন। এর অন্যতম কারণ মহাপ্রভুর এই দুই শ্রেষ্ঠ পরিকরের এবং তাঁদের শিষ্যদের দ্বারাই বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এঁদের ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই গ্রামে গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন এবং শ্রীবিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সহজেই মানবগণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিত এরূপ বহু শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। তিনি যে সকল স্থানে পাষণ্ড দস্যুদের আবাস বলে শুনতেন, সেই স্থানে গিয়ে তাদের হরিনাম দিয়ে সাধু করে তুলতেন। বর্ধমান জেলার শীতল গ্রামে পূর্বে দুষ্টলোক বাস করতো। তারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। তিনি সেই দুর্বৃত্তগণকে দীক্ষা দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন[৮০]।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়েছিল ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোধানের বহু পরবর্তীকালে। সেখানে আমরা সমসাময়িক সমাজজীবনের কিছু ছবি পাই। গ্রন্থটিতে—প্রতি গ্রামে দেবালয় এবং প্রত্যেক দেবালয়ে সংকীর্তনের উল্লেখ আছে—'সংকীর্ত্তন দেবালয় হইল সব রাজ্য'[৮১]।

এইভাবে নিত্যানন্দের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট ধারাটি অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কাল ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। আনুমানিক ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধান। এর পর অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বৈষ্ণব সমাজে যাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁরা নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা, পুত্র বীরচন্দ্র, জাহ্নবার পালিত পুত্র রামাই, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের বিশেষ সহায়তার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দ-প্রচারিত তত্ত্বের প্রসার ঘটে।

বাংলার বৈষ্ণব সমাজে এই যুগটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপকরণ খুবই কম।

'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এই সময়ের বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, অভিরাম ঠাকুরের প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তৎপর হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবীর মনীষা ও বাগ্মিতার প্রভাব বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তাঁর পুত্র বীরভদ্রের উপরে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজের ভার বহুলাংশে অর্পিত হয়েছিল।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বীরভদ্রের খ্যাতি বিশেষরূপে বিস্তৃত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে বীরভদ্রের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্মাতীত হঞা বেদধর্মে রত।।
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ।।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।।
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।।[৮২]

পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যোগপদ্ধতি, তন্ত্রাচার প্রভৃতি প্রবিষ্ট হয়। সহজিয়া ধারার উদ্ভব হয়, বৈষ্ণব ধর্ম এবং সমাজে কলুষ প্রবেশ করতে থাকে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে দেহতত্ত্বাদির মিশ্রণে অনেকগুলি শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সময়ই বৈষ্ণব ধর্মের পতনের যুগ। বৈষ্ণব সমাজ ব্যভিচারদুষ্ট হয়ে কণ্টকময় হয়ে ওঠে। এই সময়ে বীরভদ্র সমাজের পতিত মানুষদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে 'ভেক প্রথা'র সাহায্যে তাদের বিবাহের সুযোগ দান করেন[৮৩]।

নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা ঃ— নিত্যানন্দ-উত্তরকালেও তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী ছিলেন বৈষ্ণব সমাজে প্রথম আচার্যা। জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দের প্রয়াণের পর চৈতন্য আদর্শ তত্ত্বকে বৈষ্ণব সমাজের আচার্য হিসাবে যথাসাধ্য ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গতি নানা কারণে মন্দীভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মজা নদীতে বান ডাকল জাহ্নবা ও বীরভদ্রের প্রচেষ্টায়। এই বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল খড়দহে। নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র

ও কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবীর ধর্মকেন্দ্র ও নিবাসভূমি শ্রীপাট খড়দহে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে জাহ্নবাদেবী হন বৈষ্ণব সমাজে প্রথম ঈশ্বরী ও পুত্র বীরভদ্র হন অবতার স্বরূপ। জাহ্নবাদেবী ও পুত্র বীরভদ্রের নেতৃত্বে বৈষ্ণব সমাজে খড়দহ কেন্দ্রের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য নিত্যানন্দের মতো তাঁর আচার-আচরণেও বিলাসিতা প্রবেশ করেছিল। জাহ্নবার স্নানের সময় 'সূক্ষ্ম বসনেতে' অঙ্গ মোছার বিবরণ পাওয়া যায় (নরোত্তম বিলাস)। জাহ্নবা ও বসুধাপুত্র বীরভদ্র ধনী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের অনেক ধনী শিষ্য ছিল। সেজন্য তাঁরা ধনীর মতো থাকতেন[৮৪]।

জাহ্নবাদেবী কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু বঙ্গ ও বহির্বঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কয়েকটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাহ্নবা তিনবার বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন অনুমান করা হয়। প্রেমবিলাস-এর ষোড়শ বিলাস অনুযায়ী জাহ্নবা প্রথমবার বৃন্দাবনে উপস্থিত হবার পর রূপগোস্বামী তাঁকে সনাতন, লোকনাথ, গোপালভট্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন[৮৫]। নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ। গৌরধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে নিত্যানন্দ ছিলেন এক প্রবাদপুরুষ। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ কেহ তো না পাইল হরিনাম।
এই নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে কৃপা করি লওয়াইবে নাম।।
কৃত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর কেহো যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয় মুখে যেন হরিনাম লয়।।
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেমদান করি বালক পুরুষ নারী খণ্ডাইল সবাকার দুঃখ।।
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইল গৌড় দেশে পূর্ণ কর সবাকার আশ।[৮৬]

নিত্যানন্দ তাঁর এই বাক্য পালন করার চেষ্টা করেন এবং সফলতাও অর্জন করেন। নারীর অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাহ্নবাদেবী নিজ জীবনাচরণে নিত্যানন্দের আরব্ধ কাজের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। পাপী-দুরাচার-পাষণ্ডী সকলকেই নিত্যানন্দ তাঁর স্নেহের আঁচলে বেঁধে কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মহত্ত্ব প্রমাণ হয়। ব্রাহ্মণ্যসমাজ ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার সঙ্কুচিত করেছিলেন। বৈদিক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও তারা ছিল অনধিকারী। ষোড়শ শতাব্দীতে নিত্যানন্দ স্ত্রীজাতির ধর্মাচরণের সামাজিক অধিকার স্বীকার করে নারীজাতিকে মান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা হলেন—১) নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী ২) অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী ৩) শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী এবং অন্যান্যরা। এঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের ধারাকে দু'কূল প্লাবিত নদীর মতো বহন করে নিয়ে গেলেন। এঁরা প্রত্যেকেই গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজে প্রাতঃস্মরণীয়া ও বহুমান্যা। জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণব ভাবান্দোলনে নেতৃত্ব দান করে নারীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন।

শ্রীমতী জাহ্নবা বন্ধ্যা ছিলেন[৮৭]। বসুধাপুত্র বীরভদ্র চিরকালই জাহ্নবার অনুগত ছিলেন এবং জাহ্নবাদেবীকে নিজ মাতৃজ্ঞান করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়[৮৮] যে, বীরভদ্র প্রথমে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর কাছে যাত্রা করেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য জানতেন বৈষ্ণব সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করার মতো বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান জাহ্নবারই আছে এবং দীক্ষা দেওয়ার অধিকারও আছে। তাই তিনি বীরভদ্রকে জাহ্নবার কাছেই দীক্ষা নিতে পরামর্শ দেন এবং বীরভদ্র জাহ্নবার নিকট থেকে দীক্ষা নেন।

'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন[৮৯]। তিনি চৈতন্য পার্ষদ কবি বংশীবদন চট্টোর পুত্র চৈতন্যদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন ও মন্ত্রদীক্ষা দেন। প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা' ও রাজবল্লভের 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থদ্বয়েও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জাহ্নবা রামচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে নিয়ে খড়দহে যাত্রা করেন। রামাইকে তিনি বিভিন্ন বৈষ্ণব পাটে নিয়ে গিয়ে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজপুত্ররূপে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথমে তিনি যান শান্তিপুর। সেখান থেকে একে একে যশোড়াপাট, সুখসাগর, কাঁচড়াপাড়া হয়ে তিনি উত্তীর্ণ হলেন শ্রীপাট খড়দহে—

> শান্তিপুর ছাড়ি আইল্যা যশোড়া পাটেতে।
> তথা হৈতে আইল্যা সবে সুখ সাগরেতে।।
> তথা হৈতে শ্রীকাচড়াপাড়াতে আইল্যা।
> তথা হৈতে খড়দহ পাটেতে উত্তরিলা।।[৯০]

রামচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষা পূর্ণ হলে জাহ্নবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য এবং দেশ-বিদেশে নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য রামচন্দ্রকে আদেশ করেন এবং বীরভদ্রকে তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে বলেন—

> যাও বাপু, মিলিবারে মহান্ত মণ্ডল।
> বীরচন্দ্রে ডাকি আন দিউক সম্বল।।[৯১]

জাহ্নবা হয়তো বুঝেছিলেন একা বীরভদ্রের পক্ষে বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে এতবড় প্রচারকার্য চালানো কঠিন। তাই তিনি রামচন্দ্রকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকার্যে প্রেরণ করেন। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে জাহ্নবার এই বাস্তব চিন্তা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সাফল্য কায়েম করার জন্য তাঁর এই নীতি প্রণয়ন ও সদিচ্ছা তাঁকে বৈষ্ণব সমাজে কিংবদন্তী করে তুলেছিল। দেশভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার আদান প্রদানের মতো প্রেমধর্ম প্রচারের গুরুত্বও অপরিসীম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে প্রেমধর্ম প্রচার একটা বিশেষ অঙ্গ। জাহ্নবা এই

সমাজেরই প্রথম মহিলা মহান্ত হয়ে দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে যেমন নূতন বৈষ্ণব পাট স্থাপন করেন, তেমনি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের টানে গৃহস্থ বিত্তবান ব্যক্তিরাও সমস্ত ধন-সম্পত্তির আকর্ষণ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়ে জাহ্নবার পথ অনুসরণ করে পথে বেরিয়ে পড়েন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যরা তাঁদের ধর্মমতকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কয়েকটি সম্মেলন উৎসব করতে উদ্যোগী হন। জনতার সঙ্গে একাত্মতা লাভেরও কেন্দ্রভূমি ছিল এই উৎসবের স্থানগুলি। জাহ্নবা খেতুরী মহোৎসবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর দ্বারাই খেতুরী উৎসব নিষ্পন্ন হয়। খেতুরী উৎসব ধনী, দরিদ্র জাতি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এক মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে গৌড়বঙ্গ উৎকলের আচার্য ও ভক্তদের সমাগম হয়েছিল। বৈষ্ণব মতাদর্শ পুনরায় সংস্থাপন, পরস্পর ভাব বিনিময় দ্বারা সংঘশক্তি বৃদ্ধি, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ প্রভাবিত বর্ণাশ্রম সমাজের বিরোধিতা হ্রাস করতে এই সম্মেলন বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয়। এতবড় সম্মেলনে জাহ্নবাদেবীর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। জাহ্নবাদেবী প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী বুদ্ধিমতী এবং দৃঢ়চরিত্রের নেত্রী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এত বড় উৎসবের প্রধান স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল এবং তিনি সমস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে কায়স্থ নরোত্তম দাসকে সর্বসমক্ষে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এ বড় কম কথা নয়। জাহ্নবা যখন শ্রীনিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হলেন, সেই হতে জাহ্নবা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। গৌড় দেশের মধ্যে খেতুরী, বুধরী, কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনগড়িয়া, নবদ্বীপ, অম্বিকা, শান্তিপুর, খড়দহ, লতাগ্রাম এইগুলি তাঁহার প্রধান গন্তব্যস্থান ছিল। ইনি তীর্থ ভ্রমণকালে বর্ধমান জেলার লতাগ্রাম স্থাপন করেন। ঐ স্থান লতাবেষ্টিত ছিল। সেখানে কিছুদিন থেকে ঐ গ্রামের লোকদের শিষ্য করেন। ঐ গ্রাম লতাবেষ্টিত ছিল বলে তথাকার বৈষ্ণবগণ 'লতা বৈষ্ণব' নামে বিখ্যাত[৯২]।

এইভাবে জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দের প্রচারিত তত্ত্বের প্রভাব বিস্তার করেন এবং সকল স্থানেই গৌড়মণ্ডলের অসংখ্য বৈষ্ণব এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন।

রামচন্দ্র বা রামভদ্র —

যৈছে বীরভদ্র তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই।।[৯৩]

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও পদকর্তা বংশীবদন চট্টোর জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামভদ্রকে জাহ্নবাদেবী পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বীরচন্দ্রের ন্যায় তিনি রামাই পণ্ডিতকে নিজ পুত্ররূপে দেখতেন। রামাই কৈশোরে জাহ্নবার প্রশিক্ষণে পরিপুষ্ট হয়ে খড়দহে কিছুদিন বসবাস করেন। পরে নিত্যানন্দের প্রচারিত প্রেমধর্ম জগতে প্রচার করেন। রামাই গৌড়দেশে এবং উৎকলের যাত্রাপথে বহু পতিত অধম জীবকে প্রেমধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবনে যান, সেখানে

জাহ্নবাদেবীর অন্তর্ধান হলে প্রস্কন্দন তীর্থে রামাই স্নান করার সময় কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহ পান। জাহ্নবার স্বপ্নাদেশে সেই বিগ্রহ বাঘ্‌নাপাড়ায় স্থাপন করেন।

'বনেতে আসিয়া প্রভু চিন্তা মনে মনে।
কিরূপে প্রভুর আজ্ঞা করিব পালনে।
কিসে কৃষ্ণ সেবা হব কাঁহা পাব ধন।
কেমনে বা গৃহে গৃহে করিব ভ্রমণ।।
বীরচন্দ্র প্রভু কাছে যাই কোন মুখে,
শ্রীমতি বিয়োগ হৃদি বিদরিছে দুখে।।
এত চিন্তি রহে সে কাননে পড়িয়া।
সঙ্গী দুই নিবারিতে নারে প্রবোধিয়া।।
কৃষ্ণবলরাম বসাইয়া বৃক্ষমূলে।
তিনজন বসিলেন জপেন বিরলে।।[৯৪]

ইনিই বাঘনাপাড়া শ্রীপাট সংস্থাপক—

লতাতে বেষ্টিত বন অত্যন্ত গভীর,
তাহার ভিতরে রহে এক ব্যাঘ্রবীর।
তার ভয়ে পারে না কেহ বনে প্রবেশিতে।
গো মনুষ্য খাইল কত না পারি বর্ণিতে।।
মনুষ্যের গন্ধ পেয়ে ব্যাঘ্র শীঘ্রগতি,
আসিয়া দেখিল সেই মোহন মুরতি।[৯৫]

এই স্থান ছিল ঘন অরণ্য। হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ। সেখানে রামাই পণ্ডিত বহু মানুষকে দীক্ষা দিয়ে এবং সেবা পাট স্থাপন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। শ্রদ্ধেয় কাননবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের 'বাঘ্‌নাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য' নামক গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা থেকে জানা যায়, রামাই এই বাঘনাপাড়ায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে নবদ্বীপ থেকে এনে বিগ্রহ সেবার দায়িত্ব দেন। তারপর নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম তত্ত্বের প্রচার করেন—

শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পণ।
তিনগ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্য নন্দন।।
কড়চানঙ্গমঞ্জরী সম্পূটিকা নাম।
পাযণ্ড-দলন আর অতি অনুপাম।।[৯৬]

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র— বাংলার বৈষ্ণব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে বসুধাপুত্র বীরচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তবে তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু কিংবদন্তী

গালগল্প গড়ে উঠেছিল। অপাংক্তেয় জনসমাজকে, বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়কে 'নেড়ানেড়ি' নাম দিয়ে বৈষ্ণব সমাজে গ্রহণ করে তৎকালীন বিচারে বীরভদ্র সমাজবিপ্লবও সাধন করেছিলেন। নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রও দারিদ্র্য অবলম্বন করেননি। 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার' অনুসারে বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অসহায় ও ক্ষুধার্ত ছিলেন ('নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার', প্রকাশক কিশোরীদাস বাবাজী)। বীরচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সুযোগ্য ভিত্তি স্থাপনে। সেই প্রেমধর্ম আপামর জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিল। বীরচন্দ্র অগণিত ভক্তসহ সংকীর্তন সমাবেশ সহকারে নিত্যানন্দের প্রেমধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। গৌড়ের নবাবের কাছ থেকে প্রস্তরখণ্ড আনয়ন করে খড়দহে শ্যামসুন্দর, মাহেশে শ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবনায় (বারাসাত) নন্দদুলাল প্রতিষ্ঠা তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকতা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার নিদর্শন। সমাজে তথাকথিত উপেক্ষিত, নিপীড়িত এবং দিক্‌ভ্রষ্টদের কাছে তিনি ছিলেন এক আলোর দ্যুতি। গৌড়ের নবাবের কারাগার থেকে ১২ হাজার চোর-কয়েদীকে মুক্ত করে নিত্যানন্দের প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন—

অতঃপর বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশগতে।
চোরসহ মৈত্রতা হইলা আচম্বিতে।।
তার সহ পরে মোরে ধরিল নবাব।
মুই অপরাধী নহি বলি না শুনে জবাব।।
তৎকালে সিনান সময় যায় বহি।
অপরাধী বারশত গঙ্গাতীরে মোরা রহি।।
ইহার পূর্ব্বেতে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী।
বিগ্রহ নির্ম্মাণহেতু প্রস্তর খুঁজেন আগামী।।
মো সবারে দেখি গোঁসাই কহেন এক কথা।
তোদের খোলোসা কর্ব্ব মোর শিষ্য হবি যথা।।
ইহা শুনি স্বীকার কৈনু সবে কষ্ট নিবারিতে।
বিগ্রহ প্রস্তর পাইল প্রভু নবাব দরজাতে।।[৯৭]

তারপর বীরচন্দ্র সেই চোর কয়েদীকে সমাজজীবনে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিত্যানন্দের ভাবাদর্শের সুযোগ্য মূল্যায়নে তাঁর যে কঠোর শাসনব্যবস্থা (ন্যায়-নিষ্ঠা) ছিল তার উজ্জ্বল প্রমাণ কাঁদরানিবাসী নিজের শিষ্য জয়গোপালকে বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বর্জন। ইহা বীরচন্দ্রের লোকশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—

তথায় কায়স্থ জয়গোপাল স্থিতি।
বিদ্যা-অহঙ্কারে তা'র জন্মিল দুর্মতি।।
গুরু বিদ্যাহীন—ইতে হেয় অতিশয়।
জিজ্ঞাসিলে পরম গুরুকে গুরু কয়।।

প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।
লঙ্ঘিল প্রসাদ— তেঞি তা'রে ত্যাগ দিল।।[৯৮]

বীরচন্দ্র কিছুকালের জন্য খড়দহ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ঢাকা শহরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। বহুশিষ্য সেবকসহ প্রতিপত্তিশালী বীরভদ্রের ঢাকায় যাওয়ার বিবরণ এইরূপ—

অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ
নরযান অশ্বযান করিয়া সাজন।।
শ্বেত পীত রক্ত কৃষ্ণ পতাকা শোভন।
কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্ধচন্দ্র দরশন।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ করতলে শৃঙ্গ।
চারিপাশে বেড়ি যায় চরণের ভৃঙ্গ।।
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি।
নিত্যানন্দ দাস রামাই চলে দোলা ঘেরি।।

বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বহু বৌদ্ধ, যাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল বলে 'নাড়া' বা নেড়া বলা হত। তাঁদের প্রতাপান্বিত নেতা ছিলেন নৃসিংহ। 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার অনুসারে ঢাকার মুসলমান 'নবাব'-এর দুর্ব্যবহারে ভীষণ রেগে গিয়ে 'নাড়া-রা প্রস্রাব করে ঢাকা শহর ভাসিয়ে দেন। তখন নবাব ও অন্যান্য মুসলমানগণ 'জিন্দাপীর' বীরভদ্রকে সম্মান করে নিষ্কৃতি পান, (বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম: রমাকান্ত চক্রবর্তী পৃ. ১১০।)

জানকীনাথ পালের 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত' সূত্রে জানা যায়—স্বয়ং নিত্যানন্দও নাকি পার্বত্য গারো অঞ্চলে হাজং প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। 'সুসঙ্গের মহারাজদের এলাকার পর্বতবাসী গারো হাজঙ্গেরা প্রভু নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুদিগের শিষ্য। তাহারা হরি সংকীর্তন করে শ্রীগৌর নিতাইর বিগ্রহ স্থাপনা করে সেবা করে ও তাঁদের প্রীত্যর্থে মহোৎসব করে।'[৯৯]

বীরচন্দ্রের পুত্ররা নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্থিতিশীল করার জন্য তিনটি ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন—

১) মঙ্গলকোটে (বর্ধমান)—সংস্থাপক বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ। জাহ্নবাদেবী যখন শেষ বৃন্দাবন যাত্রা করেন, সেই সময়ে বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ এবং জাহ্নবাদেবী মঙ্গলকোট পৌঁছলে সেখানে নিত্যানন্দের শিষ্য চন্দন মণ্ডলের গৃহে অবস্থান করেন। পরে সেই অঞ্চলে জাহ্নবা এবং গোপীজনবল্লভ গ্রাম পরিভ্রমণ করে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার করেন। সেই স্থান লতাগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।

২) মালদহে সংস্থাপক বীরচন্দ্রের মধ্যমপুত্র রামকৃষ্ণ। বীরচন্দ্র যখন গৌড়ে প্রেম

প্রচার করছেন সেই সময়ে হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রী বীরচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি সংকীর্তন আয়োজন করলেন। সেই স্থানে বহু লোকের সমাগমে নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। সেই স্থানে নিত্যানন্দের প্রেম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন হয়। তার নেতৃত্ব দেন বীরচন্দ্রের মধ্যমপুত্র রামকৃষ্ণ।

৩) খড়দহে স্থাপয়িতা বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র নিত্যানন্দের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবী বর্ধমান জিরাটে গোপীনাথ সেবামন্দির স্থাপন করেন এবং নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রবর্তন করেন। গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধব আচার্য নিত্যানন্দের পদাশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর মহিমা প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি কিছুদিন খড়দহে অবস্থান করে শ্যামসুন্দরের সেবা পরিচালনা করেন। তারপরে জিরাটে বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন--'জিরাট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান'।

এইভাবে নিত্যানন্দ তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, জামাতা, পোষ্যপুত্র, শিষ্য এবং প্রশিষ্যদের নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর VAISNAVISM IN BENGAL-এ লিখেছেন This is a plausible thesis, since it is known that the followers of Nityananda took the first step towards spreading the cult among the tribal population of Bengal. They spread the cult among the Hajongs of the Garo Hills bordering of Mymensing. Vaisnavas of the Nityananda school were active in Tripura.[১০০]। তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় ছিলেন মহাভক্ত। তাঁরা জাতিভেদ মানতেন না। আমরা জানি পানিহাটীতে এক মহোৎসবে তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একত্রে উপবেশন করে পংক্তি ভোজন করেছেন। তাঁদের প্রচারে অন্ধ-বধির-পঙ্গু সকলেই স্থান পেয়েছিলেন। শিশুদেরও তাঁরা অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

নারীজাতিকে সমাজের পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন নিত্যানন্দ এবং তাঁর সম্প্রদায়। নারীজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণে নারীজাতি তথা সকলের মনে নিত্যানন্দ যে বলিষ্ঠ ছায়া ফেলেছিলেন তা বেদবাক্যের মতোই শিরোধার্য। সূর্যের আলোকে যেমন চন্দ্র আলোকিত, তেমনি নিত্যানন্দের আলোকে তাঁর সম্প্রদায়ও সকলের কাছে আবেদনসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারুর অন্নগ্রহণ করতেন না। সন্ন্যাসী বলে কখনও স্ত্রী সম্ভাষণও করতেন না। কিন্তু নিত্যানন্দ কখনও জাতিভেদ স্বীকার করেননি। স্ত্রীজাতিকে অস্পৃশ্য করে রাখেননি। তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত।

ড. সুশীলকুমার দে'র মতে— He hed views which were perhaps far ahead of those of Chaitanya.

এই হিসাবে বলতে পারি, নিত্যানন্দ ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের এক শক্তিশালী সংগঠক। তাঁর পত্নী জাহ্নবা নিত্যানন্দের অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের এক শক্তিশালী নারী-সংগঠক।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই মহাপ্রভুর তিরোধানের পর নিত্যানন্দের প্রচার কৌশলে বৈষ্ণবধর্মের মর্মকথা বাঙালীর জীবনে নূতনভাবে নূতনরূপে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। নিত্যানন্দের তিরোধানের পরেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তাঁর শিষ্য এবং উপশিষ্য সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণব সমাজে প্রবল পরিবর্তন আনলেন। বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) সাবালক হয়ে বৈষ্ণব আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হলেন। জাহ্নবাদেবী তীর্থদর্শনে চলে গেলেন। এরপর বীরভদ্র শিষ্যপরম্পরায় বৈষ্ণব ধর্মে সহজিয়ার ঢেউ এনে চৈতন্য-নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম ও আচারকে ভাসিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দ আশ্রিত প্রেমধর্মের ততদিনে নানা রূপান্তর ও শাখা-প্রশাখান্তর ঘটে গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলীতে নিত্যানন্দ

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মধ্যযুগের আদি পর্ব হতেই বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদরচনার সূচনা। আবার মধ্যযুগে বাংলাদেশে নবজাগরণের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাই চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য রসিক সমাজের কাছে অননুভূত থাকেনি। এ যুগের পদাবলীতে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। তাতে একদিকে ছিল ভক্তিবাদ ও তত্ত্বকথা, অন্যদিকে মানবপ্রেম ও মানবধর্ম তথা অকিঞ্চন সমরস—যা ছিল চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারের মূল কথা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রভাবিত বৈষ্ণবীয় মতবাদ নূতন প্রকৃতিতে বিকশিত হয়েছিল। তার প্রমাণ চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য। এর মূলে ছিল অবশ্যই চৈতন্যদেবের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ পার্ষদদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ব মাধুর্যশক্তির প্রভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন দেববাদনির্ভর মানবতাবাদ। তাঁরা দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাই চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক যুগ এবং চৈতন্যোত্তর কালের পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তাদের কিছু পদ এবং চৈতন্যদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও তৎসম্পর্কিত কিছু পদের উদাহরণ দিয়ে অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণব পদাবলীতে নিত্যানন্দের প্রভাব ও প্রেরণা নির্ণয় করব।

শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যভাগে রেখে বৈষ্ণব পদকর্তাদের কালানুযায়ী মূলত বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনটি ভাগ (১) চৈতন্যপূর্ব (২) চৈতন্যসমসাময়িক (৩) চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য। চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বসু রামানন্দ, রামানন্দ দাস, যদুকবিচন্দ্র, যদুনাথ দাস, যদুনন্দন, শিবরাম, অনন্ত, অনন্ত রায়, অনন্ত দাস, বংশী দাস, প্রসাদ দাস, মাধব দাস প্রমুখ।

শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের পদকর্তাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— কানুরাম দাস, লোচনদাস, রায়শেখর বা কবিশেখর, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস, দুঃখীদীন কৃষ্ণদাস, নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, প্রেমদাস, শঙ্কর ঘোষ, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস

কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্তী, দেবকীনন্দন, হরেকৃষ্ণদাস, গৌরীদাস, মদন রায়, আত্মারাম দাস, গতিগোবিন্দ, রাম, হরিরাম দাস প্রমুখ। নিত্যানন্দ ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুন্দরানন্দ ঠাকুর এবং জগন্নাথ দাস। এছাড়াও আরো বহু কবির এবং তাঁদের কাব্যের পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এঁদের সুচারু রচনা, প্রেম ও ভক্তিরসের বর্ণনা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক হলেও গৌরভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রিকা এর অন্যতম পর্যায়। কিন্তু গৌরাঙ্গ সহচররূপে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণা উৎস ও অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। আমরা বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে বৈষ্ণব পদাবলীতে নিত্যানন্দের স্থান নির্ণয় করতে পারি—(১) বলরাম অবতার নিত্যানন্দ (২) করুণাবতার নিত্যানন্দ (৩) গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।

পদকর্তা গোবিন্দদাসের পদে নিত্যানন্দের বন্দনা ধরা পড়েছে—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
কলিমদমথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেমকল্পতরু জোড়।
প্রেমরতন ফল ধয়ল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবনজন কান্দ॥
তেঞি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥
তাহে যে না দেখি কোন জনেতে প্রকাশ।
মলিন মুকুরে নহে বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহে বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥[১]

গোবিন্দদাসের আর একটি পদে নিত্যানন্দ চরিতের গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা রূপটি সুন্দর ভাষাচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে—

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ রাম॥
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথিরগতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥

গদগদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাসবিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ডখণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন
কনকখচিত অবলম্বনদণ্ড।।
কলিযুগকাল- ভুজঙ্গমসঙ্গম-
দগধন স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেমসুধারস জগ ভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি।।[২]

আবার পদকর্তা অনন্ত শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা করে পদ লিখেছেন যার মূলে রয়েছে ভাবরসমুগ্ধ নিত্যানন্দের প্রেমমুগ্ধতা—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দকন্দ
ঢলিয়া ঢলিয়া চলি যায়।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ত্ব
হরি বলি অবনী লোটায়।।
নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
গদাধরমুখ হেরে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে
ধারা বসে সিঞ্চিত ধরণী।।
অদ্বৈত আনন্দকন্দ হেরে নিতাই মুখচন্দ
হুঙ্কার পুলক শোভে গায়।
হরি হরি বোল বলি ডাকে নিতাই গৌর হরি
প্রিয় পারিষদগুণ গায়।।
গোলোকের প্রেমবন্যা জগত করিল ধন্যা
অতুল অপার রসসিন্ধু।
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি
অনন্ত না পাইল তার এক বিন্দু।।[৩]

ঘনশ্যামদাস কবিরাজ নিত্যানন্দকে বন্দনা করে একটি পদ রচনা করেছেন। এই পদে প্রেমিক নিত্যানন্দের সংস্কারমুক্ত উদার-হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে—

ভকতি রতনখনি উঘাড়িয়া প্রেমমণি
নিজগুণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম-অধম নাই যারে দেখে তার ঠাঞি
দান কর জগত জুড়িয়া।।

সোঙরি নিতাইগুণ যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের সুখ
নিতাইচাঁদের গুণ গাই॥
এমন দয়ার ঠাঞি কোথায়ও শুনিয়ে নাই
আছুক দেখিবার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ সমান হিয়া সেহো যায় মিলইয়া
নিতাইগুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যাম দাস যার নাহি বিশ্বাস
সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে॥[৪]

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মলীলা প্রসঙ্গে পদকর্তা দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস একটি সুন্দর পদের বর্ণনা করেছেন।

রাঢ়দেশে নাম একচক্রা গ্রাম
হারাই পণ্ডিতঘর।
শুভ মাঘমাসি শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত অতি হরষিত
পুত্রমহোৎসব করে।
ধরণীমণ্ডল করে টলমল
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুরনাথ মনে হরষিত
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন হৈল পরসন্ন
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥[৫]

নিত্যানন্দের জন্মলীলা প্রসঙ্গে কবি শিবরাম নিত্যানন্দের রূপলাবণ্যের বর্ণনা করে একটি অপূর্ব পদ লিখেছেন—

আগে জনমিলা নিতাইচাঁদ।
পাতিলা অমিয়া করুণা ফান্দ॥
নারীগণ সভে দেখিতে যায়।
সভারে করুণানয়ানে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে॥
দেখি সভে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষবরে॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিল বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগ্ধ ঝরে।
কেহো যায় তারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আসা করয়ে মনে॥[৬]

পানিহাটীতে 'রাঘব ভবন'-এ নিত্যানন্দের অভিষেক লীলা রাজোচিতভাবে হয়েছিল। নিত্যানন্দের রূপলাবণ্যের সৌন্দর্য দেখে ভক্তরা মোহিত হয়ে যান। সেই সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস তার বর্ণনা দিয়ে একটি পদ রচনা করেন—

জয় রে জয় রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘবঘরে বিহরে সদায়॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেক।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান॥

নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা ধরে॥
অরুণ কিরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥[৭]

আবার তিনি নিত্যানন্দের অভিষেককালের ভক্তবৃন্দের বর্ণনা দিয়ে আরও একটি পদ লেখেন—

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥
শত ঘট জল ভরি পঞ্চগব্য আদি করি
নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিগে রমণীগণ জয়জোকার ঘন ঘন
আর সভে হরি হরি বোলে॥
বামপাশে গৌরীদাস হেরই দক্ষিণ পাশ
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই আনন্দ মঙ্গল গাই
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন॥
ঘন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥[৮]

নীলাচলে বসে গৌরাঙ্গ আদেশ দিলেন নিত্যানন্দকে তুমি গৌড়ে যাও। সেখানে গিয়ে মূর্খ, পাপী-তাপীদের উদ্ধার কর। এই সম্পর্কে পদকর্তা প্রেমদাস নিত্যানন্দের গৌড়দেশে আগমন কাহিনী নিয়ে এই পদটি রচনা করেছেন—

চৈতন্য আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হৈয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তনবিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি

রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা।।

সকল ভক্ত লৈয়া গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া

বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।

পতিতদুর্গতি দেখি হইয়া করুণাআঁখি

প্রেমরত্ন জগতে বিলায়।।

হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী

পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।

পড়িয়া বিষয়ফাঁদে না ভজি নিতাই চাঁদে

প্রেমদাস বঞ্চিত হইল।।[৯]

গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়মণ্ডলে কলির জীব উদ্ধারের প্রধান সহায় হয়ে উঠলেন। এই পদটি বলরামদাস সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া

মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।

জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া

যাও নিতাই সুরধুনী তীরে।।

নামপ্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে

অবতীর্ণ হইনু ধরায়।

তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব

তুমি মোর প্রধান সহায়।।

নীলাচল উদ্ধারিয়া কৃষ্ণদাসে সঙ্গে লৈয়া

দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার লৈয়া কর নাম প্রচার

ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি।।

মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা

প্রেমদাতা পরম দয়াল।

বলরাম কহে পহুঁ দোহাঁর সমান দুহু

তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল।।[১০]

ভাবময় নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করে কবি মুরারি গুপ্ত একটি পদ রচনা করেন—

প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দশ দিগ দলি

ধরণী ধরিতে নারে ভার।

অঙ্গভঙ্গী সুন্দর গতি অতি মন্থর

কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার।।

প্রেমে পুলকিত তনু কনককদম্ব জনু
প্রেমধারা বহে দুটি আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে পুরুব পৈড়াছে মনে
ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।।
হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে
ফুটি মরে পাষণ্ডীর জন্য।
লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঞ্জক হাতে
হলধর মহাবীর ফণা।।
কেবল পতিত বন্ধু রঙ্কের রতন সিন্ধু
অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্তদাসে
পুনঃ পহুঁ না কৈল তলাস।।[১১]

কবি আবার যুগ্মভাবে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের রূপ, গুণ বর্ণনা করেছেন—

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল
নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়।।
পথে হৈল দেখা রূপে নাহি লেখা
দিঠি দিয়া গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়।।
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা।।
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবীর কাদা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভাসিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারি।।[১২]

নরোত্তমদাসের একটি পদে নিতাইচাঁদের করুণা-প্রার্থনার ভাবটি মাধুর্যরসে পাঠককে মুগ্ধ করে—

নিতাই পদকমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসারসুখে নিতাই না বলিল মুখে
সেই পাপী অধম সভার।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভবসংসার মাঝে নিতাইচাঁদ যে না ভজে
তার জন্ম হৈল অকারণে।।
নিতাইর দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ।।[১৩]

পদকর্তা হরেকৃষ্ণদাস নিতাই সুন্দরের করুণাপ্রার্থী হয়ে একটি পদ লিখেছেন—

ঠাকুর নিতাইচাঁদ দয়া কর মোরে।
তোমার চরিত্র নাম দিবা নিশি অবিরাম
সদা যেন কণ্ঠে মোর স্ফুরে।।
হাড়াই পণ্ডিত ধাম একচক্রা নামে গ্রাম
অবতার অনন্ত বৈভব।
অগতি জনার বন্ধু নিতাই করুণা সিন্ধু
প্রেম দিচ্ছেন হৈয়া অকৈতব।।
চৈতন্যের যাহারে রোষ নিত্যানন্দ ক্ষমি দোষ
হেন পাপী নিস্তার করিলা।
নিজ পুরি দেখি শূন্য যম আসি করে দৈন্য
মোরে অধিকার ছাড়াইলা।।
পূর্ব্বে নামাভাসে যেন অজামিল ব্রাহ্মণাধম

সব পাপে করিলা উদ্ধার।
হরি নাম শুনি এবে বৈষ্ণব হইলা সভে
কেনে মোরে দিলা অধিকার।।
নিত্যানন্দ পদে আশ কহে হরেকৃষ্ণ দাস
দেহ মোরে নিজ পদছায়া।
যদি জন্ম হয় পুন চৈতন্য নিতাই গুণ
গাই যেন হেন কর দয়া।।[১৪]

হরিরামদাস শ্রীনিত্যানন্দের 'করুণাময় অবতার' মহিমা ব্যাখ্যা করে একটি পদ রচনা করেছেন—

নিতাই করুণাময়-অবতার।
দেখিয়া দীনহীন করয়ে প্রেমদান
আগম নিগমের সার।।
সহজে ঢলঢল সজল-নিরমল
কমল জিনিয়া আঁখি-শোভা।
বদন-মণ্ডল কোটি শশধর
জিনিয়া জগ-মন-লোভা।।
অঙ্গ সুচিকণ মদন-মোহন
কণ্ঠে শোভে মণিহার।
বচন-রচন শ্রবণে দূরে গেল
পাতকী-মন-আন্ধিয়ার।।
নবীন-কবি-কর জিনিয়া ভুজ-বর
তাহে শোভে হেমদণ্ড।
হেরিয়া সবলোক পাসরে দুঃখ শোক
খণ্ডয়ে হৃদয় পাষণ্ড।।
নিতাইর করুণায় অবনী ভাসল
পূরল জগমন-আশ।
ও প্রেম লবলেশ- পরশ না পাইয়া
কান্দয়ে হরিরাম দাস।।[১৫]

চৈতন্য পার্যদগণ যে সম্মিলিতভাবে অধিবাস কীর্তনানন্দে মগ্ন হতেন, সে বিষয়ে বংশীবদনের একটি পদ আছে। যার মধ্য দিয়ে সপার্ষদ গৌরাঙ্গের মাধুর্যের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে—

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ।
আনিয়া বৈষ্ণব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন দেই মালাচন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বায়ে তাতা থৈয়া থৈয়া
করতাল অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল।
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরিবোলে-ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব।[১৬]

আবার হরিনাম সংকীর্তনের অধিবাস সম্পর্কে পদকর্তা পরমেশ্বর একটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন—

এক দিন প্রভু হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ কবি সঙ্গে অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া

পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সভে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বরদাস রসে ভাসে॥[১৭]

শ্রীবাসগৃহে চৈতন্যদেবের অভিষেক কালে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদরা উপস্থিত ছিলেন। নিত্যানন্দের সেই সময়কার প্রাকৃত লীলার বর্ণনা দিয়ে গোবিন্দদাস একটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন—

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহু নয়ন ঘনমেহা॥[১৮]

নিত্যানন্দ রাজোচিত বেশে ভক্তসমাজে বিচরণ করেছিলেন, ভক্তসমাজকে আকৃষ্ট করবার জন্য এই বিষয়ে চৈতন্যদেবকে তিনি বলেছিলেন—'কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে' এই সম্পর্কিত গোষ্ঠলীলায় বংশীবদনের একটি সুন্দর পদ আছে—

বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই-চাঁদের মুখে শিঙার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্ধন॥[১৯]

বলরামদাসের একটি পদে গৌর-নিতাই-এর কীর্তিগাথার সুনিপুণ বর্ণনা-সূত্রে তাঁদের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কবির মনোবেদনা ফুটে উঠেছে—

দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত
সো গোকুল পতি অব পরকাশল
পুনঃ কিয়ে বামন-রীত॥
নিরখি প্রতাপ প্রতাপরুদ্র বলি
তনু মন সরবস দেল
জগাই মাধাই আদি অসুরগণ
চরণ প্রবন নিজ কেল॥
যছু পদ সব অদ্বৈত ভগীরথ
ভগতি গঙ্গ পরবাহ॥
নিত্যানন্দ গিরিশ, দেই আনল
বাম-হিমাচল মাহ॥
যছু অবগাহনে অখিল ভগতগণে
বিলসই প্রেম আনন্দ॥
পামর পতিত পরম পদ পায়ল
বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥[২০]

পদটিতে নিত্যানন্দকে গিরিশ এই বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত কবা হয়েছে। বোধ করি পদটিতে তাঁর বিশাল ব্যাপ্তি, দুর্লভ ব্যক্তিত্ব এবং ভালোবাসার অসীম শক্তি বোঝাতে গিয়ে গিরিশ এবং হিমাচলের সঙ্গে কবি তাঁর তুলনা করেছেন।

পদকর্তা আত্মারামের একটি পদে নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নিত্যানন্দ চৈতন্যলীলার বিশেষ অবতার। এক এক যুগে এক এক অবতাররূপে তাঁর আবির্ভাব—

আরে মোর নিতাই নায়র।
সংসার-সায়রে জীবের জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র॥
অবনী-মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত-বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন বসু-জাহ্নবীর জীবন
চৈতন্য লীলায় বিশেষ॥
রাম অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।

কৃষ্ণ-অবতারে গোকুল-নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম॥
গৌর-অবতারে নদীয়া বিহরে
ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীন হীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম॥[২১]

নিত্যানন্দ নিজে ছিলেন ভক্তিরূপের জ্বলন্ত শিখা। তাঁর ঐ ভক্তির রূপ দেখে বহু মানুষ আবিষ্ট হয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পিত করেছেন—

খঞ্জন-গঞ্জন লোচন-রঞ্জন
গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত
চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ-নয়নে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥
হুহুঙ্কার গরজন মালশাট পুন পুন
কত কত ভাব-বিথার।
কদম্ব কেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইলুঁ কৃপা-লেশে
রহি গেলুঁ পাষাণ সমান॥[২২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দের স্থান সুদূরপ্রসারী। এই সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই কিছু আলোচনা করেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এবং সমাজে তাঁর প্রভাব যে কতখানি ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ আছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সংযোজিত বেশ কিছু সংখ্যক পদে। যেমন বর্তমান পদটি—

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।
সুরধুনি তীর গদাধর সঙ্গতি
চান্দনি রজনি উজোর।

শাঙন মাস গগন ঘন গরজন
ললপিত দামিনী মালা।
বরিখত বারি পবন মৃদু মন্দহি
গঙ্গা তরঙ্গ বিশালা।
বিবিধ সুরঙ্গ রচিত তহিঁ দোলা
খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরু ডালে ডোর করি বন্ধন
মালতি গুচ্ছ সুঠাম।
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর
ঝুলন রঙ্গ রসে ভাস।
সহচর মেলি ঝুলায়ত মৃদুমৃদু
দেলা ধরি দৌ পাশ।
বাজত মৃদঙ্গ পুরব রস গায়ত
সংকীর্ত্তন সুখ রঙ্গ।
নিত্যানন্দ শান্তিপুর নায়ক
হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ।
পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত
কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধবদাস নয়নে কব হেরব
গৌর হোয়ব অনুকূল।[২৩]

পদটিতে নিত্যানন্দকে শান্তিপুরের নায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি, নিত্যানন্দ শাখার ভাবনায় ভাবিত। তাঁর পদের মধ্যে বলরামের অবতার, রাজকীয় মল্লবেশধারী নিত্যানন্দের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী।
নাম নিতাই ভায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই না পারি।।
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগবিদিগ নাহি জানে।
মত্ত সিংহ যেন গরজন ঘন ঘন
জগমাঝে কাহু না মানে।।

লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে নটন বিলাস।
কলিমলদলন গতি অতি মন্থর
কীর্ত্তন কবল প্রকাশ।।
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ
মলয়জ লেপন অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে বিধি আজি মিলায়ল
কলি মাঝে ঐছন রঙ্গ।।[২৪]

দেবকীনন্দন গোস্বামী নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করে একটি পদ রচনা করেছেন—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে।।
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া।।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বোল গৌর হরি।।
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার।।
যে পহুঁ গোকুল-পুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার।।
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গরগর হিয়া।।
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম।
হেন মতে প্রেমে ভাসাইল পুর-গ্রাম।।
দেবকীনন্দনে বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া।।[২৫]

পদাবলীখ্যাত কানুরামদাস ছিলেন নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। তিনি নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করে একটি পদ রচনা করেন—

আরে মোর পহু নিতাই চাঁদ।
ঘরে ঘরে দিল প্রেমের ফাঁদ।।
তাপিত অখিল সকল জনে।
সিঞ্চিত করল নয়নকোণে।।

অপার করুণা গৌড়দেশে।
নাচিয়া বুলয়ে ভাবআবেশে।।
গদগদ কহে ভাইয়ার কথা।
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা।।
আর কত গোরা সুন্দরতনু।
পুলক কদম্বকেশর জনু।।
বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ।
ভকত মিলিয়া গায়ত রঙ্গ।।
ঢুলিতে ঢুলিতে কত না ভাতি।
কমলচরণে খঞ্জনগতি।।
করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ।
প্রেম মাগে পদে এ কানুদাস।।[২৬]

নিত্যানন্দ যে পাবন উদ্ধারকর্তা ছিলেন সে সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কানুরাম একটি পদ রচনা করেন—

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোর।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বোলে।।
জয় প্রেমভক্তদাতা পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার।।
প্রেমদানে জগজীবের মন কৈলা সুখী।
তুমি যদি দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুখী।।
কানুরাম দাসে বোলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি।।[২৭]

পদকর্তা মদন রায় তাঁর পদে গৌড়দেশে গোপাল বেশে নিত্যানন্দ যে জীবনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছিলেন সেই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই।
অবধূত-বেশ ধরি জীবে দিল নাম হরি
হাসে কান্দে নাচে আরে ভাই।।
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ ধরণ না যায় অঙ্গ
গোরা প্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে বাহু তুলি হরি বলে
দু নয়নে বহে নিতাইর পানি।।

তিলকের শোভা ভালে কুটিলকুন্তল লোলে
গুঞ্জার আটুনি চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি কটিতটে নীর ধটী
বাজন-নূপুর রাঙ্গা পায়।।
কে কহু নিতাই গুণ জীব দেখি সকরুণ
হরি নামে জগত তারিল।
মদন মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল বন্ধ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল।।[২৮]

পদকর্তা বিন্দুদাস যুগ্মভাবে চৈতন্য-নিত্যানন্দের রূপ-গুণ বর্ণনা করে একটি পদ সংযোজন করেছেন—

কলধৌত কলেবর গৌরতনু।
তছু রঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু।।
কোটি কাম জিনী কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধূত বিরাজিত চন্দ্রঘটা।।
শচিনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তহিঁ রোহিণিনন্দন দীগ আলা।।
গজরাজ জিনী দুন ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে দোলে।।
মুনি ধ্যান ভুলে সতিধর্ম্মা টলে।
জগতারণ কারণ বিন্দু বলে।।[২৯]

নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস অষ্টাদশ শতকের কবি। ইনি নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করে একটি পদে বলেছেন, তিনি ছিলেন পতিতদের ত্রাণকর্তা—

আমার নিতাই গুণের মণি।
ভকতি রতন ধন বিলাইয়া
জগত করিলা ধনী।।
পতিত পামরে ধরি করি কোরে
ভিজায় আঁখির জলে।
গোরাপ্রেম ভরে থির হৈতে নারে
পড়য়ে ধরণতলে।।
অরুণ ভূধর জিনি কলেবর
এ ধূলি ধূসর তাহে।

পুলক আবলি কিবা ঝলমলি
ছটায়ে ভুবন মোহে।।
চৌদিকে চাহিয়া গরগর হিয়া
গজেন্দ্রগমনে যায়।
নিরুপম যশে ভাসে দিশা দশ
দাস নরহরি গায়।[৩০]

গৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস নেন, তখন নিত্যানন্দ সহচররূপে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। সেই সময় রত্নগর্ভা শচীমাতার অন্তরীণের অবস্থা ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মনোবেদনা সম্পর্কে বলরামদাসের একটি অত্যন্ত সুন্দর পদ আছে—

নিতাই করিয়া আগে যায় শচী অনুরাগে
সভে মেলি গেলা শান্তিপুরে।
মুড়াইয়া মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার মন ঝুরে।।
নদিয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
ইহার লাগিয়া কত পড়াইলাম ভাগবত
একথা কহিব কার পাশ।।
কর জোড় করি আগে মায়ের চরণ যুগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হইয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া।।
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারি
ঘরে ঘরে খাও ভিক্ষা মাগি।
জিয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইল বৈরাগি।।
গোরা চান্দের বৈরাগে ধরণি বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বলরাম দাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস
জগভরি রহল ঘোষণা।।[৩১]

শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে বাংলা তথা ভারতভূমি প্লাবিত হয়েছিল। সমাজ-মানসে সঞ্চিত হয়েছিল উর্বরা পলি। ভক্তিরসের প্লাবনে মানুষের মধ্যে জেগেছিল ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার বোধ। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বিভেদ ভুলে গিয়ে

মানুষ মানবপ্রেমের মিছিলে অংশীদার হবার কামনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এই মানসিকতার এক অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গোবিন্দদাসের একটি পদে। কবি প্রার্থনা করেছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুয়ি দুরাচার।[৩২]

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ আছে—

শ্রীমাধব ঘোষ-মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে।।[৩৩]

নিত্যানন্দের এই অননুকরণীয় নৃত্যরত রূপের বর্ণনা করে অনন্ত রায় একটি পদ লেখেন—

নিতাই চৈতন্য দুহুঁ দয়ার অবধি।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যাচে নিরবধি।।
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে।
হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে।।
পতিত দুর্গত পাপী কলি-হত যারা।
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায়ে তারা।।
ভুবন মঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন-রসে।
রায় অনন্ত কান্দে না পাইয়া লেশে।।[৩৪]

পদটিতে কবি যেন এক অপরূপ ছবি অঙ্কন করেছেন। পদটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানসপটে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে উজ্জ্বল কান্তি, চোখে অশ্রুধারা সম্বলিত এক ভক্তির অপরূপ মূর্তি যিনি গদগদ কণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সেই ভক্তের সঙ্গে আমাদের মনও যেন অবচেতনে ধেয়ে চলে পরম পুরুষার্থের দিকে।

শুধু তাঁর প্রাকৃত জীবন নিয়েই নয়, তাঁর স্তুতিগান করেও পদকর্তারা বহু পদ রচনা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে নিত্যানন্দ প্রচারিত সর্বমানবের সমভাব, প্রেম, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদির প্রভাব সুমুদ্রিত হয়েছে। পদকর্তারা মঙ্গলাচরণের বহু পদেও নিত্যানন্দের স্তব গান করেছেন। যেমন—

জয় জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্রকর।
জয় শান্তিপুর নগর সুধাকর।।
জয় বসু-জাহ্নবি দেবি হৃদয় হর।
জয় জয় সীতানাথ-কলেবর।।

বীর-তাত জয় জীব-কিঙ্কর।
জয় জয় গৌর-অভিন্ন কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর।।[৩৫]

সমাজের অধম-উত্তম বাছবিচার না করে নিত্যানন্দ সকলকে যে প্রেম অকাতরে বিতরণ করেছেন সেই সম্পর্কে পদকর্তা ঘনশ্যামদাস কবিরাজ একটি পদ লেখেন—

ভকতি রতনখনি   উঘাড়িয়া প্রেমমণি
নিজগণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই   যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত জুড়িয়া।।
সোঙরি নিতাইগুণ   যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ   তবে সে মনের সুখ
নিতাইচাঁদের গুণ গাই।।
এমন দয়ার ঠাঞি   কোথায়ও শুনিয়ে নাই
আছুক দেখিবার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দময়   সকল ভুবন হয়
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে।।
পাষাণ সমান হিয়া   সেহো যায় মিলাইয়া
নিতাইগুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যাম দাস   যার নাহি বিশ্বাস
সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে।।[৩৬]

নিত্যানন্দ যে আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন এবং পতিত সমাজকে শুনিয়েছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী তার প্রমাণ আছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে। এই বিষয়ের অগণিত পদের মধ্য থেকে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পদের উল্লেখ করবো। বাসুদেব ঘোষ-এর একটি পদ উল্লেখযোগ্য—

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা   জগত করিল ধন্যা
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল।।
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ   বাকি না রহিল কেউ
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি   সে প্রেমেতে করে কেলি

কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া।।

ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শান্তিপুর

দোঁহে মিলি বাইছ খেলায়।

তা দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে

বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায়।।[৩৭]

ভাবময় ও দয়ার সাগর নিত্যানন্দের সুন্দর রূপের বর্ণনা দিয়ে প্রসাদদাস একটি পদ রচনা করেছেন—

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পূরব বিলাস রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া।।
কঞ্জ নয়নে বহে সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা।।
চন্দন চরচিত অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে ভেল জগমন ভোর।।
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর শুণ্ডে।
কনকখচিত দণ্ড দলন পাষণ্ডে।।
শির পর পাগড়ি বান্ধে পটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া।।
দয়ার ঠাকুর নিতাই অবনী প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস।।[৩৮]

প্রসাদদাসের আর একটি পদে আমরা পাই করুণাসিন্ধু, পতিতজনের তথা সর্বজনের বন্ধু নিতাইস্তুতি —

কমল জিনিয়া আঁখি
শোভা করে মুখশশী
করুণায় সভাপানে চায়।
বাহু প্রসারিয়া বোলে
আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সভারে বিলায়।।
ভুবন ভুলানো বেশ
শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।।
নাটুয়া ঠমকে চলে
বুক বাহি পড়ে লোরে

বিবিধ জীবের তাপহর।।
হরি হরি বোল বলে
ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখচান্দ
নিতাই প্রেমের ফান্দ
ভাবসিন্ধু উছলে লহরী।।
নিতাই করুণাসিন্ধু
পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগৎ ডুবিল।
মদন মদেতে অন্ধ
প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল।।[৩৯]

নিত্যানন্দ যে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হয়ে প্রেমরস বিতরণ করেছিলেন এবং পতিতদের ত্রাণকর্তা ছিলেন, উপরোক্ত পদটির মধ্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শঙ্কর ঘোষ বৃন্দাবনদাসের অনুকরণে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত একটি পদ রচনা করেছেন যাতে নিত্যানন্দ চরিত্রের সকল দিক উদ্ভাসিত হয়েছে—

হেম স্তম্ভ জিনি বাহু সুবলনি
সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্রবদন কমলনয়ন
মদনমোহন বেশ।।
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘনঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
....
শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতিআশ।
নিতাই চরণারবিন্দে।।[৪০]

চৈতন্যদেবের আদেশে নিত্যানন্দের বিবাহ-কাহিনী নিয়ে পদকর্তা রামানন্দ দাস একটি সুন্দর পদ রচনা করেন—

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর।
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীলা সম্বরিল

কার সঙ্গে করিব বিহার॥
অদ্বৈত শ্রীবাস পুরী দামোদর দাস
তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥
বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই
সেহ গেল বৈরাগ্য করিয়া।
ছোট হরিদাস নাম না শুনিব তার গান
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহবাস যাহ হে পণ্ডিতপাশ
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা ধরি
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥
পতিত অধম মূর্খ ইহারে না দিবে দুঃখ
করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো
করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
তুমি মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম
করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে।
নিতাই এর করে ধরি প্রভু বোলে হরি হরি
রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে॥[৪১]

বৃন্দাবনদাসের নিম্নলিখিত এই পদটিতে নিত্যানন্দকে চৈতন্যের 'প্রেমরত্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পদসাহিত্যের ধারায় নিত্যানন্দ সম্পর্কিত এইরূপ অগণিত পদ আছে——

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিগে শ্রুতি-মূলে মকর-কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তভ বিরাজে।
সুবলিত ভুজ-দণ্ড জিনি করিবর-শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেম-দণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড।

অঙ্গ দেখি শুদ্ধস্বর্ণ দুটি আঁখি রক্তবর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়া যেন গঙ্গা-ধারা বহে হেন
দেখি সুর লোকের আনন্দ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীর-দাপ মালশাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মালোকে করে স্তুতি।
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবের করিয়া যত্ন
দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম্ম দোষে
না ভজিলুঁ নিতাই পদদ্বন্দ্বে।[৪২]

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়ে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ সম্পর্কিত পদ পাওয়া যায়। যেমন—

অতি শে চাকুতর মস্তক পরিসর
মেঘাঙ্কুর কেশজাল।
ত্রিজট মনোহর শ্রীমুখ উপর
শোণ কঞ্জে ভৃঙ্গমাল॥

....

কহিছেন নিত্যানন্দ এইসব পরবন্ধ
গদাধর-ধনঞ্জয় সনে।
গৌর-মাধবেন্দ্র মেলি প্রেম-আনন্দ কেলি
চূড়ামণি দাস রচনে।।[৪৩]

বৈষ্ণব কবিগণের অনেকেই বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কবি বাসু ঘোষ এখানে নিত্যানন্দ-দিবাকর মিলন প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের যে বর্ণনা করেছেন তা খুবই সুন্দর—

থির বিজুরি হরিতাল হরি
প্রভুর বরণ জনু।
নবনি ছানিয়া মধু নিঙাড়িয়া

গড়িল বুঝি তনু।।
চন্দনচরচিত অঙ্গ শোভিত
বনমালা দোলে গলে।
বদন শ্রীযুত দশন মুকুত
তিলক বিন্দু ভালে।।
দিব্য বস্ত্রপরি গতি মত্ত করী
চরণে নূপুর বাজে।
পীরিত কন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ
হরি হরি বলি নাচে।।

সত্যসত্যই "পাতকী তারিতে যাঁর হৈল অবতার"—সেই প্রেমাবতার নিত্যানন্দের দৈন্য ও আর্তি, প্রেম ও করুণা কীভাবে মূর্ত হয়ে সপ্তগ্রামবাসীকে প্রেমদানে উদ্ধার করেছিল তার চিত্র কবির সুনিপুণ তুলিতে এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এমন দয়াল দাতা নাই।
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী দাঁড়াঞা সারি সারি
প্রভুর মুখের পানে চায়।
পুলকেতে অবসন্ন অশ্রুকম্প বৈবর্ণ্য
উঠে বৈসে বাউরার প্রায়।
প্রভু কন তো সবার বারি মুঞি বহু ধার
আইনু তেঞিঃ এখানে ধাইয়া।
হুহুঙ্কারে মালসাটে পাষণ্ডীর বুক ফাটে
ভক্ত কান্দে চরণে পড়িয়া।
প্রভুর নেত্রে বহে ধারা ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ারা
প্রেমধন ভুবনে বিলায়।
বাহু পসারিআ বলে আইস আইস করি কোলে
পতিতের ধরিআ গলায়।
উত্তম অধম নাই যারে পায় তার ঠাঞি
প্রেমভিক্ষা মাঙ্গে অবধূত।
পাষাণ সমান হিআ সেহ দিল গলাইয়া
বাসু কেনে হৈল বঞ্চিত।

বাউলের একখানি প্রাচীন গানে, সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ-উদ্ধারণ মিলনচিত্র দেখতে পাওয়া যায়—

নৃত্য করে নিত্যানন্দ ভক্তমণ্ডলে
হরি হরি বলে সদা প্রেমে ঢলে।
ভক্তিসিন্ধু উথলে।।

(তোবা দেখে যা যে জন ভাবের ভাবী যে জন প্রেম মহাজন রসিক সুজন ভক্তিসিন্ধু উথলে)

উদ্ধারণ সঙ্গে সখা সপ্তগ্রামে হইল দেখা,
প্রেমভক্তি দিলে বণিক বৈশ্যকুলে,
যোগী ঋষি যা না পায় যোগ বলে।
উদ্ধারণ সখা সনে দেখা।
যিনি দ্বাপর যুগে ছিলেন সুবাহু গোপাল
ধন্য পুরী সপ্তগ্রাম সপ্ত ঋষির পুণ্যধাম,
ভাগীরথী আর সরস্বতী মুক্তবেণী চলে,
ধন্য পুরী সপ্তগ্রাম।
যথায় হরি বরাহ রূপে কেলি কুশলে বিচরণ করেছিল।
সুবর্ণবণিক বৈশ্য ভক্তি প্রভাবে নমস্য
সাধু সদাচারী সিঞ্চে ভক্তিবারি
নিতাই চাঁদের কৃপাবলে
আমার দয়াল নিতাই চাঁদের কৃপা বলে।
ঐ প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের কৃপা বলে।

(সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি)

নিত্যানন্দ যে আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন এবং পতিত সমাজকে শুনিয়েছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী তার প্রমাণ আছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সঞ্চিত অগণিত পদের মধ্যে। ইতিমধ্যে কয়েকটি পদের উল্লেখ করেছি। অনুরূপ আরও কয়েকটি ভালো পদ 'অধিকন্তু ন দোযায়' যুক্তিতে সংযোজিত হল--

১নং পদ--

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ।
উথলিয়া যাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ।।
অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দুইখানি।
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি।।
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
ডুবারি কাণ্ডারি তাহে প্রভু নিত্যানন্দ।।

প্রেম জলচর শ্রীবাসাদি সহচর।
স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের মকর।।
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া
দুঃখিয়া শেখর কাঁদে ফুকার করিয়া।।[৪৪]

২নং পদ—

আরে মোর নিতাই নায়র
সংসার-সায়র জীবের জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র।
অবনী-মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন বসু-জাহ্নবার জীবন
চৈতন্যলীলার বিশেষ।
রাম অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ অবতারে গোকুল নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম।
গৌর অবতারে নদীয়া বিহারে
ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীন হীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম।[৪৫]

৩নং পদ—

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের
অরুণ দুখানি পায়।।
নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসারতাপের শিরে পদ ধরি
অমিয়া সাগরে মজে।।
নিতাই যাহার হিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সুধানিধি
মানস ভরিয়া পিয়ে।।

যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।

জ্ঞনদাস কহে গৌরপদ সেই

হিয়ার মাঝারে বাঁধে।।[৪৬]

৪নং পদ---

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।

আগে নাচে আগে গায় চৈতন্য বোলায়।।

লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।

পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে।।

পট্ট-বাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।

ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে।।

সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।

গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর।।

চৌদিগে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।

জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়।।[৪৭]

৫নং পদ—

নিতাই কেন পতিত জনার বন্ধু।

জীবের চির পুণ্য-ফলে বিহি আনি মিলাইলা

রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু।

দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পহুঁ গোরা রায়

ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।

প্রিয় সহচর মেলে নিতাইর করি কোলে

কান্দে চাঁদ বদন হেরিয়া।

নব-কঞ্জারুণ আঁখি প্রেমে ছল ছল দেখি

সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী।

মেঘ-গভীরস্বরে ভাই ভাই রব করে

পদ-ভরে কম্পিত মেদেনী।

নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমাশ্রয়

হেন দয়া জগতে বিদিত।

নিজ-নাম সংকীর্ত্তনে উদ্ধারিলা জনে জনে

বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।[৪৮]

৬নং পদ-

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বোল গৌর হরি॥
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পহুঁ গোকুল-পুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গরগর হিয়া॥
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম।
হেন মতে প্রেমে ভাসাইল পুর-গ্রাম॥
দেবকীনন্দনে বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া॥[৪৯]

৭নং পদ---

দেখ অপরূপ চৈতন্যহাট।
কুলের কামিনী করয়ে নাট॥
হাট বসাইল নিতাই বীর।
কাহুক চরণ কাহুঁক শীর॥
অবণী কম্পিত নিতাই-ভরে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীর স্বরে॥
গৌর বলিতে সৌর-হীন।
প্রেমে না জানে রজনী দিন॥
এ বড় মরমে রহিল শেল।
নিতাই না ভজি বিফল ভেল॥
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই।
নিতাই ভজিলে গৌরাঙ্গ পাই॥[৫০]

৮নং পদ—

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥

গদগাদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেম ধরি দেই কোল॥
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুখ জানে।
হরি নামের মালা গাঁথি দিল জগমনে॥
পাপ পাষণ্ডীতে যত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ॥
হাহা গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে॥
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল॥[৫১]

৯নং পদ—

বীরভূমের পূর্ণশশী নিত্যানন্দ রাম।
একচক্রাধামেশ্বর নিত্যানন্দ-হে॥
হাড়াই পণ্ডিতের সুত নিত্যানন্দ-হে।
পদ্মামায়ের নয়ন তারা নিত্যানন্দ-হে॥
ভুবনমোহনরূপে একচক্রা আলোকিত নিত্যানন্দ-হে।
ন্যায়চূড়ামনি শাস্ত্রের আখ্যাতি নিত্যানন্দ-হে।
পদব্রজে বিভিন্নদেশ ভ্রমণকারী নিত্যানন্দ-হে॥
পাণিহাটীর ছত্রিশ জাত পংক্তি ভোজনকারী নিত্যানন্দ-হে।
অভিন্ন চৈতন্য তনু নিত্যানন্দ হে॥
পাণিহাটীর সাম্যবীজ রোপণকারী নিত্যানন্দ হে।
গৌর বশীকরণ মন্ত্র নিত্যানন্দ হে॥
গৌরাঙ্গ বিলাসের দেহ নিত্যানন্দ হে।
গৌড়দেশে প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ হে॥
সর্বকালের গণদেবতা নিত্যানন্দ হে।
অগতির গতিদাতা নিত্যানন্দ হে॥
অদোষদরশী প্রভু নিত্যানন্দ হে।
পতিতের উদ্ধারকর্তা নিত্যানন্দ হে॥

পতিত খোঁজা পরমদয়াল নিত্যানন্দ হে।।
জগাই মাধাই এর উদ্ধারকর্তা নিত্যানন্দ হে।
মার খেয়ে প্রেম যাচা ঠাকুর নিত্যানন্দ হে।।
গৌর বলতে প্রাণহারা নিত্যানন্দ হে।
বণিককুলের উদ্ধার কর্তা নিত্যানন্দ হে।।
বসুধা জাহ্নবা প্রাণ নিত্যানন্দ হে।।
সাধন ভজন প্রভু নিত্যানন্দ হে।
নিতাই গৌর হে নিতাই গৌর হে।।
নদের খেলা গড়াগড়ি নিত্যানন্দ হে।
নদের বেশ কৌপীন পরা নিত্যানন্দ হে।
নদের খেলা প্রেমপ্রচার নিত্যানন্দ হে।।
একবার নিতাই বলে ডাক পরমানন্দে থাক।
জয় জয় জয় নিত্যানন্দ হে।।

১০নং পদ—

নিতাই নিতাই নিতাই প্রাণভরে বলনা।
বলতে বলতে ঐ নামে যাবে সকল ভাবনা।।
এমন দয়াল গুণের ঠাকুর কোথাওত আর পাবেনা।
(পাপ) তাপ লয়ে প্রেম দিয়ে পূরায় সকল বাসনা।।
নিতাই গৌর বলে দেখ প্রাণ তোমার মাতে কি না।
নামের গুণে স্বরূপ-স্মৃতি দেখ জাগে কি না।
দুঃখ গিয়ে সুখ এসে প্রাণ পূর্ণ করে কি না।
জানবে তখন প্রাণে প্রাণে নিতাই গৌর চাও কিনা।।

১১নং পদ—

অন্তরে নিতাই বাহিরে নিতাই নিতাই জগৎময়।
নাগর নিতাই নাগরী নিতাই নিতাই কথা সে কয়।।
সাধন নিতাই ভজন নিতাই নিতাই নয়ন তারা।
দশদিক ময় নিতাই সুন্দর নিতাই ভুবন ভরা।।
রাধার মাধুরী অনঙ্গমঞ্জরী নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর বদন সুন্দর সখা সখী বলদেবে।।
রাধার ভগিনী, শ্যাম সোহাগিনি, সব সখীগণ প্রাণ।
যাঁহার লাবণি মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণি মন্দির নাম।।

নিতাই সুন্দরে যোগপীঠে ধরে রত্নসিংহাসন সে—
বসন নিতাই ভূষণ নিতাই বিলসে সখীর মাঝে।
কি কহব আর নিতাই সবার আঁখি মুখ—সর্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নূতন রঙ্গ।।
নিতাই বলিয়া দুবাহু তুলিয়া চলিব বরজ পুরে।
দাস বৃন্দাবন করে নিবেদন নিতাই না ছেড়ো মোরে।।

নিত্যানন্দ সম্পর্কিত এই পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত। পদগুলির মধ্য দিয়ে কবিরা তৎকালীন যুগ ও সমাজের পটভূমিতে অঙ্কিত মানুষের কথাই ব্যক্ত করেছেন। নিত্যানন্দের আচণ্ডালে কোল দেবার কথাও পদগুলিতে বর্ণিত হয়েছে—যা শুধু সাহিত্যের নয়, ইতিহাসেরও তথ্য। সর্বোপরি ভক্তের আকুতি সেই পরম প্রিয়ের সন্নিকটবর্তী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—যাকে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'ভক্তিরস' তার প্রকাশ ঘটেছে অপূর্বভাবে। যার মধ্যে দিয়ে মানবীয় কাহিনী হয়ে উঠেছে দেব কাহিনী।

এবার আমরা চরিতসাহিত্য তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থগুলির ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্রকল্প ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবেশ করবো।

ভাষা ঃ কাব্যমূল্য বিচার করতে গেলে চরিতসাহিত্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষার ঐশ্বর্যের কথাই প্রথম বলতে হয়। বৃন্দাবনী বা ব্রজভাষা আরবি, ফারসি, ব্রজবুলি, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা মহাজনদের সাহিত্যের বাহন হওয়ায় পদাবলীর ভাষা হয়েছে সমৃদ্ধ। এই সময়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধন সহজ হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব আচার্যগণ বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্র আলোচনা, বাংলায় দর্শন ও ন্যায়ের তত্ত্ব প্রচার প্রভৃতি দ্বারা বাংলা ভাষাকে সহজ ও গতিশীল করে তুলেছিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও তাদের নিজেদের মত সমর্থনের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের আগমন ঘটেছিল, বাংলার শব্দভাণ্ডার পুষ্ট হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের জন্য চরিতসাহিত্যগুলি সাধারণ পাঠকের নিকট খুব সহজবোধ্য বা আদরণীয় হতে পারেনি, তবুও নতুন নতুন শব্দ বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, বিশেষত সংস্কৃত থেকে বাংলায় গৃহীত হয়েছিল। তাই গ্রন্থগুলির ভাষা দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও বাংলা ভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধই করেছিল। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য হয়েছিলেন। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে হিন্দি এবং বৃন্দাবনী ভাষার প্রাচুর্য ঘটেছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে ভাষা নূতন আকার ধারণ করেছে। 'ঙ', 'ঞ' এবং ' ँ ' (চন্দ্রবিন্দু)-এর ব্যবহার অত্যধিক। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলিতেও

'ঞ' এবং 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু)-র ব্যবহার অধিক। যথা—যাইঞা, খাইঞা, দোঁহে, দোঁহা, দোঁহার, আঁইলু, মুঁঞি প্রভৃতি।

ঐ সময়টা মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ গৌরবের সময় বলে মুসলমানী ভাষারও বেশ প্রচলন ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মানসিক সাম্য বজায় থাকায় বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের ভাষায় বহু স্থানে মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অলক্ষিত থাকেনি। যেমন—জলদি, ঝাট, চাচা ইত্যাদি।

এছাড়া 'শ্রী' শব্দের প্রচলনও ছিল অধিক। যেমন—শ্রীহস্ত, শ্রীচরণ, শ্রীপাট এমনকি শ্রীমুখ পর্যন্ত ব্যবহৃত হত।

এইভাবে নানা ভাষা নানা মত গ্রহণ করে বৈষ্ণব যুগে বাংলা ভাষা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল। নানা শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষার গতিশীলতা ও সজীবতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সহজ সরল প্রত্যক্ষ ও ব্যঞ্জনাধর্মী বাংলা ভাষারীতিকে অধিক অবলম্বন করেছেন চৈতন্য সমকালীন এবং চৈতন্য পরযুগের কবিরা। এঁরা ছিলেন চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ ভাবাবেগ-প্লাবিত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার কবি[৫২]।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষারীতির আলোচনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ব্রজবুলি। ব্রজবুলি কীর্তনের জন্য এক অভিনব ভাষা। এ ভাষা কোনো জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষা নয়—শ্রুতিমধুর মিশ্র ভাষা। এ ভাষার সৃষ্টি বিদ্যাপতির পূর্বে এবং বিদ্যাপতির কাব্য-সাধনায় এর সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষার কথা বলতে গেলেই ব্রজবুলির কথা বিশেষভাবে এসে পড়ে। ষোড়শ শতকের গোবিন্দদাস থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকের ঘনশ্যাম দাস, অষ্টাদশ শতকের জগদানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী পর্যন্ত তার বিস্তার আমাদের মুগ্ধ-বিস্মিত ও পুলকিত করে[৫৩]।

চরিতসাহিত্যগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরল পয়ার এবং বিবৃতিমূলক পাঁচালী রীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

চৈতন্যভাগবত ঃ বৃন্দাবনদাস (আ. ১৫৪৮ খ্রি.)— বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন গৌর-নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-বলরামের অবতার। গ্রন্থমধ্যে এই বিশ্বাসকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের সরল বিশ্বাসপূর্ণ বর্ণনা গ্রন্থটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ বলরামের অবতার হলেও তাঁর চরিত্রে ঐশ্বর্যভাবের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিত্র সম্পর্কে বৃন্দাবনদাসের প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁর কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। সুতরাং এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। গ্রন্থটিতে নিত্যানন্দের বাল্য, যৌবন, শেষ জীবনের প্রায় সকল

আখ্যানই বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ যা কাব্যটির প্রাণ। কবি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁর বর্ণনায় একটা মাধুর্যের সুর সঞ্চিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পয়ারে রচিত কয়েকটি ত্রিপদীও আছে যার ভাষা সরল ও সুললিত। চৈতন্যদেবের ভাগবতলীলা কাব্যটির মুখ্য বিষয় হলেও গ্রন্থটি মানবীয় রসে পরিপূর্ণ।

নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাতের পূর্বে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দেখেন। বৃন্দাবনদাস সেই স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব শিল্পকুশলতায়।

'আজি আমি অপরূপ দেখিলু' স্বপনে।।
তালধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার।।
তা'র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা একস্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির।।
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডুলু বাম-হাতে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে।।
বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝি যে চরিত্র।।[৫৪]

এই বর্ণনায় উজ্জ্বলরূপ পাঠকমনে জীবন্ত শরীর নিয়ে উপস্থিত।

নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাতে যে সুন্দর সখ্যপ্রেমের এবং ভ্রাতৃপ্রেমের আবহ তিনি রচনা করেছেন তা অপূর্ব—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি।।
দোঁহে দোঁহে দেখি বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা।।[৫৫]

আবার—

কি আনন্দ বিরহ হইল দুইজনে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা।।[৫৬]

এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের পিতা-মাতার বাল্যলীলার বর্ণনা অতি সুন্দর—

ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে।।
এইমত পুত্রসঙ্গে বলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হইল নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই।।[৫৭]

শচীমাতা নিত্যানন্দকে পুত্ররূপে পেয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন। শচীমাতার সঙ্গে তাঁর বাৎসল্যের প্রকাশও বৃন্দাবনদাস অপূর্ব দক্ষতায় বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা আমরা বাৎসল্যরসের আলোচনায় অবলোকন করেছি।

চৈতন্যমঙ্গল ঃ লোচনদাস (১৫৫০-১৫৬৬ খ্রি.)— লোচনদাসের কাব্য পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থ। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ কবি। অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনি কুশলী শিল্পী। তিনি মুখ্যত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। মঙ্গলকাব্যের ঢঙে দেব-দেবীর বন্দনার সূত্রপাত। সরল পয়ারে বর্ণিত আখ্যায়িকার অংশগুলি সুন্দরভাবে ফুটেছে।

শচীমাতার সঙ্গে নিত্যানন্দের মিলনে বাৎসল্যরসের প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে। তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন—

নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াইল নয়ান।
পিরিতি পাগল হঞা নেহারে বয়ান॥
প্রভু বোলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা—শচীদেবী কহে॥[৫৮]

কাব্যটিতে অলৌকিক রসের বর্ণনা আকর্ষণীয়। যাই হোক, গ্রন্থটিতে সমাজমানসের যে ছবি উদ্ভাসিত তার প্রকাশেই কাব্যটির সার্থকতা।

চৈতনমঙ্গল্য—জয়ানন্দ ঃ (আ. ১৫৬০ খ্রি.)— কাব্যটি সম্বন্ধে প্রথমেই বলে নিই যে, এই কাব্যটি পণ্ডিত বিদগ্ধজনের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের জন্যই রচিত হয়েছিল। কাব্যটিতে নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। সুর-তাল-ছন্দ যোগে কাব্যটি গীত হয়। জয়ানন্দের কাব্যশক্তি উচ্চাঙ্গের না হলেও নিন্দনীয় নয়। তবে অলঙ্কার চিত্রকল্প সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন—

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রাএ।
রুনু ঝুনু কণক নূপুর বাজে পাএ॥
স্বর্ণ বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ দেখি অনুপাম॥
হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙা চরণ যুগলে॥
....
ধরণী আন্দোলে প্রেমরসের হিল্লোলে॥[৫৯]

জয়ানন্দের বর্ণনায় নিত্যানন্দের অনুপম রূপটি কবিত্বময় হয়ে উঠেছে। অলঙ্কার ব্যবহারে নিপুণতায় বর্ণনাটি সাহিত্যরসের সঞ্চার করেছে।

জয়ানন্দের গ্রন্থে সাহিত্যিক উৎকর্ষ কোনো কোনো স্থানে কাব্যিক রসবোধে সমুজ্জ্বল হয়েছে। এই গ্রন্থে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের সময়ের সুন্দর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়—

ঘূর্ণিতলোচন বারুণী মদোন্মত্ত।
হ্রস ভ্রমর জিনি অসীম মহত্ত্ব॥
কিরে কিরে শব্দ মহা গভীর হুঙ্কার।
ভাবাবেশে রসাবেশে আবেশে বিকার॥
রঙ্গী সঙ্গী চপল অশেষ চারুবাণী।
সতত রভস মৃদু হাস্য বরু ডালি॥
অস্থির চরণ ক্ষেণে চলে লাফে লাফে।
পদতলাঘাতে ঘন ঘন ক্ষিতি কাঁপে॥
অবিরত কীর্ত্তন লালশা সঙ্গী সঙ্গে।
সুরনদীতীরে নবদ্বীপে গেলা রঙ্গে॥[৬০]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বিজয়খণ্ড ও উত্তরখণ্ডে প্রধানত নিত্যানন্দ ও তাঁর শিষ্যদের আখ্যানই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। এই আখ্যানসমূহ কবি অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় এবং সুর-তাল-ছন্দ সহযোগে বর্ণনা করেছেন। ফলে এ সমস্ত বর্ণনা সাধারণের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

'পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে'[৬১]

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ প্রভু বিচ্ছেদকাতর ভক্তদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস অবলম্বন করেছিলেন।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে উত্তরখণ্ডে নিত্যানন্দের এই সময়কার আচরণের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

চৈতন্য-বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ।
চৈতন্য-বিজয় বিনে না করে শ্রবণ॥
নিত্যানন্দে প্রবোধিয়া সর্ব্বপারিষদ।
চৈতন্যানন্দে নাচ কীর্ত্তন সম্পদ॥

....

গাওয়াইমু চৈতন্য নুণ্ডাঞিমু চৈতন্য।
গৌড় উৎকল রাজ্য করামু ধন্য ধন্য॥[৬২]

জয়ানন্দের গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বর সঙ্গে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যোগ সাধনায় ধ্যেয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর ধ্যানেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। শুধু যোগতত্ত্ব নয়, সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের অনুরূপ দেহতত্ত্বের উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে। নিত্যানন্দ শিষ্য-সম্প্রদায়ের কেউ কেউ অলৌকিক কার্যে সক্ষম ছিলেন।

যোগবিভূতিতে পারদর্শিতাই এর কারণ বলে মনে হয়। গ্রন্থটির শেষাংশে এইসব মূল্যবান তথ্যের সন্নিবেশ ঘটায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৬১২-১৬১৫ খ্রি.)— এই কাব্যের কাব্যসৌন্দর্য অতুলনীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তসমাজের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেম ও ভক্তিরসের যে অপূর্ব ছবি কৃষ্ণদাস অঙ্কন করেছেন তার ফলে গ্রন্থটি সাহিত্যরসপিপাসুর কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটির দার্শনিকতা বা সমগ্র কাব্যটির কাব্য-সৌন্দর্য আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। শুধুমাত্র নিত্যানন্দ সম্পর্কিত অংশগুলির কিছু উল্লেখ করে আমরা বিষয়টি ছুঁয়ে যাব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলেছেন স্বপ্নে তিনি নিত্যানন্দের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর দ্বারা আদিষ্ট হয়েই বৃন্দাবনবাসী হন। এখানে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় প্রেমভক্তি ও বিনয়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে—

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদ পদ্ম প্রভু দিলা মোর সাথে।।
'উঠ', 'উঠ' বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার।।[৬৩]

নিত্যানন্দের কৃপায় বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন তিনি তাঁর গ্রন্থে সে কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।।
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত।।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।।[৬৪]

নিত্যানন্দের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি বৃন্দাবন গোস্বামীদের সাহচর্যে আসতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় আমরা তাঁর রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি লাভ করেছি যা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত।

তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব আচার্যদের মত অনুসরণ করেই গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই সেখানে কবিত্বশক্তির প্রকাশের অবকাশ তাঁর খুব বেশি ছিল না। তবুও যখন তিনি অনুভূতির প্রগাঢ়তায় আত্মমগ্ন হয়েছেন, তখনি তাঁর রচনা সৌন্দর্যের প্রকাশে অনুপম হয়ে উঠেছে।

তিনি যখন নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা করেছেন এবং গোপবেশধারী পরিকবগণের সেবা ও পারিপাট্যের বর্ণনা করেছেন কেবল সে সকল স্থানে ধর্মকথার সঙ্গে কবির পাণ্ডিত্যও প্রকাশিত হয়েছে—

শ্যাম-চিক্কন কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-নয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দনলেপিত অঙ্গ, তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদ-মন্থর পয়ান॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব বীজ-সম দন্ত তাম্বুল চর্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।
চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়॥[৬৫]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে বসে কবি যখন চৈতন্যের শাখা নির্ণয় করেন, তখনও কবির বর্ণনা অলঙ্কারমণ্ডিত হয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে—

মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন।
আগে ত কবিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্দ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥

....

উডুম্বর-বৃক্ষে যেন ফলে সর্ব অঙ্গে।

এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে।।[৬৬]

এইভাবে কাব্যটির স্থানে স্থানে ভক্তিরস এবং বর্ণনা-নৈপুণ্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কাব্যটিতে বৃন্দাবনী ব্রজবুলি; বাংলা এবং মুসলমানী শব্দের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। তার ফলে এর ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি প্রেম-ভক্তির গভীর তত্ত্ব প্রকাশে নিপুণতা লাভ করেছে।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ঃ শ্রীল নরহরি ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যামদাস— নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থটি মহান্তজনের চরিতকথা নিয়ে রচিত। অবশ্য এতে চৈতন্যদেবের কথা আছে। তাই নিষ্ঠাবান ভক্তদের নিকট এই গ্রন্থ অতিশয় আদরণীয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সময় অনুযায়ী দুই যুগের ভক্তবৃন্দের জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক ভক্তদের এবং শ্রীচৈতন্য পরবর্তী ভক্তপরিকরদের জীবনী এতে লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রন্থটি তথ্য ও তত্ত্বপ্রধান হলেও স্থানে স্থানে কবির কাব্যনিপুণতারও পরিচয় আছে। বলা বাহুল্য, আমরা শুধুমাত্র নিত্যানন্দ সম্পর্কিত অংশগুলি আলোচনা করবো।

নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনায় কবি ঘনশ্যাম অপূর্ব কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন—

'........ এ যেন বালক কভু নয়।

হেম নবনীতের পুতলী বুঝি হয়'।।[৬৭]

'........ মুখশোভা মনোহর।

দুগ্ধবিন্দু প্রায় দুই দশন সুন্দর।।[৬৮]

গ্রন্থটিতে হাড়াই এবং পদ্মাবতীর নিত্যানন্দের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যের রূপ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

নিতাই-এর গৃহত্যাগে পিতামাতার মনে বিচ্ছেদ বেদনার সূত্রপাত হয়েছিল। আত্মীয় পরিজনদের শূন্যপ্রাণ করে জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি যেখানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই অংশের বর্ণনাও করুণরসের আকর। গ্রন্থটিতে অনেক পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এছাড়া কীর্তনগানের রীতি সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা গ্রন্থটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

প্রেমবিলাস ঃ নিত্যানন্দ দাস— প্রেমবিলাস গ্রন্থটি নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস রচনা করেন। গ্রন্থটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তবে গ্রন্থটিতে কাব্যরসের অভাব অস্বীকার করা যায় না।

'নিত্যানন্দ চরিতামৃত' এবং **'নিত্যানন্দের বংশবিস্তার'** নামে দুটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। গ্রন্থ দুটির প্রামাণিকতা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গ্রন্থ দুটি বৃন্দাবনদাসের নামে

আরোপিত। নিত্যানন্দ জীবনের যে অংশগুলি চৈতন্যভাগবতে স্থান পায়নি সে সব কাহিনী গ্রন্থ দু'টির বর্ণনীয় বিষয়। যেমন শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ বিবাহ কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা—

নিত্যানন্দ কহেন 'সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রি হও যন্ত্রতুল্য হই আমি॥
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা॥
....'।[৬৯]

অবশেষে তিনি শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস সরখেলের কন্যা বসুধাকে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করেন। সূর্যদাস সন্ন্যাসীকে কন্যাদানে ইতস্তত করলেও পরে সম্মত হন। এইসব বৃত্তান্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অদ্বৈত প্রকাশ ঃ ঈশান নাগর— এই গ্রন্থটির বিশেষ কোনো মূল্য স্বীকৃত হয়নি। তবুও কোনো কোনো স্থানে নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে—

নিত্যানন্দে দেখি সভে বিস্ময় মানিলা॥
অলৌকিক রূপ তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
কোটি-সূর্য্যসম কান্তি প্রকৃতি গম্ভীর॥
ললাটে তিলক শোভে যৈছে চন্দ্র প্রভা।
তুলসী কাষ্ঠের মালায় কণ্ঠ করে শোভা॥
হাস্য যুত মুখপদ্ম পরম সুন্দর।
ন্যাসী চূড়ামণি দয়া গুণের আকর॥[৭০]

বর্ণনার কোনো কোনো স্থানে তিনি উৎপেক্ষা-উপমা-রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন—

গৌর-সূর্য্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
শুদ্ধ প্রেমামৃত জ্যোৎস্নায় ব্যাপে অবিচ্ছেদে॥[৭১]

আবার—

নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ মেঘ বরিষণে।
ভক্ত নেত্র গঙ্গা স্রোত বহয়ে দ্বিগুণ॥
তাহে গৌর প্রেমাসিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িল।
সর্ব্বজ্ঞের মন মকর তাহাতে ডুবিল॥[৭২]

গৌর-নিতাইর প্রেমাবেশের বর্ণনাও অতি সুন্দর—

নাচয়ে গৌরাঙ্গ প্রেমে হঞা মাতোয়ারা।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে যায় হই দিশাহারা॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমবন্যা উথলিল।
আকর্ষিয়া সর্ব্বজীবে তাহে ডুবাইল॥[৭৩]

তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পুরাণের কাহিনীও সংযোজিত হয়েছে—

অজ্ঞাত-কুলশীল লোকে না পুছয়ে জ্ঞানী॥
কন্যা দানের যোগ্য পাত্র সহজ না হয়।
শিবে কন্যা দিয়ে দক্ষ ছাগ-মুণ্ড পায়॥[৭৪]

অন্যান্য পরিকরদেব চরিত নিয়েও কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', বাসুঘোষের 'কড়চা', যদুনন্দনের 'কর্ণানন্দ', মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী', নরোত্তম দাসের 'নরোত্তম বিলাস', রামদাসের 'অভিরাম লীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি কাব্যগুণমণ্ডিত হলেও, নিত্যানন্দ সম্পর্কিত বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে পণ্ডিতগণের অভিমত—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয়, সমাজেও এসেছিল আমূল পরিবর্তন। সাহিত্য এবং সমাজের এই পরিবর্তন অনুভব করে সমালোচকেরা এই যুগটিকে চৈতন্য রেনেসাঁসের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। চৈতন্য প্রবাহের দু'কূলপ্লাবী জোয়ারধারায় যেমন বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল, তেমনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা অনুচর-পরিকরদের জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি এবং ভাবাবেগের স্রোত এই চৈতন্য রেনেসাঁসের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই ভক্তঅনুচরদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের নাম সর্বাগ্রগণ্য।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং প্রসারকল্পে নিত্যানন্দের ভূমিকা যে কী অপরিসীম তা আমরা এই গ্রন্থেব বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর এই সুবৃহৎ কর্মপদ্ধতির এবং মানবতাবাদী ধর্মান্দোলনের কথা কোথাও সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। মধ্যযুগের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্বলিত হিন্দুধর্ম এবং সমাজ ক্রমশই সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হল মহান প্রেমের বাণী নিয়ে জীব উদ্ধার করতে। তাঁর এই মহৎ কর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্যদেবের চিন্তা এবং কর্মধারাকে উদ্বোধিত করতে নিত্যানন্দ ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষকে একাত্মতা দান করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন নিত্যানন্দের ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ ছিলেন Social reformer বা সমাজ সংস্কারক। তাঁদের ধর্মতত্ত্ব যাই হোক, মূলে তাঁরা ছিলেন সমাজ সংস্কারক। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় সমালোচক বলেছেন —"Nityananda was a religious reformer, like his contemporary Martin Luther both of them defied the time honoured custom of celebacy of the monks."

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতা নির্ভর ধর্মান্দোলনের মহৎ প্রেরণা পরবর্তীকালে একদিকে বৃন্দাবনের যড়্‌গোস্বামী- অনুসৃত শাস্ত্র পুরাণের গণ্ডিতে আবদ্ধ হল। অন্যদিকে নিত্যানন্দের গণমুখীন ভাবধারা ও কর্মপ্রয়াসে বৃহত্তর লোকায়ত সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। তাই চৈতন্য রেনেসাঁসকে বুঝতে গেলে এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর স্বর্ণযুগের ইতিহাস জানতে হলে নিত্যানন্দের জীবনী, কর্মপদ্ধতি, তাঁর ধর্মপ্রচার ইত্যাদি সমস্ত বিষয় জানার প্রয়োজন আছে। এই বিষয় জানার আগ্রহ থেকেই আমরা নিত্যানন্দ বিষয়ে গবেষণায় অগ্রসর হয়েছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবপ্রেম নিত্যানন্দের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ অবহেলিত পতিত সমাজেরও নিষ্পেষিত মানব সমাজের অত্যন্ত নিকটে এসেছিলেন। তিনি ঐসব অবহেলিত মানুষের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তিপ্রেমের বন্যায় মানুষ প্লাবিত হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। মাতৃভাষায় ভক্তিগ্রন্থগুলি পাঠ করার সুযোগ তারা পেয়েছিল। আমরা বলতে পারি, মাতৃভাষায় ধর্মশাস্ত্র পাঠের আগ্রহের ফলে সেগুলি জনশিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবরা ছিল বেশি মাত্রায় 'সাক্ষর'—শুধুমাত্র বৈষ্ণব পুরুষেরাই নন, স্ত্রীলোকেরাও মাতৃভাষায় অল্পস্বল্প শিক্ষালাভ করেছিলেন।

বাংলার বৃহত্তর সমাজকে নিত্যানন্দ আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর অভিনব নৃত্য-গীতের ভঙ্গিমা সে যুগে দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। নিত্যানন্দের বক্ষে সর্বমানবের জন্য ভালোবাসা, চোখে পতিত-দুর্গতদের জন্য অবিরাম জলধারা, কণ্ঠে সদা-সর্বদা গান। নিত্যানন্দকে যেন মনে হয় জীবন্ত বিগ্রহ। নৃত্য-গীত এবং সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজকে উজ্জীবিত করেছিলেন। কীর্তন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরস ভোগে একটা 'Democracy'-র যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তা-ঘাটে। বাংলার কীর্ত্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার প্রশস্ত জায়গা হল'[১]। কীর্তনের প্রসঙ্গ এলে এবং কীর্তনে জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাসের কথা ভাবতে গেলে, ধর্মরস ভোগে Democracy-র যুগের কথা এলে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ ভুলে থাকা যায় না।

নিত্যানন্দ প্রচারিত ভক্তি-প্রেমের বাণী জাতি-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনগণের মর্মে পৌঁছেছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারার আদর্শে গণমানস ঊর্ধ্বায়িত হয়েছিল। সেইজন্যই নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারভূমি বাংলাদেশে বাউল সাধনার ন্যায় প্রেম বৈরাগ্য মিশ্রিত একটি সাধনধারার উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তাদের গানেও এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংকীর্তনের ন্যায় বাউলদের সঙ্গীতও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং বাংলাদেশে প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়েছে।

উনিশ শতকের হিন্দুসমাজ যখন বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যা নিয়ে উত্তাল, তার বহু পূর্ববর্তী বৈষ্ণব হিন্দুসমাজ কিন্তু হিন্দু আইনের আওতার মধ্যে থেকেও জাত বিচারের বালাই না রেখে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। অ-ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী নির্বিবাদে ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রীকেও বিয়ে করতে পারত[২]।

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে হিন্দুসমাজে ব্যভিচার নেমে এসেছিল ফল্গুস্রোতের মতো। বৈষ্ণব সমাজ থেকে এই ব্যভিচার বহুলাংশে দূর হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে তন্ত্রানুমোদিত দেহ-তত্ত্বাদির সংমিশ্রণে দুটি বিশিষ্ট শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সময়ে হিন্দু বৈষ্ণব সমাজও ব্যভিচারদুষ্ট হয়ে পড়েছিল।

নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সেই সমাজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে 'ভেক' প্রথার সাহায্যে তাদের বিবাহের সুযোগ দান করেন। বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় বৈষ্ণব সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে দুটি প্রধান শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি বৈষ্ণব সহজিয়া, অপরটি বাউল। রাগমার্গে ব্রজসখীর আনুগত্য স্বীকার করে রাধাকৃষ্ণের যুগল ভজনের যে ধারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে প্রাধান্য লাভ করেছিল তার উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং প্রসারে নিত্যানন্দের অসামান্য ভূমিকা ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের মতাদর্শকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যক্তি আবেগকে গণমুখী করে তোলা, তত্ত্বকে বাস্তবোচিত গ্রহণযোগ্য করে তোলা এসবই নিত্যানন্দের কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য— নিত্যানন্দের মানবপ্রেম। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের যে শাখাটি 'সহজিয়া বৈষ্ণব' ধর্ম নামে খ্যাতিমান হয়েছিল তারও সূচনা নিত্যানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের আলোকে আলোকিত হয়েও স্বতন্ত্র দীপশিখা। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যা ব্যক্তিগত ভাবোন্মাদনা, নিত্যানন্দের মধ্যে তাই সমষ্টিগত সাংগঠনিক আলোক উৎস। রামকৃষ্ণের যেমন বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যের তেমনি নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্যদেবের দেবোপম চরিত্রকে ঘিরে সাহিত্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। দেবমহিমার পালাকীর্তনের সঙ্গে শুরু হল দেবোপম মানবমহিমার পালা। ফলে চরিত-সাহিত্যধারা গড়ে উঠল। শুধুমাত্র দেবকল্প মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়েই নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনী নিয়েও রচিত হল জীবনী সাহিত্য। বাংলার ইতিহাসে এই চরিতসাহিত্য বৈষ্ণব ভক্ত তথা বৈষ্ণব সমাজের এক অপূর্ব দান। এই চরিত- সাহিত্যগুলি থেকেও আমরা তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারি। গ্রন্থগুলির ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার সন্নিবেশ ইত্যাদি সাহিত্যের ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

যাই হোক, বর্তমান গ্রন্থে মধ্যযুগের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বনে, বিশেষত বৈষ্ণব চরিতসাহিত্য অবলম্বনে আমরা নিত্যানন্দের জীবন ও কর্মপদ্ধতির সম্ভাব্য বিবরণ দেবার চেষ্টা করলাম। নিত্যানন্দ তত্ত্ব জীবের একমাত্র উপাস্য যিনি 'পঞ্চরূপে ধরি করে কৃষ্ণের সেবন। মহাজন বলেন এবে ব্রজের বলাই।' নিতাই হল সঙ্কর্ষণ। কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও অনন্তশায়ী শেষরূপে ভগবানের পঞ্চবিধ সেবা বলরাম-নিরন্তর করছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

> বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
> সর্বজীব-জনক রক্ষক সর্বমিত্র।।[৩]

সে চরিত্রের কথা আমরা কতটকুই বা জানি, তবুও তাঁদেরই কৃপা এবং আশীর্বাদ অবলম্বনে নিত্যানন্দের অমৃতময় জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনুধাবনে প্রয়াসী হয়েছি। আমার এই সৎ প্রচেষ্টায় কোনো ভুল থাকলে সুধীজন নিজগুণে ক্ষমা করবেন—এই প্রত্যাশা নিয়ে বর্তমান আলোচনার ছেদ টানছি।